মাসুদ রানা
সাগর কন্যা
দুইখন্ড একত্রে
কাজী আনোয়ার হোসেন
Banglapdf.net
Carnival Destiny
সেবা
প্রকাশনী
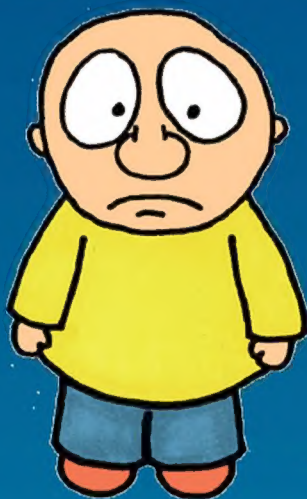
মাসুদ রানা

সাগর কন্যা

(দুইখণ্ড একত্রে)
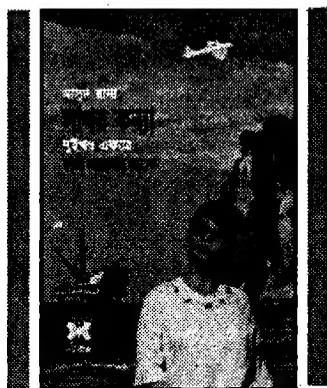
কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7081-X
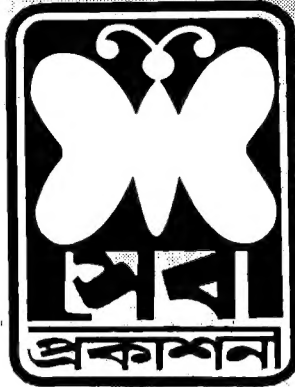
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮০

প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana
SAGAR KANNYA
Part-I & II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

তেষট্টি টাকা

মাসুদ রানার ভলিউম

খণ্ড	নাম	মূল্য
১-২-৩	ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ	৬৪/-
৪-৫-৬	দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ	৬৭/-
৭-৩৭২	শত্রু ভয়ঙ্কর+অরক্ষিত জলসীমা	৫৯/-
৮-৯	সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০-১১	রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ	৫৯/-
১২-৫৫	রত্নদ্বীপ+কুউউ	৪৯/-
১৩-১৪	নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১৫-১৬	কায়রো+মৃত্যু প্রহর	৫৮/-
১৭-১৮	গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র	৩৭/-
১৯-২০	রাত্রি অন্ধকার+জাল	৪৬/-
২১-২২	অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা	৩৪/-
২৩-২৪	ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত	৩২/-
২৫-২৬	এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই	৩৩/-
২৭-২৮	বিপদজনক-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২৯-৩০	রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে)	৩১/-
৩১-৩২	অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে)	৩৮/-
৩৩-৩৪	বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
৩৫-৩৬	ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
৩৭-৩৮	গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু	৩৮/-
৩৯-৪০	অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
৪১-৪৬	সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক	৪৬/-
৪২-৪৩	নীল ছবি-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৪৪-৪৫	প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৪৭-৪৮	এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে)	২৯/-
৪৯-৫০	লাল পাহাড়+হৃৎকম্পন	৫২/-
৫১-৫২	প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৫৩-৫৪	হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে)	৪৮/-
৫৬-৫৭-৫৮	বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে)	৫৯/-
৫৯-৬০	প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
৬১-৬২	আক্রমণ ১,২ (একত্রে)	৫০/-
৬৩-৬৪	গ্রাস-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৬৫-৬৬	স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৬৭-১৬১	পপি+বুমেরাং	৬০/-
৬৮-৬৯	জিপসী-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
৭০-৭১	আমিই রানা-১,২ (একত্রে)	৬০/-
৭২-৭৩	সেই উ সেন-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৭৪-৭৫	হ্যালো, সোহানা ১.২ (একত্রে)	৫৭/-
৭৬-৭৭	হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৭৮-৭৯-৮০	আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে)	৯৬/-
৮১-৮২	সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে)	৬৩/-
৮৩-৮৪	পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে)	৬৬/-
৮৫-৮৬	টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৮৭-৮৮	বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
৮৯-৯০	প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
৯১-৯২	বন্দী গগল+জিম্মি	৪২/-
৯৩-৯৪	তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে)	৪১/-
৯৫-৯৬	স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯৭-৯৮	সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা	৪১/-
৯৯-১০০	নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১০১-১০২	স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১০৩-১০৪	উদ্ধার-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১০৫-১০৬	হামলা-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০৭-১০৮	প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১০৯-১১০	মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১১১-১১২	লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১১৩-১১৪	অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১১৫-১১৬	আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১১৭-১১৮	বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে)	৫৪/-
১১৯-১২০	নকল রানা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১২১-১২২	রিপোর্টার-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১২৩-১২৪	মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১২৫-১৩১	বন্ধু+চ্যালেঞ্জ	৪৮/-
১২৬-১২৭-১২৮	সংকেত-১,২,৩ (একত্রে)	৮৮/-
১২৯-১৩০	স্পর্ধা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৩২-১৫৩	শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী	৪৮/-
১৩৩-১৩৪	চারিদিকে শত্রু-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৩৫-১৩৬	অগ্নিপুরুষ-১,২ (একত্রে)	৬৪/-
১৩৭-১৩৮	অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে)	৪৬/-
১৩৯-১৪০	মরণকামড়-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪১-১৪২	মরণখেলা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১৪৩-১৪৪	অপহরণ-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৫-১৪৬	আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪৭-১৪৮	বিপর্যয়-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৯-১৫০	শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৫১-১৫২	শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে)	৭৫/-
১৫৬-১৫৭	মৃত্যু আলিঙ্গন-১,২ (একত্রে)	৫২/-
১৫৮-১৬২	সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া	৫৯/-
১৫৯-১৬০	আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৪৭/-
১৬২-১৬৫	কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৪৭/-
১৬৩-১৬৪	মুক্ত বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে)	৯০/-
১৬৬-১৬৭	চাই সাম্রাজ্য-১,২ (একত্রে)	৮৫/-
১৬৮-১৬৯	অনুপ্রবেশ-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৭০-১৭১	যাত্রা অশুভ-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭২-১৭৩	জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৭৪-১৭৫	কালো টাকা ১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭৬-১৭৭	কোকেন সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮০-১৮১	সত্যবাবা-১,২ (একত্রে)	৬১/-

১৮২-১৮৩ বাঙ্কীরা ইন্দিয়ার+অপারেশন চিতা ৪৩/-
১৮৪-১৮৫ আক্রমণ '৮৯-১,২ (একত্রে) ৪১/-
১৮৬-১৮৭ অশান্ত সাগর-১,২ (একত্রে) ৪২/-
১৮৮-১৮৯-১৯০ শ্বাপদ সংকুল-১,২,৩ (একত্রে) ৬৫/-
১৯১-১৯২ দংশন-১,২ (একত্রে) ৪২/-
১৯৩-১৯৪ প্রলয়সংকেত-১,২ (একত্রে) ৬৫/-
১৯৫-১৯৬ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে) ৪৫/-
১৯৭-১৯৮ তিক্ত অবকাশ-১,২ (একত্রে) ৩৭/-
১৯৯-২০০ ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে) ৩৭/-
২০১-২০২ আমি সোহানা-১,২ (একত্রে) ৫৮/-
২০৩-২০৪ অগ্নিপথ-১,২ (একত্রে) ৩৫/-
২০৫-২০৬-২০৭ জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে) ৭৫/-
২০৮-২০৯ সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে) ৩৮/-
২১০-২১১ গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে) ৩৯/-
২১২-২১৩-২১৪ নরপিশাচ-১,২,৩ (একত্রে) ৬৭/-
২১৭-২১৮ অনধিকারী১,২ (একত্রে) ৩৭/-
২১৯-২২০ দুই নম্বর-১,২ (একত্রে) ৩৬/-
২২১-২২২ কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে) ৩৭/-
২২৩-২২৪ কালোছায়া-১,২ (একত্রে) ৩৯/-
২২৫-২২৬ নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে) ৩৪/-
২২৭-২২৮ বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে) ৩৮/-
২২৯-২৩০ স্বর্ণদ্বীপ-১,২ (একত্রে) ৪০/-
২৩১-২৩২-২৩৩ রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে) ৬০/-
২৩৪-২৩৫ অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে) ৩৬/-
২৩৬-২৩৭ ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে) ৩১/-
২৩৮-২৩৯ নীল দংশন-১,২ (একত্রে) ৩২/-
২৪০-২৪১ সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে) ৩৬/-
২৪২-২৪৩-২৪৪ কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্রে) ৫৫/-
২৪৫-২৪৬ নীল বজ্র ১,২ (একত্রে) ৩২/-
২৪৯-২৫০-২৫১ কালকূট-১,২,৩ (একত্রে) ৫০/-
২৫৪-২৫৫ সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে) ৩৮/-
২৫৬-২৫৭ জ্বলন্ত বাক্স ১,২ (একত্রে) ৩৯/-
২৬৩-২৬৪ হীরক সম্রাট ১,২ (একত্রে) ৪২/-
২৫৮-২৬৫ রক্তচোষা+সাত রাজার ধন ৪৩/-
২৫৯-২৬০-২৬১ কালো ফাইল ১,২,৩ (একত্রে) ৬৩/-
২৬৬-২৬৭-২৬৮ শেষ চাল ১,২,৩ (একত্রে) ৫৬/-
২৬৯-২৮৫ বিশব্যাপ্ত+যাদুচক্র ৪৩/-
২৭০-২৭১ অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ ৩৮/-
২৭২-২৭৩ মহাপ্রলয়+যুদ্ধবাজ ৩৯/-
২৭৪-২৭৫ প্রিন্সেস হিয়া ১,২ (একত্রে) ৫২/-
২৭৬-২৯১ মৃত্যু ফাঁদ+সীমালঙ্ঘন ৪৫/-
২৭৯-২৮২ মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি ৫১/-
২৮০-২৮৯ ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ ৩৮/-
২৮১-২৭৭ আক্রান্ত দূতাবাস+শয়তানের ঘাঁটি ৪৬/-
২৮৩-২৮৮ দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস ৪৭/-
২৮৪-৩১২ মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট ৪২/-
২৮৬-২৮৭ শকুনের ছায়া ১,২ (একত্রে) ৪১/-
২৯০-২৯৩ ভন্ডবাই, রানা+কান্তার মরু ৪৬/-
২৯২-২৯৮ রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ ৩৭/-
২৯৪-৩০৪ কর্কটের বিষ+সার্বিয়া চক্রান্ত ৪২/-
২৯৫-২৯৭ বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা ৩৩/-

২৯৬-৩০৬ শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা ৪২/-
২৯৯-২৭৮ কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা ৪৩/-
৩০০-৩০২ বিষাক্ত থাবা+মৃত্যুর হাতছানি ৪০/-
৩০১-৩৪৪ জলদস্যু+ক্রাইম বস ৪১/-
৩০৫-৩০৭ দুরভিসন্ধি+মৃত্যুপথের যাত্রী ৪৭/-
৩০৮-৩৪২ পালাও, রানা+অন্ধপ্রেম ৫৪/-
৩০৯-৩১০ দেশপ্রেম+রক্তলালসা ৪১/-
৩১১-৩১৪ যুদ্ধের ঘাঁটো+মুক্তিপণ ৪৭/-
৩১৫-৩১৬ চীনে সঙ্কট+গোপন শত্রু ৪৯/-
৩১৭-৩১৯ মোসাদ চক্রান্ত+বিপদসীমা ৪০/-
৩১৮-৩৪৭ চরদ্বীপ+ইনকাপনের টেকা ৫০/-
৩২০-৩২১ মৃত্যুবীজ+জাতগোক্ষুর ৪৩/-
৩২২-৩৩৬ আবার ষড়যন্ত্র+অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা ৫৪/-
৩২৩-৩৫২ অন্ধ আক্রোশ+মরুকন্যা ৬২/-
৩২৪-৩২৮ অশুভ প্রহর+অপারেশন ইজরাইল ৫৮/-
৩২৫-৩৫১ কনকতরী+দুর্গে অন্তরীণ ৪৪/-
৩২৬-৩২৭ স্বর্ণখনি ১,২ (একত্রে) ৫৮/-
৩২৯-৩৩০ শয়তানের উপাসক+হারানো মিগ ৪৬/-
৩৩১-৩৪১ মুইছু মিশন+আরেক গডফাদার ৪২/-
৩৩২-৩৩৩ টপ সিক্রেট ১,২ (একত্রে) ৩৯/-
৩৩৪-৩৩৫ মহাবিপদ সংকেত+সবুজ সংকেত ৫০/-
৩৩৭-৩৩৮ গহীন অরণ্য+প্রজেক্ট X-15 ৫৯/-
৩৩৯-৩৫৩ অন্ধকারের বন্ধু+রেড ড্রাগন ৫৪/-
৩৪০-৩৪৩ আবার সোহানা+মিশন তেল আবিব ৪৮/-
৩৪৫-৩৪৬ সুমেরুর ডাক-১,২ (একত্রে) ৫৫/-
৩৪৮-৩৪৯ কালো নকশা+কালনাগিনী ৫০/-
৩৫০-৩৫৬ বেঈমান+মাফিয়া ডন ৪৮/-
৩৫৪-৩৫৯ বিষচক্র+মৃত্যুবাণ ৫০/-
৩৫৫-৩৩১ শয়তানের দ্বীপ+বেদুইন কন্যা ৫৫/-
৩৫৭-৩৫৮ হারানো আটলান্টিস-১,২ (একত্রে) ৬২/-
৩৬০-৩৬৭ কমান্ডো মিশন+সহযোদ্ধা ৬৬/-
৩৬১-৩৬২ শেষ হাসি-১,২ (একত্রে) ৭৪/-
৩৬৩-৩৬৪ স্মাগলার+বন্দি রানা ৫৯/-
৩৬৫-৩৬৬ নাটের গুরু+আসছে সাইক্লোন ৫৪/-
৩৬৮-৩৬৯ গুপ্ত সংকেত-১,২ (একত্রে) ৬৮/-
৩৭০-৩৭৬ ক্রিমিনাল+অমানুষ ৭৯/-
৩৭৩-৩৭৪ দুরন্ত ঈগল-১,২ (একত্রে) ৫৪/-
৩৭৫-৩৭৭ সর্পলতা+অখণ্ড অবসর ৭৮/-
৩৭৮-৩৭৯ স্নাইপার ১,২ (একত্রে) ৬৮/-
৩৮০-৩৮১ ক্যাসিনো আন্দামান+জলরাক্ষস ৮৯/-
৩৮৪-৩৮৮ স্বপ্নের ভালবাসা+নিখোঁজ ৮৯/-
৩৮৫-৩৮৬ হ্যাকার ১,২ (একত্রে) ৬৭/-
৩৮৭-৩৮৯ খুনে মাফিয়া+বুশ পাইলট ৬৭/-
৩৯০-৩৯১ অচেনা বন্দর ১,২ (একত্রে) ৮৪/-
৩৯২-৩৯৯ ব্ল্যাকমেইলার+বিপদে সোহানা ৬৪/-
৩৯৩-৩৯৪ অন্তর্ধান ১,২ (একত্রে) ৭০/-
৩৯৫-৩৯৬ ড্রাগ লর্ড+দ্বীপান্তর ৬৮/-
৩৯৭-৩৯৮ গুপ্ত আততায়ী ১,২ (একত্রে ৮৪/-
৪০০-৪০১ চাই ঐশ্বর্য ১,২ (একত্রে) ৯৪/-
৪০৪-৪০৫ কিল-মাস্টার+মৃত্যুর টিকেট ৭৪/-

সাগর কন্যা-১

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৮০

এক

বিশাল আরব জাহান। ধু ধু প্রান্তর। উষর মরু।

ছোট্ট একটা মরুদ্যান। যাযাবর আরব বেদুইনদের অস্থায়ী আস্তানা।

সমস্ত আকাশটাকে আগুনের কুণ্ড বানিয়ে রেখেছে সূর্য। নিচে ঝলসাচ্ছে আদিগন্ত মরুভূমি। তপ্ত বাতাসের হলকার সাথে ভেসে বেড়াচ্ছে একটা নারীকণ্ঠের আর্ত, কাতর ধ্বনি। আজ তিন দিন ধরে প্রসব যন্ত্রণায় ছটফট করছে এক নারী।

এখান থেকে ষাট মাইল দূরে উট চলাচলের রাস্তা আল জাফা ধরে একদল সওদাগরের যাবার কথা, এই খবর পেয়ে গতকাল ভোরে সমর্থ যুবকদেরকে সাথে নিয়ে রওনা হয়ে গেছে বেদুইন সর্দার। স্ত্রীর সঙ্কটাবস্থা দেখেই গেছে। আজই ফিরে আসতে পারে সে, আবার আর কখনও ফিরে নাও আসতে পারে—কিছুই বলা যায় না। ফিরে এসে যদি দেখে স্ত্রী কন্যা-সন্তান প্রসব করেছে, অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হবে সে। কারণ, তার অনেক দিনের শখ একটি ছেলের, যার হাতে দিয়ে যাবে গোষ্ঠীর ভার।

তাঁবুর ভেতর থেকে এখন শুধু ক্ষীণ একটা দুর্বল গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। প্রায় অচেতন সর্দারের স্ত্রীর জন্যে করার আর কিছুই বাকি রাখেনি কেউ, এখন হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছে সবাই। জানে, পোয়াতির অবধারিত মৃত্যু আর মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার। এই সময় চমকে উঠল সবাই সদ্যজাত শিশুর তীব্র প্রতিবাদ ওঁয়া ওঁয়া কান্নার আওয়াজে।

নবজাতকের কানে আজানের মধুর সুর পশাতে হবে, সর্দারের তাঁবু লক্ষ্য করে ছুটছে এক অশীতিপর, পক্বকেশ বৃদ্ধ। ওদিকে ধু-ধু মরুতে দেখা যাচ্ছে একটা কাফেলা, ছুটন্ত ঘোড়া আর ভারবাহী উটের সারি। ডাকাতি সেরে ফিরে আসছে বেদুইন সর্দার। আনন্দ আর বেদনার অশ্রু বয়ে যাচ্ছে ছোট্ট বেদুইন আস্তানায়। সন্তানের জন্ম দিয়ে মারা গেছে মা।

রাজার ঐশ্বর্য লুট করে নিয়ে এসেছে যুবক বেদুইন সর্দার। তাকে দেখে সমস্ত শোক আর আনন্দ-কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেল। তার স্ত্রী কি বেঁচে আছে? জানতে চাইছে দস্যু সর্দার। এগিয়ে এল সেই অশীতিপর বৃদ্ধ। নিঃশব্দে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে। তার কি সন্তান হয়েছে? আবার জানতে চাইল বেদুইন সর্দার। এবার উপর নিচে মাথা দোলাল বৃদ্ধ। সর্দারের পরবর্তী প্রশ্নটা কি হবে জানে সে।

পুত্র সন্তান হয়েছে শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল দুর্ধর্ষ বেদুইন সর্দার। লুট করে নিয়ে আসা প্রচুর পণ্য আর খাদ্যসম্ভার, অঢেল সোনা আর কয়েক লাখ দিনার—সব সে বিলিয়ে দিল অকাতরে। জানাল, আজ থেকে একচল্লিশ দিন ধরে

চলবে আনন্দ-উৎসব।

গুরুগম্ভীর পরিবেশে মৃতা স্ত্রীর দাফন-কাফনের পর গোষ্ঠীর সবাইকে নিয়ে একটা বৈঠকে বসল বেদুইন সর্দার। সবাই জানে নবজাত সন্তানকে নিজের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী ঘোষণা করবে সর্দার, সেজন্যেই এই বিশেষ বৈঠক ডাকা হয়েছে। কিন্তু সবাইকে বিমূঢ়, স্তম্ভিত করে দিয়ে বেদুইন দস্যু সর্দার ঘোষণা করল, 'আমার ছেলের ভবিষ্যৎ কি হবে তা আমি আগেই ভেবে রেখেছি। রাইফেল ছোঁবে না ও। ওকে আমি ছুরি ধরা শেখাব না। আমি চাই না আমার ছেলে বড় হয়ে পুরুষদের বুকে ছোরা বসিয়ে দিয়ে তাদের বউ-মেয়েদেরকে ধর্ষণ করুক। ওকে আমি সভ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তুলব। ওকে আমি লেখাপড়া শেখাব। লেখাপড়া শেষ করে ছেলে যখন আমার কাছে ফিরে আসবে, ওর হাতে তুলে দেব আমার প্রাণপ্রিয় দলের ভাগ্য। অনেক দুর্ভোগ আর তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি আমি আমাদের এই অনিশ্চিত জীবনের মোড় ফেরাতে হলে এমন একজনের নেতৃত্ব দরকার যার পেটে বিদ্যা আছে, দুনিয়া সম্পর্কে যার ধারণা আছে। আমার ছেলেকে আমি সেভাবেই গড়ে তুলতে চাই।'

তিন বছর পর। কায়রো। একটা নার্সিং হোম। এখানে বড় হচ্ছে সেই বেদুইন সন্তান।

আরও আট বছর পরের কথা। লন্ডন। একটা বোর্ডিং স্কুল। অত্যন্ত নাম করা স্কুল, বিরাট ধনী আর রাজ-পরিবারের ছেলেমেয়েরাই শুধু লেখাপড়া শেখে এখানে। বিদেশী কিছু ছাত্রও আছে বটে, তারা সবাই হয় কোন দেশের প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী বা কোন কোটিপতির সন্তান। একমাত্র ব্যতিক্রম নাফাজ মোহাম্মদ। সেই বেদুইন দস্যু সর্দারের মাতৃহারা সন্তান।

স্কুল ফাইন্যালে প্রথম হয়েছে একজন বিদেশী ছাত্র। কে? নাফাজ মোহাম্মদ।

এরপর কলেজ জীবন। আন্তঃ কলেজ রাইফেল শুটিং প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে কে? নাফাজ মোহাম্মদ। বাৎসরিক স্পোর্টসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কে? নাফাজ।

বাইশ বছর বয়স নাফাজ মোহাম্মদের। বিজনেস ম্যানেজমেন্টের ফাইন্যাল পরীক্ষার ফল বেরুতেই চমকে উঠল গোটা শিক্ষা-বিভাগ। প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছে একজন বিদেশী ছাত্র। কে? নাফাজ মোহাম্মদ।

বিশাল আরব জাহান। ধু-ধু প্রান্তর। ঊষর মরু। পরীক্ষার ফল হাতে নিয়ে ফিরে এসে নাফাজ মোহাম্মদের চক্ষু চড়কগাছ। তার বেদুইন পিতা ছোটখাট এক তেল খনির মালিক বনে গেছে। বিদ্যান ছেলের হাতে তেল খনি পরিচালনার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে অবসর নেবে, এই আশায় অপেক্ষা করছে বাপ।

জন্মদাতাকে নিরাশ হতে হলো। তার ব্যবসার দায়িত্ব নিতে রাজী নয় ছেলে। কারণ হিসেবে কি সব বলে, কিছুই তার মাথায় ঢোকে না।

কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎ এবং উচ্চাশা সম্পর্কে সুশিক্ষিত নাফাজ মোহাম্মদের মনে কোন সংশয় নেই, নেই আত্মবিশ্বাসের অভাব। জ্ঞান হবার পর থেকে চোখ কান খোলা রেখে ইউরোপে মানুষ হয়েছে, দুনিয়াদারির হালচাল বুঝতে অসুবিধে হয় না। ধমনীতে রয়েছে বেদুইন দস্যুর রক্ত, সেই সূত্রে পাওয়া দুঃসাহস আর দূরদৃষ্টি,

বিচক্ষণতা আর রোমাঞ্চপ্রিয়তা। সবাই যা ভাবে তার থেকে একটু অন্য কিছু ভাবতে অভ্যস্ত নাফাজ মোহাম্মদ। পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয় এটা তার প্রতিভারই একটা বিশেষ লক্ষণ।

জন্মদাতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পেছনে নিজস্ব কিছু যুক্তি এবং পরিকল্পনা রয়েছে নাফাজ মোহাম্মদের। গোটা আরব জাহান তেলের ওপর ভাসছে, দুনিয়ার সবাই তেল কিনতে ছুটে আসছে এখানে, বাবার এই বক্তব্যের সাথে কোন বিরোধ নেই তার। সারা দুনিয়ায় এখন সেরা ব্যবসা বলতে তো এই একটাই, তেলের ব্যবসা, একথাও মেনে নেয়া গেল। কিন্তু এসব প্রসঙ্গে তার নিজেরও কিছু ধ্যান-ধারণা আছে।

শুধু আরব জাহান তেলের ওপর ভাসছে একথা বোধহয় সবটুকু সত্য নয়। দুনিয়ার সবখানেই কম বেশি তেল আছে, পানির দামে আরবের তেল যারা কিনছে তারা একথা ভালভাবেই জানে। নাফাজ মোহাম্মদের সন্দেহ, কিছু ক্রেতা আছে যারা নিজেদের তেলে হাত না দিয়ে আরবদের তেল সাবাড় করতে চাইছে। একদিন দেখা যাবে আরবদের সব তেল নিঃশেষ হয়ে গেছে, সাথে সাথে ভেঙে পড়বে তাদের অর্থনীতি, দেওলিয়া হয়ে যাবে গোটা আরব জাহান। ওদিকে ভারী শিল্পে সমৃদ্ধ ইউরোপ আর মার্কিন মুলুক নিজেদের তেল সদ্ব্যবহার করবে তখন, উচিত মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি দর হাঁকবে তারা বিদেশী ক্রেতাদের কাছে।

এইসব ভেবেচিন্তে দেখে দুঃসাহসিক একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হয়েছে নাফাজ মোহাম্মদকে। একটা অসম্ভব স্বপ্ন তার মনে, সেটাকে বাস্তবে পরিণত করতে হবে। তার ব্যবসার নাম হবে নাফাজ অয়েল কোম্পানী। বিপুল পরিমাণে এখন যারা আরবের তেল কিনছে, তাদের দেশেই তেল খনি আবিষ্কার করবে তার কোম্পানী। বিশেষ করে সাগরের নিচে অনুসন্ধান চালাবে সে। ওদের তেল ওদের কাছেই বিক্রি করবে। কাজটা কঠিন। কিন্তু কাজটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবেই গ্রহণ করবে সে।

উত্থান পর্বে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে নাফাজ মোহাম্মদকে। প্রতিভা, উদ্যোগ আর কঠোর পরিশ্রমই লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্যে যথেষ্ট নয়। শুরুতেই তেলের ব্যবসায় নামতে পারেনি সে। বাবার কাছ থেকে পাওয়া অল্প পুঁজি দিয়ে তেল বেচা-কেনার দালালি করাও সম্ভব ছিল না। অগত্যা লন্ডনে ফিরে এসে প্রথমে রিয়েল এস্টেট বিজনেসে ঢুকে পড়তে হলো। বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়া আছে, বিদ্যার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল সে এক্ষেত্রে। মাত্র তিন বছরেই বিস্তর পাউন্ড কামাল নাফাজ মোহাম্মদ। সে সময় কানাডিয়ান ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্রিটেনে হিজরত করার হিড়িক পড়ে গেছে, কারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ আর মুনাফার হার এখানেই বেশি। কিন্তু বিচক্ষণ নাফাজ মোহাম্মদ ঠিক উল্টোটা করল। দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেল সে, তার জন্যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে ইংল্যান্ডে নয়, কানাডায়। তাছাড়া, ইন্টারন্যাল রেভিনিউ ইদানীং তাকে বড় ত্যক্ত করছিল, তার ব্রিটেন ত্যাগ করার সেটাও একটা কারণ।

কানাডা সরকারের সাথে একটা চুক্তি করে নতুন ব্যবসায়ে নাম লেখাল নাফাজ মোহাম্মদ। নাফাজ অয়েল কোম্পানী কানাডায় তেল আবিষ্কারের যাবতীয়

খরচ বহন করবে, তেল যদি পাওয়া যায় লভ্যাংশের শতকরা পঁচিশ ভাগ পাবে কোম্পানী, বাকি পঁচাত্তর ভাগ নিয়ে যাবে কানাডা সরকার।

অসম বাণিজ্য চুক্তি হলেও, নাফাজ মোহাম্মদের স্বপ্ন বাস্তবে আকার নিতে শুরু করেছে। প্রথম কয়েক বছরেই ছোটখাট প্রায় ডজনখানেক তেল খনি আবিষ্কার করল কোম্পানী। কোটি কোটি কানাডিয়ান ডলার রোজগার হচ্ছে, দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ট্যাঙ্কার আর রিফাইনারি ফ্যাক্টরির সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কিন্তু শতকরা মাত্র পঁচিশ ভাগ লভ্যাংশ আর কানাডার হিমশীতল আবহাওয়া বেশিদিন পছন্দ হলো না তার। দক্ষিণে সরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় চলে এল নাফাজ মোহাম্মদ। কানাডা থেকে আমেরিকায় আসার সময়ও তার কোম্পানীর সাথে মার্কিন সরকারের একটা বাণিজ্য চুক্তি হলো। চুক্তিটা আবিষ্কারের নয়, তেল উত্তোলনের। এই ব্যবসায় একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পুঁজি খাটবে, মুনাফাও একটা সীমার মধ্যে আটকে থাকবে। দীর্ঘদিনের চুক্তি, সুতরাং আশা থাকল, মার্কিন নাগরিকত্ব পাবার জন্য তার আবেদন চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার আগেই মঞ্জুর হয়ে যাবে। একবার নাগরিকত্ব পেলেই হয়, তারপর দেখাবে সে ব্যবসা কাকে বলে।

ত্রিশ বছর পরের ঘটনা।

ফ্লোরিডা।

ফোর্ট লডারডেল। একটা অভিজাত আবাসিক এলাকা। এখানে একটুকরো জমি পাবার জন্যে বহু মার্কিন ধনকুবের লালায়িত। মিলিওনিয়র বা বিলিওনিয়রের সামাজিক মর্যাদা কয়েকগুণ বেড়ে যায় ফোর্ট লডারডেলে তার একটা বাড়ি থাকলে। গৌরব এবং গরিমার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয় সেই বাড়ি।

নাফাজ ম্যানসন।

গঠন সৌষ্ঠবের দিক থেকে ফোর্ট লডারডেলের গর্ব এই বাড়িটি এবং এলাকার অন্যান্য ধনকুবেরদের ঈর্ষার কারণ। বাড়িটির মালিক একজন মার্কিন নাগরিক। নাম নাফাজ মোহাম্মদ। বয়স ষাট। কিন্তু দীর্ঘদেহী, একহারা, ঋজু ভদ্রলোক আজও তারুণ্যের প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। ক্লিন শেভ। মাথাভর্তি তুষার ধবল পাকাচুল সযত্নে ব্যাকব্রাশ করা। বছরে দু'একটা ব্যতিক্রম ছাড়া প্রতিদিন ষোলো ঘন্টা কাজ করেন তিনি।

বেদুইন সন্তানের দুঃসাহসিক উচ্চাশা পূর্ণতা পেয়েছে এতদিনে। স্বাধীন একজন ব্যবসায়ী আজ তিনি। ইউরোপ-আমেরিকার অসংখ্য ভারী শিল্পের শেয়ার কিনে ফেলেছেন। আরও অনেক ধরনের ব্যবসা আছে তাঁর। কিন্তু আসল যে ব্যবসা নিয়ে তাঁর গর্ব সেটি হলো, তেল খনি আবিষ্কার এবং উত্তোলন। তাঁর এই ব্যবসাতে কাউকে তিনি অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করেননি। অংশীদার হবার দাবি উত্থাপন করবে কেউ, সে-সুযোগও রাখেননি তিনি। তাঁর আবিষ্কৃত তেল খনি কোন দেশেরই সীমানার মধ্যে পড়ে না। তিনি গভীর সমুদ্রে তেল খনি আবিষ্কার করেন, এবং সেখান থেকে তেল তুলে আগ্রহী ক্রেতার কাছে বিক্রি করেন। কোনরকম কর, শুল্ক ইত্যাদি কিছুই কাউকে দিতে হয় না। যা লাভ করেন সবই তাঁর কোম্পানীর নামে জমা হয় ব্যাঙ্কে।

এমন একজন গুণী মানুষের যে শত্রু থাকবে সে তো জানা কথা। আর

শত্রুদের ওপর তিনিও যে সতর্ক নজর রাখবেন সেটাও স্বাভাবিক।

কিন্তু এই মুহূর্তে শত্রু সম্পর্কিত দুর্ভাবনা থেকে অনেক দূরে রয়েছেন নাফাজ মোহাম্মদ। ডাইনিংরুমের গদীমোড়া চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে শরবতের গ্লাসে মাঝেমধ্যে চুমুক দিচ্ছেন তিনি। সুখী এবং পরিতৃপ্ত দেখাচ্ছে তাঁকে।

শ্বেত পাথরের নগ্ন কাঁচ-ঢাকা নারী মূর্তি দিয়ে সাজানো ডাইনিংরুমের একটা কোণ। চেয়ারগুলো সেই ত্রয়োদশ লুই-এর আমলের তৈরি। এমব্রয়ডারি করা সিল্কের কার্পেট পাতা-বাহার আর ফুল-মালিকার কারুকাজগুলো এমনভাবে ফুলে-ফেঁপে আছে যে বড় আকারের একটা ছুঁচোও অনায়াসে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবে।.দামেস্ক থেকে কারিগর আনিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই কার্পেট। জানালা-দরজার ভারী পর্দা আর দেয়ালাবরণগুলো হালকা ধূসর রঙের। শুধু এই খাবার ঘরেই পাঁচ লক্ষ ডলার মূল্যের বিখ্যাত সব শিল্পীদের আঁকা অরিজিনাল পেইন্টিং রয়েছে। ছবির একজন সমঝদার হিসেবেও গোটা মার্কিন মুলুকে খ্যাতি রয়েছে নাফাজ মোহাম্মদের।

একজন বিলিওনিয়র ব্যবসায়ী হিসেবে টাকার প্রতি তাঁর মোহ প্রবল, তবে বেঁচে থাকার সুখ এবং জীবন—এ দুটোর ওপর তাঁর মায়া টাকার চেয়েও বেশি। কিন্তু এসবের চেয়েও ভালবাসেন যাকে, সে হলো তাঁর একমাত্র কন্যা শিরি ফারহানা। প্রাণপ্রিয় মেয়েকেই এই মুহূর্তে সঙ্গ দিচ্ছেন তিনি।

আরব বেদুইন বাবা এবং ইটালিয়ান প্রিন্সেস মায়ের রক্ত বইছে শিরি ফারহানার শরীরে, মাত্র উনিশ বছর বয়স, প্রকৃতি অকৃপণ হাতে সাজিয়ে দিয়েছে তার যৌবন।

রিস্টওয়াচ দেখলেন নাফাজ মোহাম্মদ। বারোটা বাজতে চার মিনিট বাকি। বাপ-মেয়ে একজন অতিথির জন্যে অপেক্ষা করছে। লাঞ্চ খাবার নিমন্ত্রণ করা হয়েছে তাকে। বাঙালী এক যুবক। নাম আনিস। আনিস আহমেদ। ছেলেটি এই এলাকায় রানা এজেন্সীর ব্রাঞ্চ চীফ, যেমন সুদর্শন, তেমনি স্মার্ট। শিরি ফারহানার একমাত্র বয়ফ্রেন্ড সে।

ঠিক এই সময় নিঃশব্দে খুলে গেল ডাইনিংরুমের একটা দরজা। ধবধবে সাদা সিল্কের তৈরি সৌদি আরবের জাতীয় পোশাক পরা বাটলার আয়েদ আবদালী ঢুকল ভেতরে। লন্ডনের একটা ফাইভ স্টার হোটেল থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছে সে। তার দু'জন সহকারীও তাই নিয়েছে। আরবী, ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ এবং জার্মান ভাষায় কথা বলতে পারে আয়েদ আবদালী। নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এসে টেবিলের মাথার কাছে দাঁড়াল সে, কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে সামনের দিকে ঝুঁকে নাফাজ মোহাম্মদের কানে কানে কি যেন বলল।

সম্মতি জানিয়ে মৃদু মাথা ঝাঁকালেন নাফাজ মোহাম্মদ। গদীমোড়া চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'মা,' ক্ষমা প্রার্থনার ক্ষীণ হাসি মুখে নিয়ে মেয়ের দিকে তাকালেন তিনি, 'এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন। জরুরী কোন ব্যাপার। আমাকে যেতে হচ্ছে। আশা করি আনিস বুঝবে—ওকে বোলো, আমার অনুপস্থিতিতে যেন কিছু মনে না করে।'

অসহায়ভাবে মৃদু হাসল শিরি। বাটলারের পিছু পিছু বাবাকে বেরিয়ে যেতে

দেখছে, ভাবছে, নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে বাড়ির কর্তাকে খাবার টেবিলে দেখতে না পেলে অসন্তুষ্ট হবে আনিস? ওর সৌজন্য বোধ তো আবার সাংঘাতিক প্রখর।

বাটলার দরজা খুলে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল, সিটিংরুমে ঢুকলেন নাফাজ মোহাম্মদ। এই কামরাটিও অত্যন্ত রুচিসম্মতভাবে সাজানো। সমস্ত ফার্নিচার ওক আর লেদার দিয়ে তৈরি। সেন্ট্রাল এয়ারকন্ডিশন সিস্টেমে গোটা ম্যানসনটা উষ্ণ রাখা হয়েছে. তা সত্ত্বেও আভিজাত্যের নিদর্শন হিসেবে কামরার এক কোণে গনগনে আগুন জ্বলছে ফায়ারপ্লেসে।

সোফায় প্রায় ডুবে বসে আছে তামাটে রঙের দীর্ঘদেহী এক লোক। নাফাজ মোহাম্মদকে দরজায় দেখা মাত্র উঠে দাঁড়াল। একজন আমেরিকান সে, তবু কপালের কাছে হাত তুলে সসম্ভ্রমে ভাঙা ভাঙা উচ্চারণে অভিবাদন জানাল, 'আসসালামালায়কুম, মি. নাফাজ, স্যার।' চেহারাটা খুবই মলিন হয়ে আছে তার।

সবার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে নেয়া নাফাজ মোহাম্মদের একটা অভ্যাস। আগন্তুক অতি পরিচিত হলেও, তাকেও সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির আঁচ সর্ব শরীরে অনুভব করতে হলো। মৃদু হাসি লেগে আছে নাফাজ মোহাম্মদের ঠোঁটে। 'ঈগলটন! হাউ ভেরি নাইস টু সি ইউ এগেন। বসো, বসো।' এক সেকেন্ড বিরতি নিয়ে হাসিটা আরও বিস্তৃত করলেন তিনি, তারপর মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'তোমার ভূমিকাটাই ভগ্নদূতের ভূমিকা—খারাপ ছাড়া ভাল খবর আনবে না, এ তো আমার জানা আছে। সুতরাং, চেহারা থেকে দুশ্চিন্তার খোলসটা ঝেড়ে ফেলো। একটু হাসো, হাসি জিনিসটা দেখতে ভালই লাগে আমার।'

মলিন চেহারাটা একটু গম্ভীর হলো ঈগলটনের, তারপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু হাসতে চেষ্টা করল সে। বয়স মাত্র চল্লিশ, এরই মধ্যে পাক ধরেছে চুলে, মেদ জমতে শুরু করেছে শরীরে। সে-ও একজন মিলিওনিয়র ব্যবসায়ী তবে হাতি আর পিপিলিকার শ্রেণী ও আকারগত পার্থক্য রয়েছে ওদের দু'জনের মধ্যে।

বেশ ক'বছর আগে মিলিওনিয়র জর্জ ঈগলটন বিলিওনিয়র নাফাজ মোহাম্মদের ঘোরতর শত্রু আর কট্টর সমালোচক হিসেবে পরিচিত ছিল। বাইরের জগতে আর সবার কাছে আজও তাই আছে ঈগলটন। কিন্তু দু'জনের মধ্যে এক গোপন চুক্তির মাধ্যমে যার যার কোম্পানীর স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা হয়েছে। সমস্ত ব্যবসায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী আর শত্রুপক্ষের অতি গোপনীয় প্ল্যান-পরিকল্পনা, অপতৎপরতার সর্বশেষ খবর নাফাজ মোহাম্মদকে জানিয়ে দেয় ঈগলটন। বিনিময়ে তাঁর কাছ থেকে কিছু বাণিজ্যিক সুবিধা ছাড়াও বছরে নগদ পাঁচ লক্ষ মার্কিন ডলার উপঢৌকন হিসেবে গ্রহণ করে।

'হ্যাঁ, মি. নাফাজ, স্যার—খবর ভাল নয়,' কণ্ঠস্বর শান্ত রেখে বলল ঈগলটন। 'আগামীকাল লেক তাহোয় গোপন মীটিং ডেকেছে ওরা।'

ওরা কারা, জানেন নাফাজ মোহাম্মদ। এবার তাঁর মুখ থেকে হাসি মুছে যাবার কথা। কিন্তু ঈগলটন তাকে একটুও বিচলিত হতে দেখছে না। ঠোঁটের হাসিটা আরও একটু বিস্তৃত হয়ে মুখেও ছড়িয়ে পড়ল নাফাজ মোহাম্মদের। আঙুল রেখে চাপ দিলেন তিনি একটা বোতামে। প্রায় সাথে সাথে রূপোর একটা রেকাবীতে দুটো লার্জ ব্র্যান্ডি নিয়ে কামরায় ঢুকল বাটলার আয়েদ আবদালী। প্রভুর কখন কি

দরকার হতে পারে তা সে হুকুম পাবার আগেই বুঝতে পারে। অনেক বছরের অভিজ্ঞতার ফল। রূপোর রেকাবী তেপয়ে নামিয়ে রেখে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে।

সোফায় বসলেন নাফাজ মোহাম্মদ। হাত বাড়িয়ে তেপয় থেকে তুলে নিলেন টোব্যাকো পাউচ আর পাইপটা। এতক্ষণে তাঁর সামনের সোফায় বসে পড়ল ঈগলটন। একটা চুরুট ধরাল সে।

'ব্যস, এইটুকুই খবর তোমার?' বললেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'এটা তো একটা পুরানো খবর আমার কাছে। দু'ঘন্টা আগেই পেয়েছি। এর সাথে নিশ্চয়ই নতুন কিছু যোগ করার আছে তোমার?'

মনে মনে চমকে উঠল ঈগলটন। বোকা হাঁদা বলে গালমন্দ করছে নিজেকে। খবর সংগ্রহের আরও যে উৎস থাকতে পারে নাফাজ মোহাম্মদের, সে কথা অনেক আগেই অনুমান করা উচিত ছিল তার। 'বোধহয় আছে,' ব্র্যান্ডির গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল ঈগলটন। 'এই গোপন বৈঠকে তেল ব্যবসায়ী নয় এমন একজনকে ডাকা হয়েছে। এ খবরটাও কি আপনার কাছে পুরানো, মি. নাফাজ, স্যার?'

ধবধবে সাদা ভুরু একটু কুঁচকে উঠল নাফাজ মোহাম্মদের। 'তাই কি? ব্যবসায়ী নয়, এমন একজন? খবরটা নতুন বটে। একটু কৌতুককর বলেও মনে হচ্ছে। কে?'

'হেকটর।' নিচু গলায়, কিন্তু স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করল ঈগলটন।

চার অক্ষরের নামটা কানে ঢুকতেই সারা শরীরে যেন একটা ইলেকট্রিক শক্ অনুভব করলেন নাফাজ মোহাম্মদ। প্রচণ্ড ধাক্কাটা একচুল নাড়াতে পারেনি তাঁর শরীর। পাইপটা দাঁত দিয়ে কামড়ে আছেন এখনও, ব্র্যান্ডির গ্লাসটা তেপয়ে নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিলেন, মাঝপথে থেমে গেছে হাতটা। নিমেষে গলার রগ বেয়ে ছুটে এসে মুখটাকে টকটকে লাল করে তুলেছে রক্তস্রোত। এইভাবে তিন সেকেন্ড বয়ে গেল। ঈগলটনের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তিনি। পাথরের একটা মূর্তি যেন। হঠাৎ প্রাণ ফিরে পেয়ে সজীব হয়ে উঠল মূর্তিটা। মাঝপথে থেমে থাকা হাতটা সচল হলো প্রথমে। তেপয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রাখলেন নাফাজ মোহাম্মদ। ধীরে ধীরে, একটু একটু করে হাসি ফিরছে তাঁর মুখে।

তাই দেখে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ছে ঈগলটনের। এই আরব বেদুইন সন্তানকে যমের মত ডরায় সে। কারণটা নিজেরও ভাল করে জানা নেই তার। নাফাজ মোহাম্মদকে প্রচণ্ড, অদম্য একটা প্রাকৃতিক শক্তি বলে মনে হয় তার। এই শক্তির বিস্ফোরণ সে দেখেনি কখনও, সেজন্যে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেয় সে সব সময়।

'তোমার স্ত্রী ফিরেছে হাসপাতাল থেকে?' জানতে চাইলেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'তোমার মেজো ছেলে, অভিনয় করে যেটা, তার কোন নতুন ছবি মুক্তি পেয়েছে নাকি? শিরি আবার ওর অভিনয় পছন্দ করে কিনা।'

হতভম্ব দেখাচ্ছে ঈগলটনকে। কোত্থেকে কোথায় চলে এলেন নাফাজ মোহাম্মদ! হেকটরের নাম শুনে এই চমকে উঠলেন, পর মুহূর্তে সমস্ত উদ্বেগ ঝেড়ে ফেলে এসব কি জানতে চাইছেন! তার পরিবারের এত খবরও রাখেন তিনি?

তাছাড়া, হঠাৎ এসব জানতে চাওয়ারই বা মানে কি?

'হ্যাঁ, স্ত্রী ফিরেছে...,' থতমত ভাবটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারছে না ঈগলটন। 'না, নতুন কোন ছবি মুক্তি পায়নি আমার ছেলের। আপনার মেয়ে, মিস শিরি, সত্যি পছন্দ করে ওর অভিনয়?'

'ভীষণ,' মৃদু হেসে বললেন নাফাজ মোহাম্মদ।

'কথাটা শুনলে খুশি হবে আমার ছেলে,' কথার পিঠে কথা বলতে হয়, তাই বলছে ঈগলটন, গোটা আলোচনাটাই অর্থহীন লাগছে তার কাছে। আশা করছে, একটু পরই আবার কাজের কথায় ফিরে আসবেন নাফাজ মোহাম্মদ।

কিন্তু ব্যবসা সংক্রান্ত কোন প্রসঙ্গই আর তুলছেন না তিনি। খোশ গল্প করার মেজাজে কথা বলছেন। খানিক পর ঈগলটন আবিষ্কার করল, তার মনেও নাফাজ মোহাম্মদের মেজাজটা সংক্রমিত হয়েছে। হালকা হয়ে গেছে পরিবেশটা। সে-ও হাসছে নাফাজ মোহাম্মদের কথা শুনে।

ঠিক এই সময় দরজায় নক না করে কামরায় ঢুকল সুদর্শন এক যুবক। তীক্ষ্ণ চেহারা, হাবভাবে কোনরকম আড়ষ্টতা নেই। তেমন লম্বা নয়, পাঁচ ফিট আট, কিন্তু স্বাস্থ্যটা খুব ভাল, অ্যাশ কালারের স্যুটের বাইরে থেকেও দৃঢ় পেশীর সঞ্চালন টের পাওয়া যাচ্ছে পরিষ্কার।

'গুড মর্নিং, মি. নাফাজ!' বাড়ির অন্দরমহলে ঢোকার দরজার দিকে এগোচ্ছে আনিস।

'হ্যাল্লো, মাই ডিয়ার বয়,' চট্ করে রিস্টওয়াচটা একবার দেখে নিয়ে বললেন নাফাজ মোহাম্মদ। একটু হাসলেন তিনি। হাসিটা দেখল কি দেখল না, দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল আনিস।

'কে?' বেশ একটু অবাক হয়ে জানতে চাইল ঈগলটন। 'কখনও দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।' কথাটার মানে হলো, ফোর্ট লডারডেলের সমস্ত অভিজাত পরিবারের ছেলেকে চেনে সে, এই ছেলেটি তাদের কেউ নয়। 'এভাবে সরাসরি বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল—মি. নাফাজ, স্যার, আমি সত্যি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। যতদূর জানা আছে আমার, দেশের খুব নামকরা লোকদের মধ্যেও মাত্র দু'একজন নাফাজ ম্যানসনে অবাধে যাতায়াত করার অনুমতি আছে বলে গর্বের সাথে দাবি করতে পারে।'

'আনিসের কথা বলছ?' প্রশংসার সুর ফুটে উঠল নাফাজ মোহাম্মদের কণ্ঠে। 'ও আমার মেয়ের বন্ধু। কখনও দেখোনি, তার কারণ, নিজের কাজ নিয়ে এত বেশি ব্যস্ত থাকে, যে কাউকে দেখা দেবার সময় কমই পায়।'

একটু ইতস্তত করে বলল ঈগলটন, 'অনধিকার চর্চা হয়ে গেলে মাফ করবেন, তবু আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হিসেবে বলতে চাই, মেয়ে কার সাথে মেলামেশা করছে সেদিকে একটু নজর রাখা দরকার। আপনি একজন কোটিপতি, স্যার। টাকার লোভে ভাল মানুষ সেজে...'

শূন্যে হাত ঝাপটা মেরে ঈগলটনকে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'না দেখেশুনে প্রলাপ বকছ তুমি, ঈগলটন। আনিস? জানো এ-বাড়িতে ও আসা-যাওয়া করে বলে আমি রীতিমত গর্ব অনুভব করি?' হঠাৎ মুচকি হাসলেন

তিনি। 'তুমি কি ভেবেছ ওকে আমি পরীক্ষা করে দেখে নিতে বাকি রেখেছি? ওর জানা আছে এমন একটা তথ্য চাওয়া হয়েছিল ওর কাছ থেকে, বিনিময়ে নগদ দশ লক্ষ ডলারের প্রস্তাব ছিল। কিন্তু তথ্যটা জানালে আমার সম্মান হানি ঘটবে, শুধু এই কারণে প্রস্তাবটায় রাজী হয়নি আনিস। আরও অনেকভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে ওকে। এমন সৎ, নির্লোভ আদর্শ যুবক আমার জীবনে অন্তত আর দেখিনি আমি।'

ভাবলেশহীন মুখে কথাগুলো শুনল ঈগলটন। মনে মনে ঈর্ষা হচ্ছে তার। কতদিন ভেবেছে নিজের একটা ছেলেকে নিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দেবে এ-বাড়ির কর্তার সাথে, তারপর সুযোগ বুঝে ছেলেটা যদি অন্দরমহলে ঢুকতে পারে, যদি মন গলাতে পারে মিস শিরির···ব্যাপারটা অর্ধেক দুনিয়া জয় করার সমান। কিন্তু সাহস করে কোনদিন ছেলেকে আনতে পারেনি সে। যদি চটে গিয়ে শত্রুতে পরিণত হন নাফাজ মোহাম্মদ? যা মেজাজী লোক, কখন যে কি করে বসেন, ভেবে বসেন তার কিছু ঠিক ঠিকানা নেই।

'করে কি?' জানতে চাইল সে। 'থাকে কোথায়?'

'একটা ইনভেস্টিগেশন ফার্মের ব্রাঞ্চ চীফ ও,' বললেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'খুব একটা বেশি বেতন পায় না, কোনরকমে চলে আর কি। অথচ টাকার টোপ গেলে না। ওর অনেক গুনের মধ্যে এটা মাত্র একটা।' সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'ওদের মীটিংয়ের রিপোর্ট নিয়ে কালই তুমি আমার সাথে দেখা করছ, তাই না?'

উঠে দাঁড়িয়েছে ঈগলটনও। 'ইয়েস স্যার। গুডবাই, স্যার।' বিদায় নিয়ে চলে গেল সে।

ঈগলটনকে বিদায় দিয়ে সোজা নিজের স্টাডিরুমে চলে এলেন নাফাজ মোহাম্মদ। জরুরী কয়েকটা ফোন সেরে ফিরে এলেন ডাইনিংরুমে। বাটলার আর তার সঙ্গীরা লাঞ্চ পরিবেশন শুরু করেছে মাত্র। সহাস্যে নিজের চেয়ারে বসলেন তিনি। রসিকতা করে বললেন, 'তোমাদের প্রাইভেসি নষ্ট করছি না তো? সাক্ষাৎ প্রার্থীকে তাড়াতাড়ি বিদায় করে দিতে পেরে ভাবলাম আমার সঙ্গ তোমাদের খারাপ নাও লাগতে পারে···'

তাঁর কথা শেষ হলো না, ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল টেলিফোনটা। নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গিয়ে ক্রাডল থেকে রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল বাটলার আয়েদ আবদালী। কয়েক সেকেন্ড অপরপ্রান্তের বক্তব্য শুনে রিসিভারটা পিতলের চকচকে শেলফে রেখে টেবিলের দিকে এগিয়ে এল সে। আনিসের পাশে এসে দাঁড়াল, একটু ঝুঁকে নিচু গলায় বলল, 'আপনার ফোন, স্যার।'

'আমার ফোন?' ভুরু কুঁচকে উঠল আনিসের। ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। দ্রুত চিন্তা করছে, সে যে এই মুহূর্তে এখানে আছে তা কারও জানার কথা নয়। অফিসে, নিজের চেম্বারে, রুটিন বুকে শুধু লিখে রেখে এসেছে কত নম্বর ফোন করলে তাকে পাওয়া যাবে। কিন্তু কোনরকম ইমার্জেন্সী ছাড়া ওর চেম্বার খুলে সেই নম্বর দেখে ফোন করার অনুমতি নেই কারও, কথাটা অফিস সেক্রেটারির খুব ভালভাবেই জানা আছে।'

টেলিফোনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আনিস। কোন ইমার্জেন্সী দেখা দিয়েছে? ভাবছে সে। উঁহু, হাতে তেমন কোন সিরিয়াস কেস নেই, কিছুই তেমন ঘটতে পারে না যার জন্যে—রিসিভারটা তুলে চাপা, কিন্তু একটু রূঢ় কণ্ঠে বলল সে, 'হ্যালো? হু ইজ দেয়ার?'

'মাসুদ রানা।'

হাত থেকে রিসিভারটা পড়েই গেল, অকস্মাৎ এমন চমকে উঠেছে আনিস। ভাগ্যিস মেঝেতে পড়ে যাবার আগেই ক্ষিপ্র গতিতে আবার সেটাকে ছোঁ মেরে ধরে ফেলতে পারল সে। অভূতপূর্ব একটা শিহরণ বয়ে যাচ্ছে তার শরীরে। শুনতে ভুল করেনি তো সে? মাসুদ রানা? তার কল্পনায় কিংবদন্তীর নায়ক হয়ে আছে যে পুরুষ, রূপকথার সেই রাজপুত্র? তার বস্? সামনে থেকে যাকে কখনও দেখার সৌভাগ্য হয়নি আজও তার?

'এই মাত্র তোমার অফিসে এসেছি আমি,' অপরপ্রান্ত থেকে আশ্চর্য ভরাট, দৃঢ় কিন্তু অদ্ভুতভাবে শ্রবণেন্দ্রিয়কে পুলকিত করে তোলে এমন একটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে, 'হাতে জরুরী কোন কাজ থাকলে সেটা শেষ করে আমার সাথে দেখা করো।' যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল অপরপ্রান্ত থেকে।

তারপরও ঝাড়া পাঁচ সেকেন্ড রিসিভারটা কানের সাথে ঠেকিয়ে রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল আনিস। মনের ভেতর ঝড়-তুফান বইতে শুরু করেছে। একবার কিংবদন্তীর নায়ককে চোখে দেখতে পাবার ব্যাকুলতা অনুভব করছে, আরেকবার ভয়ে, শঙ্কায় কেঁপে উঠছে বুক, না জানি কি দোষ-ক্রটি ধরা পড়ে যাবে ভেবে। এত বড় ব্যক্তিত্ব, যার সম্পর্কে এজেন্টদের মুখে অবিশ্বাস্য অসাধারণ সব কাহিনী শুনে এসেছে, তার সামনে দাঁড়াতে কেমন লাগবে তার? কেমন দেখতে তিনি? কত বয়স তাঁর? তাকে কি ধমক মারবেন অফিস টাইমে বাইরে আছে বলে? হঠাৎ একটা তাড়া অনুভব করল সে। এখুনি যেতে হবে তাকে। ধীরে ধীরে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল ক্রাডলে। তারপর ঘুরে দাঁড়াল টেবিলের দিকে।

মি. নাফাজ এবং শিরি ফারহানা তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'দুঃখিত,' শান্ত, সংযত কণ্ঠে বলতে চেষ্টা করছে আনিস, কিন্তু শুকনো গলাটা কেঁপে যাচ্ছে একটু, 'অফিশিয়াল ডিউটি, এখুনি আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। দেখা হবে আবার…গুডবাই।'

'কি ব্যাপার, আনিস?' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শিরি ফারহানা। 'হঠাৎ এমন কি ঘটল যে…'

'দুঃখিত,' বলল আনিস, 'কেন চলে যেতে হচ্ছে তা ব্যাখ্যা করে বলা সম্ভব নয়

'কোন বিপদ নয় তো…' শুরু করতে যাচ্ছিলেন কোটিপতি।

'না।'

'নিশ্চয় এখুনি আবার ফিরে আসছ তুমি?'

'মনে হয় না,' বলল আনিস। 'আমাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। কেন, তা না জেনে কিছুই বলতে পারছি না আমি।' ঘুরে দাঁড়াল আনিস, দরজার দিকে এগোচ্ছে। 'পরে যোগাযোগ করব।'

আহত, অভিমানের সুরে পেছন থেকে বলল শিরি, 'কে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে? কে সেই লোক যার কথা শুনে আমাদেরকে ফেলে এভাবে চলে যাচ্ছ তুমি? তার তুলনায় আমরা তোমার কাছে এতই কি তুচ্ছ যে...'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল আনিস। ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল শিরির দিকে। আশ্চর্য শান্ত গলায় বলল সে, এবার তার গলা কাঁপল না একটুও, 'তাঁর তুলনায় আমার কাছে সবাই, সবকিছু তুচ্ছ, শিরি। আমি...আমার নিজের জীবন পর্যন্ত।'

হতভম্ব হয়ে গেছে শিরি। ফিস ফিস করে, নিজের অজান্তে দুটো শব্দ বেরিয়ে এল তার গলার ভেতর থেকে, 'কে তিনি?'

'আমার বস্।'

বাইরে বেরিয়ে এসে নিজের গাড়িতে স্টার্ট দেবার সময় ভাবছে আনিস, যা সে চায়নি তাই ঘটে গেল। ফ্লোরিডায় বসের উপস্থিতি গোপন রাখতে পারেনি সে। ঝোঁকের মাথায় নিজের অজান্তে কথাটা প্রকাশ হয়ে গেছে। অবশ্য, সান্ত্বনা এইটুকু যে যাদের কাছে প্রকাশ পেয়েছে তারা দু'জনেই তার শুভানুধ্যায়ী, তাকে ভালবাসে।

অফিসে ফেরার পথে কিংবদন্তীর নায়কের চেহারাটা কল্পনা করার চেষ্টা করছে আনিস। হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে দেখল, অফিস বিল্ডিংয়ের পাশ ঘেঁষে চলে যাচ্ছে গাড়ি। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল সে। পার্কিং লটে গাড়ি ঢুকিয়েই লাফ দিয়ে নামল গাড়ি থেকে। তারপর ছুটল এলিভেটরের দিকে।

দুই

রানা এজেন্সী।

একটা অফিস বিল্ডিংয়ের থার্ড ফ্লোরের চারটে কামরা নিয়ে ওদের ফ্লোরিডা ব্রাঞ্চ। প্রথম কামরাটায় রিসেপশনিস্ট কাম অফিস সেক্রেটারি মিস লিজা বসে। তার পাশেই আনিসের চেম্বার। চেম্বারের পিছনে আরেকটা কামরা আছে। সেখানেই সাধারণত রাত কাটায় আনিস। রিসেপশন রুমের আরেক পাশে রয়েছে শেষ কামরাটা। এটা অত্যন্ত বিলাসবহুল ভাবে সাজানো কিন্তু এই কামরার চাবি কার কাছে আছে তা কেউ জানে না। আনিসের শুধু এইটুকু জানা আছে যে কামরাটা ইনভেস্টিগেশন ফার্মের বস্ মাসুদ রানার ব্যক্তিগত চেম্বার, তিনি যদি কখনও কোন কারণে ফ্লোরিডার এই ব্রাঞ্চ অফিসে পায়ের ধুলো দেবার প্রয়োজন বোধ করেন, সাথে করে নিশ্চয়ই চাবিটা নিয়ে আসবেন।

আজ তিন বছর হলো রানা এজেন্সীতে ঢুকেছে আনিস। ক্রিমিনোলজি নিয়ে লেখাপড়া করছিল ফ্লোরিডায়। দেশে, রংপুরে, বাপ চাচাদের আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল, চাকরি না করলেও স্বচ্ছলতার মধ্যে কেটে যেত জীবনটা। ক্রিমিনোলজির দিকে ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, মনে স্বপ্ন ছিল লেখাপড়া শেষ করে দেশে ফিরে যাবে, শুরু করবে শখের গোয়েন্দাগিরি। দুর্নীতি আর অপরাধে ছেয়ে গেছে দেশটা,

যদি কোটিভাগের একভাগও নির্মূল করতে পারে সে. কিছুটা উপকার তো করা হবে মাতৃভূমির।

পরীক্ষা শেষ, দেশে ফেরার উদ্যোগ নিচ্ছে আনিস, ঠিক এই সময় রানা এজেন্সীর তরফ থেকে একটা চিঠি পেল সে। চিঠির সারমর্ম ছিল এই রকম: মি. আনিস আহমেদ, রানা এজেন্সী তোমার সম্পর্কে জানতে পেরেছে তুমি একজন আদর্শ দেশপ্রেমিক, দেশের ভালর জন্যে কিছু করতেও উৎসাহী। দেশও তোমার কাছ থেকে সার্ভিস চায়। এবং রানা এজেন্সীর সাথে জড়িত কর্মকর্তারা মনে করেন এই ফ্লোরিডায় থেকেও তুমি দেশের জন্যে অনেক কিছু করতে পারো। এই মুহূর্তে এর বেশি কিছু তোমাকে জানানো সম্ভব নয়। যদি উৎসাহ এবং আগ্রহ বোধ করো, নিচের ঠিকানায় আগামী সোমবার সকাল এগারোটায় নিম্ন স্বাক্ষরকারিণীর সাথে দেখা করো।

চিঠির নিচে ঠিকানা ছিল এই অফিসটার। সদ্য সাজানো হয়েছে ব্রাঞ্চটা, কিন্তু কাজ শুরু হয়নি। চিঠির নিচে স্বাক্ষর ছিল ফার্মের ভাইস চেয়ারম্যান মিস সোহানা চৌধুরীর।

নির্দিষ্ট দিনে এই অফিসে হাজির হয়েছিল আনিস। সোহানা চৌধুরীর সাথে কথা বলে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছিল জন্মগ্রহণের মুহূর্তটি থেকে আজ পর্যন্ত তার জীবনে যা কিছু ঘটেছে, সবই কি এক অলৌকিক উপায়ে জেনে ফেলেছেন তীক্ষ্ণধার বুদ্ধিমতী দুর্দান্ত স্মার্ট ভদ্রমহিলাটি। রানা এজেন্সীর নাম তার আগেই শোনা ছিল, কিন্তু তাদের যোগ্যতা এবং কর্মদক্ষতার প্রমাণ পেল সেই প্রথম। এরপর সোহানা চৌধুরী যখন তাকে চাকরির প্রস্তাব দিল, সেই মুহূর্তে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে সাথে সাথে রাজী হয়ে গিয়েছিল আনিস।

এরপর হাতে কলমে কাজ শেখার জন্যে এক বছর বিভিন্ন ব্রাঞ্চে কাজ করতে হয়েছে তাকে, সবশেষে দায়িত্ব পেয়েছে এই ফ্লোরিডার ব্রাঞ্চ চীফ-এর। এই তিন বছরেও পরিষ্কার কোন ধারণা হয়নি তার রানা এজেন্সী সম্পর্কে। কেমন যেন ঘোলাটে ব্যাপার। রহস্যময়। প্রচার করা হয় এটা একটা প্রাইভেট ফার্ম, কিন্তু এমন সব কাজ করতে হয় ব্রাঞ্চগুলোকে যেগুলো নিখুঁতভাবে পরিচালিত ব্যাপক-ভিত্তিক একটা কাউন্টার এসপিয়োনাজ নেটওয়ার্কের অংশ ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না আনিসের। কেউ ওকে কিছু জানায়নি, কিন্তু তবু কেন যেন মনে হয় তার, সরাসরি বাংলাদেশ সরকারের একজন কর্মী হিসেবে এই চাকরিতে রাখা হয়েছে তাকে। তার অনুমান যদি সত্যি হয়, এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কি হতে পারে!

দুরু দুরু বুকে রিসেপশনে ঢুকল আনিস। ঝড়ের বেগে টাইপ করছে লিজা। ওর পায়ের আওয়াজ পেয়ে নয়, অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারল, দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে কেউ। স্বর্ণকেশী শ্বেতাঙ্গিনী অল্প বয়েসী মেয়েটা ঝট্ করে মুখ তুলে তাকাল। চোখাচোখি হলো দু'জনের, দু'জন একসাথে ঢোক গিলল।

ধীর পায়ে এগিয়ে এসে ডেস্কের সামনে দাঁড়াল আনিস। দশটা আঙুল টাইপ মেশিনের কী বোর্ডের ওপর বিদ্যুৎবেগে খেলা করে চলেছে, থামার কোন লক্ষণ নেই। একটা শীটের প্রায় অর্ধেকটা টাইপ করে ফেলেছে লিজা। একটা দরজার দিকে ইঙ্গিত করে নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল সে। অর্থাৎ, এখানে নয়, ওখানে

যাও—বস্ তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গিয়ে বসের চেম্বারে নক করল আনিস। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'মে আই কাম ইন, স্যার?'

'না,' চেম্বারের ভেতর থেকে ভারী কণ্ঠস্বর ভেসে এল, ছ্যাঁৎ করে উঠল আনিসের বুক, 'স্যার নয়।' একটু বিরতি, তারপর শোনা গেল, 'মাসুদ ভাই বলতে পারো। ইয়েস, কাম ইন, আনিস।'

দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকল আনিস। ওর দিকে পেছন ফিরে, বুক শেলফের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে দীর্ঘদেহী এক যুবক। লম্বায় প্রায় ছয় ফিট। পরনে দামী স্যুট। ব্যাকব্রাশ করা ঘন কালো চুল। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল রানা। সরল হাসি দেখতে পাচ্ছে আনিস তার বসের ঠোঁটে। প্রথম যে জিনিস দুটোর দিকে তাকাল আনিস, সেখানেই চুম্বকের মত আটকে গেল ওর দৃষ্টি।

অদ্ভুত একজোড়া চোখ। সেখানে সাগরের অতল গভীরতা, কি এক যাদুমাখা দৃষ্টি, একবার তাকালে মনে হয় সম্মোহন করছে, এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া না পাওয়া নির্ভর করছে ওই আশ্চর্য চোখজোড়ার মালিকের ওপর। কিন্তু যাকে বলে ভয়, সেরকম কোন অনুভূতি হচ্ছে না আনিসের। বসের বয়স এত কম তা সে কল্পনাও করতে পারেনি। তার চেয়ে বড়জোর দু'তিন বছরের বড় হবে। সুঠাম শরীর। প্রশস্ত কপাল। চিকন কোমর। পা বাড়াল ধীর ভঙ্গিতে, ডেস্কের পেছনে রিভলভিং চেয়ারটার দিকে এগোচ্ছে রানা। আশ্চর্য একটা সাবলীল ছন্দ রয়েছে হাঁটার ভঙ্গিতে, কিন্তু কি অদ্ভুত দৃঢ়তা ফুটে উঠছে প্রতিটি পা ফেলার সাথে।

রিভলভিং চেয়ারে বসে গা এলিয়ে দিল রানা। বলল, 'বসো।'

নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে ডেস্কের এধারের একটা চেয়ারে বসে পড়ল আনিস। শিরদাঁড়া খাড়া, কান দুটো সজাগ, চোখ দুটো সতর্ক।

'কাজকর্ম কেমন চলছে তোমাদের?' হালকা সুরে জানতে চাইল রানা।

'ভাল, স্যা…মাসুদ ভাই,' দ্রুত বলল আনিস। বস্ একেবারে মাটির মানুষ, ভয় পাবার কিছুই নেই, এসব কয়েক সেকেন্ডেই বুঝে নিয়েছে সে। কিন্তু মানুষটার মধ্যে আশ্চর্য একটা ব্যক্তিত্বের প্রকাশ লক্ষ করে কেমন যেন জড়সড় হয়ে যাচ্ছে, কোনমতে স্বাভাবিক হতে পারছে না। 'গত মাসের রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছি হেডকোয়ার্টারে, আপনি দেখতে চাইলে এক কপি এখুনি আপনাকে দেখাতে পারি।'

'তার কোন দরকার নেই,' একটা চুরুট ধরাল রানা। 'সময় পাই না, তাই তোমাদের গত ক'মাসের রিপোর্ট দেখার সুযোগ হয়নি আমার। কিন্তু সোহানার মুখে শুনলাম তোমরা এখানে নাকি দারুণ ভাল কাজ দেখাচ্ছ। খুব বেশি চাপ নাকি কাজের? আরও লোক দরকার?'

'পেলে ভাল হয়,' বলল আনিস। 'লোক নেই বলে অনেক কেস ফিরিয়ে দিতে হয়। তাছাড়া, এমন কিছু কেস আসে, আমার একার বুদ্ধিতে সেগুলোর রহস্য ভেদ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না…'

'ঠিক,' বলল রানা। 'পরামর্শ করার কেউ থাকলে অনেক জটিল সমস্যা পানির মত সহজ হয়ে যায়। হাতে তেমন জটিল-কেস আছে নাকি, যেগুলোর সমাধান

পাচ্ছ না?'

'আছে, মাসুদ ভাই,' এখন অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে আনিস, তবু একটা ঢোক গিলে সাহস সঞ্চয় করতে হলো তাকে। 'চার-পাঁচটা কেস আছে যার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না। গত দুই মাস ধরে ভোগাচ্ছে...'

'ফাইলগুলো নিয়ে এসো, একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে দেখি তোমার কোন সাহায্যে লাগতে পারি কিনা।'

লিজাকে ডেকে ফাইলগুলো আনিয়ে নিল আনিস। একেকটা ফাইলে চোখ বুলাতে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় নিল না রানা। প্রথম ফাইলটা দেখা শেষ করে মুখ তুলে তাকাল সে। বসের আরেক রূপ দেখতে পাচ্ছে আনিস। চিন্তান্বিত, গম্ভীর, চোখের দৃষ্টিতে সাধকের ধ্যানমগ্নতা। 'নোট নাও,' বলল সে।

দ্রুত কাগজ কলম টেনে নিয়ে তৈরি হয়ে গেল আনিস। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে চোখ বুজে কি যেন চিন্তা করছে মাসুদ ভাই।

টিক্ টিক্ করে সরে যাচ্ছে সেকেন্ডের কাঁটা। ঝাড়া এক মিনিট চুপ করে বসে আছে রানা। তারপর হঠাৎ, চোখ না খুলেই কথা বলতে শুরু করল ও।

ঝড়ের বেগে শর্টহ্যান্ডে নোট নিচ্ছে আনিস। মুখস্থ বুলির মত প্রথম কেসটার লাইন অফ অ্যাকশন জানিয়ে দিচ্ছে রানা। বিস্ময়ে সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে আনিসের। মানুষ না সর্বজ্ঞ ফেরেশতা? ভাবছে সে, গত দুই মাস ধরে যে কেসের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারেনি সে, সেই কেসের এমন সহজ সরল সমাধান হতে পারে, ভাবাই যায় না। বুদ্ধির তুলনামূলক বিচারে নিজেকে মাসুদ ভাইয়ের কাছে অবোধ শিশু ছাড়া কিছুই মনে হচ্ছে না তার। নোট নিতে নিতে পরিষ্কার অনুধাবন করছে সে কেসটার একটাই মাত্র সম্ভাব্য সমাধান আছে, এবং সেটাই গড়গড় করে বলে যাচ্ছে তার সামনে বসা আশ্চর্য লোকটা।

শুধু প্রথম কেসটা নয়, প্রতিটি কেসের বেলাতেই এই একই ঘটনা ঘটল। আধ ঘণ্টার মধ্যে পাঁচটা কেসের সুরাহা হয়ে গেল। নোট নেয়া শেষ করে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে আনিস। মাসুদ ভাইয়ের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করার অদম্য ইচ্ছাটাকে দমন করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

'আমি জাদু জানি, তা মনে কোরো না,' আনিসের মনোভাব টের পেয়ে মৃদু হেসে বলল রানা। 'প্রতিটি সমস্যার সমাধান বের করার নির্দিষ্ট ছক রয়েছে। কোন্ কেস কোন্ ছকে পড়বে সেটা বুঝে নিতে পারলেই সব পানির মত সহজ। তোমার চেয়ে কিছু বেশি ছক জানা আছে আমার, তাই এগুলোর সমাধান করে দিতে পারলাম। তোমার জানা থাকলে তুমিও পারতে।' একটু বিরতি নিয়ে নিভে যাওয়া চুরুটে আগুন ধরাল রানা। তারপর আবার বলল, 'অভিজ্ঞতা...আর কিছুই নয়। নোটগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লেই কি ধরনের ছকে ফেলে সমাধান বের করেছি তা তোমার জানা হয়ে যাবে। তার মানে, নতুন পাঁচটা ছক শেখা হয়ে যাবে তোমার। এরপর এই জাতের কোন কেস নিয়ে তোমাকে আর ভুগতে হবে না।'

একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল রানা, মুচকি একটু হাসল। 'হাতে তেমন কোন কাজ নেই আজ বিকেল পর্যন্ত; সময়টা তোমাদের সাথে আড্ডা মেরে কাটিয়ে দিই, কি

বলো? তিন প্যাকেট লাঞ্চ আনিয়ে নিলে কেমন হয়? কিন্তু···আচ্ছা, তোমাদের জরুরী কোন কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করছি না তো আবার?'

'না না!' ব্যস্তসমস্ত ভাবে উঠে দাঁড়াল আনিস। 'এক্ষুণি লাঞ্চ আনতে পাঠাচ্ছি।'

রানার ইঙ্গিত পেয়ে তখুনি আবার নিজের চেয়ারে বসে পড়ল আনিস। 'তোমাকে উঠতে হবে না, লিজাকে ডেকে পাঠাও।' লিজা এসে চেম্বারে ঢুকতে তাকে পঞ্চাশ ডলারের একটা নোট বের করে দিল রানা। 'তিন প্যাকেট লাঞ্চ, আর এক ফ্লাস্ক কফি।'

'ইয়েস, মাসুদ ভাই!' চেম্বার থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল লিজা।

রিভলভিং চেয়ারে একটু নড়ে চড়ে বসল রানা। 'বাড়িতে চিঠিপত্র লেখো নিয়মিত? টাকা পয়সা পাঠাও তো?'

'মাসে একটা করে চিঠি লিখি,' একটু হেসে বলল আনিস। 'কিন্তু বাবার চিঠি পাই প্রতি হপ্তায়। আর টাকা···টাকার তো ওঁদের কোন দরকার নেই।'

'তবু পাঠানো উচিত,' বলল রানা। 'বিদেশ থেকে ছেলের টাকা এলে ধনী বাবার বুকটাও গর্বে ভরে ওঠে।' একটু বিরতি নিয়ে আবার বলল রানা, 'তোমার ছোট ভাইটা তো এ বছরই ভার্সিটি থেকে বেরুচ্ছে। লোক দরকার বলছিলে, ওকেই ডেকে পাঠাও না। খুব ব্রিলিয়্যান্ট ছেলে। তোমার কাছে থাকলে অল্পদিনেই কাজ শিখে নিতে পারবে।'

মাসুদ ভাই তার পরিবারের এত খবরও রাখেন! সবিস্ময়ে ভাবছে আনিস। নিঃশব্দে মাথা নেড়ে জানাল, তাই করবে সে।

'আচ্ছা, মি. নাফাজ মোহাম্মদের কেসটার কথা তো বললে না?' অকস্মাৎ প্রসঙ্গ বদলে জানতে চাইল রানা। 'নাকি ওটা তেমন জটিল কিছু বলে মনে হচ্ছে না তোমার?'

'আমি ঠিক···মাসুদ ভাই, মি. নাফাজ তো আমাকে কোন কেস দেননি! মাস কয়েক আগে অবশ্য···'

'ও, তাহলে আমিই ভুল অনুমান করেছি,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'ফোন নাম্বারটা নাফাজ ম্যানসনের কিনা, ওখানে গেছ জেনে ভাবলাম কেস-টেসের ব্যাপারেই বুঝি ডেকেছেন তোমাকে।'

'না···মানে, ভদ্রলোকের সাথে পরিচয় আছে,' ঘামতে শুরু করেছে আনিস। শিরির সাথে ওর সম্পর্ক চেপে যাওয়াই ভাল, ভাবছে সে। 'আজ আমাকে লাঞ্চ খাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করেছিলেন।'

'ওঁর মেয়ের সাথে তো বেশ ভাল পরিচয় আছে তোমার?' জানতে চাইল রানা, যেন কিছুই জানে না ও। 'সাবজেক্ট আলাদা হলেও, তোমরা তো একই কলেজে পড়াশোনা করেছ।'

'জ্বী,' ঢোক গিলে বলল আনিস। 'পরিচয় আছে।'

'খুব ভাল মেয়ে,' প্রশংসার সুরে বলল রানা। তারপর, হঠাৎ, উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ওর মুখ। কৌতূহলে চিক চিক করছে চোখ দুটো। 'চান্স কেমন? মনে খটকা থাকলে আমাকে জানিয়ো, হয়তো সাহায্য করতে পারব।'

দ্বিধা-সঙ্কোচ, ভীতি—সব উড়ে গেল আনিসের মন থেকে এবার। হেসে উঠল সে। 'কোথাও কোন খটকা নেই, মাসুদ ভাই। বাপ-মেয়ে দু'জনেই প্রতীক্ষায় আছে কবে আমি প্রস্তাবটা দেব ওদেরকে।'

'ভেরি গুড,' হঠাৎ একটু গম্ভীর হলো রানা। 'কিন্তু এখুনি প্রস্তাবটা দিতে যেয়ো না। বিপদটা আগে কেটে যাক।'

'বিপদ?' আকাশ থেকে পড়ল আনিস। 'কিসের বিপদ, মাসুদ ভাই?'

'সময় হলে নিজেই দেখতে পাবে,' বলল রানা। 'ভাল কথা, নাফাজ মোহাম্মদের ব্যবসা সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখো কিছু?'

'অনেক রকম ব্যবসা তাঁর, তেলের ব্যবসাটাই প্রধান,' বলল আনিস। 'এর বেশি তেমন কিছু জানি না।'

'মারমেইডের নাম শোনোনি?' জানতে চাইল রানা। 'সাগর কন্যা?'

'মারমেইড?' মনে পড়ে যেতেই দ্রুত ওপর-নিচে মাথা দোলাল আনিস। 'হ্যাঁ। হ্যাঁ, শুনেছি নামটা। যতদূর জানি, ওটা ওদের একটা নাম করা ড্রিলিং রিগ। কিন্তু বিশদ কিছু জানি না।'

'জেনে রাখো, কাজে লাগতে পারে,' বলল রানা। নতুন একটা চুরুট ধরাচ্ছে ও।

দ্রুত কাজ করছে আনিসের মাথা। মাসুদ ভাই বিপদের কথা বলছেন। কার বিপদ? নাফাজ মোহাম্মদের? নিশ্চয়ই তাই। তা নাহলে ড্রিলিং রিগ সম্পর্কে তথ্য জানাতে চাইছেন কেন তাকে? তবে কি বিপদের গন্ধ পেয়েই ফ্লোরিডায় সশরীরে এসেছেন মাসুদ ভাই? কিন্তু নাফাজ মোহাম্মদের সাথে রানা এজেন্সীর সম্পর্ক কি? সবকিছু ঝাপসা লাগছে তার কাছে। কিন্তু পরিষ্কার হবার জন্যে প্রশ্ন করা উচিত হবে না। যতটুকু জানানো প্রয়োজন বলে মনে করবেন, ভাবছে সে, ততটুকুই জানাবেন মাসুদ ভাই তাকে। প্রশ্ন করলেও তার বেশি কিছু জানা সম্ভব হবে না।

মাথা নিচু করে কি যেন ভাবছে রানা। তারপর হঠাৎ করেই বলতে শুরু করল ও।

ঝাড়া সাত মিনিট প্রায় একনাগাড়ে কথা বলে গেল রানা। এর মধ্যে থামল মাত্র পাঁচবার, তাও প্রতিবার তিন সেকেন্ডের বেশি নয়। চারবার চুরুট ফুঁকল, একবার খুক-খুক করে কাশল—বোধহয় হাসি চেপে রাখার চেষ্টা।

গভীর মনোযোগের সাথে শুনে যাচ্ছে আনিস, প্রতিটি শব্দ যেন গিলে নিচ্ছে সে, গেঁথে রাখছে মনের তথ্যকুঠরিতে।

'সাগরের তলায় তেল আবিষ্কার আর তোলা, প্রথমে এ-প্রসঙ্গে কিছু বলতে হয়। সাধারণত দু'ধরনের যান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে এই কাজে। প্রথমটা, যার আসল কাজ তেল আবিষ্কার করা: সেটা কি রকম? এটা একটা সেলফ-প্রপেল্ড জলযান, আকারে ছোট, মাঝারি, বড় আবার বিশালও হতে পারে। সচরাচর আমরা যেসব সমুদ্রগামী কার্গো জাহাজ দেখি সেগুলোর মতই দেখতে, তবে এটার রয়েছে খুব উঁচু মিনারের মত ড্রিলিং ডেরিক, যা অন্যান্য জাহাজে দেখা যায় না। সিসমোলজিক্যাল এবং জিয়োলজিক্যাল পরীক্ষার ফল দেখে যে-সব এলাকায় তেল পাবার সম্ভাবনা আছে বলে মনে করা হয় সে-সব এলাকায় গভীর গর্ত করাই এর

কাজ। এই কাজের টেকনিক্যাল অপারেশনের দিকটা অত্যন্ত জটিল, তা সত্ত্বেও এ-ধরনের জলযান বেশ সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু, এর আবার বড় বড় দুটো অসুবিধে রয়েছে। জাহাজগুলোর অত্যাধুনিক, প্রথম শ্রেণীর নেভিগেশন্যাল ইকুইপমেন্ট রয়েছে, রয়েছে বো-থ্রাস্ট প্রপেলার, যাতে ছুটন্ত স্রোত, শক্তিশালী ঢেউ আর কড়া বাতাসের মধ্যেও নিজের পজিশনে স্থির থাকতে পারে—কিন্তু কাজের বেলায় দেখা যায়, এ-ধরনের পরিস্থিতিতে সাগরের তলায় গর্ত করা সাংঘাতিক কঠিন, সবদিক সামলাতে নাভিশ্বাস উঠে যায় টেকনিশিয়ানদের। দ্বিতীয় অসুবিধে হলো, সত্যিকার খারাপ আবহাওয়ায় কিছুই করার থাকে না এর, তখন বাধ্য হয়ে বন্ধ করে দিতে হয় সমস্ত অপারেশন।'

একটু থামল রানা। চোখেমুখে বিস্ময় নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে আনিস। মৃদু হাসল রানা। দম নিয়ে আবার শুরু করল:

'দ্বিতীয় যান্ত্রিক ব্যবস্থা, এর প্রচলিত নাম—"জ্যাক আপ সিস্টেম"। এর কাজ সাগরের তলায় গর্ত করা আর তেল তোলা—বিশেষ করে তোলার কাজেই ব্যবহার করা হয় একে। প্রায় সারা দুনিয়ায় এই সিস্টেম পরিচিত, সবখানে কাজও করছে। এ-ধরনের একটা রিগকে টেনে নিয়ে দাঁড় করানো হয় নির্দিষ্ট পজিশনে। বিশাল প্ল্যাটফর্ম রয়েছে এর, সেখানে ড্রিলিং রিগ, ক্রেন, হেলিপ্যাড সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সার্ভিস এবং ক্রু আর টেকনিশিয়ানদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। এর পা রয়েছে কয়েকটা। সেগুলো সাগরের মেঝের সাথে শক্তভাবে নোঙর করা। স্বাভাবিক আবহাওয়ায় খুব ভাল কাজ দেখাতে পারে, কিন্তু প্রথমটার মত এটারও একাধিক অসুবিধা রয়েছে। নড়েচড়ে না, তাই সরিয়ে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। মাঝারি ধরনের খারাপ আবহাওয়া দেখা দিলেই সমস্ত অপারেশন বাতিল করে দিতে হয়। তাছাড়া, শুধু অগভীর পানিতে ব্যবহার করা চলে, পানির গভীরতা যেখানে খুব বেশি সেখানে এটা অচল। তবে, নর্থ সী-র জন্যে খুবই উপযোগী। এই জাতের রিগগুলোকে ওখানেই সবচেয়ে বেশি দেখতে পাওয়া যায়। নর্থ সী-তে কাজ করছে যেগুলো তাদের পায়ের মাপ লম্বায় সাড়ে চারশো ফিটের মত। পাগুলোকে আরও লম্বা করে তৈরি করতে হলে খরচের বহর যে হারে বেড়ে যায়, হিসেব করে দেখা গেছে, তাতে তেল উত্তোলন লোকসানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তবে, তা সত্ত্বেও আমেরিকানরা ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলে একটা রিগ তৈরি করার প্ল্যান করছে, যার পায়ের দৈর্ঘ্য হবে আটশো ফিট। যাই হোক, এর আবার আরেক সমস্যা আছে—অজ্ঞাত বিপদের শিকার হওয়ার ভয়। এই জাতের দুটো রিগ এরই মধ্যে হারাতে হয়েছে নর্থ সী-তে। এই ক্ষতির কারণ পরিষ্কার ভাবে জানা না গেলেও, লক্ষণ দেখে সন্দেহ করা হয় যে ডিজাইন, মেটালিক অথবা কাঠামোগত ত্রুটি ছিল এক বা একাধিক পায়ে।

'এই তো গেল দু'ধরনের অয়েল রিগের ভালমন্দ, এবার আরেক টাইপের রিগের প্রসঙ্গে আসা যাক। এর টেকনিক্যাল নাম, টেনশন লেগ ড্রিলিং প্রোডাকশন প্ল্যাটফর্ম। সংক্ষেপে টি.এল.পি.; এ-ধরনের ড্রিলিং রিগ মাত্র একটাই আছে বর্তমান দুনিয়ায়। প্ল্যাটফর্ম—ওয়ার্কিং এরিয়া—আকারে একটা ফুটবল মাঠের মত, অবশ্য কেউ যদি তেকোনা একটা ফুটবল মাঠের ছবি কল্পনা করতে পারে।

যাই হোক, প্ল্যাটফর্মটা নিখুঁত একটা ত্রিভুজ। ডেকটা স্টীলের নয়, ফেরো-কংক্রিটের গুণগত মান বিশেষ ভাবে উন্নত করে একটা ডাচ জাহাজ কোম্পানী ডিজাইনটা প্রস্তুত করেছে। বিশাল প্ল্যাটফর্মটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে ইস্পাতের প্রকাণ্ড তিনটে পা। এই পায়ের ডিজাইন করা হয়েছে ইংল্যান্ডে, তৈরিও হয়েছে সেখানে। পা তিনটে গোটা কাঠামোর তিন কোণে দাঁড়িয়ে আছে, তিনটেকেই পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করে রেখেছে নানা আকৃতির গোল আর আড়াআড়ি ফাঁপা সিলিন্ডার—এগুলোর সমষ্টি এমন ব্যাপক পরিমাণে ভাসমানতার সৃষ্টি করে রাখে যে ঢেউ যত উঁচুই হোক না কেন, ওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্মকে নাগালের মধ্যে ধরতে পারে না।

'প্রতিটি পায়ের গোড়া থেকে তিনটে করে সাংঘাতিক মোটা স্টীল কেব্‌ল বেরিয়ে এসে সাগর-তলার ভিত পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেচে। প্রতিটি সেটকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করে রেখেছে বিরাট আকারের সব নোঙর। আধুনিক ফিক্সড অয়েল ডেরিকের চেয়ে দুই থেকে তিনগুণ বেশি উঁচুতে ওঠানো বা নিচে নামানো যায় এর বিশেষভাবে তৈরি করা ডেরিকগুলো, এই কাজে অত্যন্ত শক্তিশালী মোটর ব্যবহার করা হয়। তার মানে, উপকূল থেকে অনেক দূরে, কন্টিনেন্টাল শেলফের গভীর পানিতেও অপারেশন চালাতে পারে এটা।

'উল্লেখযোগ্য আরও অনেক সুবিধা রয়েছে টি.এল.পি.-র।

'এর ব্যাপক ভাসমানতার ফলে অ্যাঙ্কর কেবলে অব্যাহত টান পড়ে, এই টানই আসলে প্ল্যাটফর্মটাকে দোলা খেতে, ঝাঁকি খেতে বা কাত হয়ে যেতে বাধা দিচ্ছে। ফলে আবহাওয়া যত খারাপই হোক না কেন, এই রিগ তার অপারেশন চালু রাখতে পারে, অন্য সব ডেরিকের বেলায় যা চিন্তাও করা যায় না।

'ভূমিকম্পে সাগর-তলা কেঁপে উঠলেও তেমন কোন ধকল সামলাতে হয় না একে।

'এটাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ইচ্ছে করলেই সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। স্রেফ নোঙরগুলো তুলে নিলেই হলো, তারপর শুধু যেখানে আরও বেশি তেল রয়েছে সেখানে চলে যাওয়ার অপেক্ষা। প্রচলিত অয়েল রিগগুলোর তুলনায় যে-কোন পজিশনে নিয়ে গিয়ে বসাতে এর পেছনে খরচ একটু বেশি পড়ে, কিন্তু সুবিধে ও লাভের তুলনায় সেটা কিছু নয়।

'এই টি.এল.পি.-র নামই মারমেইড বা সাগর কন্যা। কিছুদিনের মধ্যেই কাজে লাগবে তোমার এই তথ্যগুলো।'

রানার জ্ঞানের বহর দেখে হাঁ হয়ে গেছে আনিস। শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ওর মুখের দিকে।

চুরুট ধরিয়ে মুচকে হাসল রানা।

'আমাকে তুখোড় এক জিনিয়াস মনে হচ্ছে, তাই না? এমন পণ্ডিত ব্যক্তি লাখে একটা পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। যাই হোক, যা বলেছি সব মনে থাকবে তো?' আনিসকে অনিশ্চিত ভাবে চুপ করে থাকতে দেখে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল রানা। 'কি, মনে থাকবে না? এই স্মরণশক্তি? তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত, আনিস। ঠিক আছে,' টেবিলের নিচ থেকে বাম হাতে ধরা একটা কাগজের শীট তুলে এগিয়ে দিল

সে আনিসের দিকে। 'মনে না থাকলে এই শীটটা রাখো, বার কয়েক নজর বুলালেই মুখস্থ হয়ে যাবে।'

হাত বাড়িয়ে টাইপ করা কাগজের শীটটা নিল আনিস। প্রথম কয়েক লাইনের ওপর চোখ বুলিয়েই সন্দেহ ফুটে উঠল ওর দু'চোখে। চট করে চাইল রানার মুখের দিকে।

'এতক্ষণ এর থেকেই পড়ে শোনাচ্ছিলেন, মাসুদ ভাই?'

'নিশ্চয়ই!' জোরের সাথে বলল রানা। 'অত কথা মনে থাকে কারও? পাগল?'

হা-হা করে হেসে উঠল আনিস, রানাও যোগ দিল সে হাসিতে। মুহূর্তে অদ্ভুত এক অন্তরঙ্গ বন্ধন সৃষ্টি হলো দু'জনের মধ্যে। অন্তরের অন্তস্তলে উপলব্ধি করল আনিস, মাসুদ ভাই আসলে ওর বস্ নয়, বড় ভাইও নয়—বন্ধু।

তিন

লেক তাহো। শুক্রবার। রুবার্ট অরবেনের বাগানবাড়ি। সবাই জানে, গ্রীষ্মকালীন ছুটি কাটাতে এসেছে অরবেন। আসল কারণ তা নয়। প্রথম সারি থেকে বাছাই করা মার্কিন এবং অন্যান্য কয়েকটা দেশের তেল ব্যবসায়ীদেরকে নিয়ে গোপন মীটিং ডেকেছে সে। তাকে নিয়ে ব্যবসায়ীদের সংখ্যা দশজন, এরা সবাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তেল সরবরাহ করে, এদের সবার স্বার্থ এক সুতোয় গাঁথা।

আজকের এই রুদ্ধদ্বার কক্ষের গোপন বৈঠকে আলোচনার বিশেষ কিছু নেই। যা আলোচনার তা অনেকদিন থেকেই হয়ে আসছে। নাফাজ অয়েল কোম্পানীর কাছে মার খাচ্ছে এদের সবার ব্যবসা। এদের বিশ্বাস, এর জন্যে দায়ী কোম্পানীটার কূট ব্যবসা-নীতি। নাফাজ মোহাম্মদের এই ব্যবসা-নীতির সাথে পাল্লা দিয়ে টিকতে পারছে না তারা। সঙ্কট থেকে মুক্তি পাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে সবাই, কিন্তু কোন সমাধান বের করতে সমর্থ হয়নি। শেষপর্যন্ত সবাই একমত হয়েছে, টিট ফর ট্যাট ছাড়া উপায় নেই—অর্থাৎ কাঁটা দিয়েই তুলতে হবে কাঁটা। আজকের বৈঠকে সেই কাঁটা তোলারই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

এই বৈঠকের উদ্যোক্তা অরবেন, সুতরাং সবাই তার কাছ থেকেই একটা প্রস্তাব আশা করছে।

উপস্থিত দশজন ব্যবসায়ীর মধ্যে চারজন আমেরিকান, এদের মধ্যে মাত্র দু'জনের নাম উল্লেখের দাবি রাখে। ঈগলটন, ফ্লোরিডা এলাকার তেল এবং অন্যান্য খনিজ পদার্থের লীজ হোল্ডার ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিত্ব করছে সে। অরবেন, সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার বাইরের এলাকার ড্রিলিং রিগ কোম্পানীগুলোর প্রতিনিধিত্ব করছে।

বাকি ছয়জনের মধ্যেও মাত্র দু'জনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। একজন ভেনিজুয়েলার বেলোনি, আরেকজন রাশিয়ার নিশ্চেভ।

মীটিংয়ের উদ্যোক্তা হিসেবে সভাপতির আসনে বসেছে অরবেন। সেই প্রথম

কথা বলছে।

'...আমরা সবাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে তেল বেচি। এই মুদ্রামান পড়তির যুগে আমরা কেউ চাই না আমাদের তেলের দাম কমে যাক। ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে হলে ঘন ঘন দাম বাড়াতে হবে আমাদেরকে। কিন্তু বাড়ানো তো দূরের কথা, দর যাতে পড়ে না যায় সেই দুশ্চিন্তাতেই পাগল হবার দশা হয়েছে আমাদের সবার। এর জন্যে একমাত্র দায়ী নাফাজ মোহাম্মদ। সে বেঁচে থাকতে তেলের দাম আমরা বাড়াতে তো পারবই না, স্থিতিশীল রাখাও অসম্ভব। ওদিকে ওপেক তার সব ধরনের তেলের দাম ক্রমাগত বাড়িয়েই চলেছে, কিন্তু যেহেতু ওপেক আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নয় এবং সে তেলের দাম বাড়ালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না বললেই চলে, তাই ওপেকের সাথে তালে তালে পা ফেলতে বাধ্য হচ্ছে না নাফাজ অয়েল কোম্পানী। বরং সে তার তেলের দাম আরও কমিয়ে ব্যবসা থেকে আমাদের ভূত পর্যন্ত ভাগাবার তালে আছে।'

টেবিল থেকে একটা গ্লাস তুলে নিয়ে বরফ দেয়া পানি খেলো অরবেন দু'ঢোক, রুমালের আলতো চাপ দিয়ে মুছে নিল ঠোঁটের কোণ, তারপর আবার শুরু করল। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে সামগ্রিক পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে সে।

'দলে আমরা ভারী, কিন্তু নাফাজ মোহাম্মদ একাই একশো। তার চেয়ে আমাদের তেলের দাম এখনই বেশি, ফলে বিক্রি করতে গিয়ে নাকানি চোবানি খেতে হচ্ছে আমাদেরকে। এবার কল্পনা করুন, অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে আমরা যদি তেলের দাম আরও একদফা বাড়াতে বাধ্য হই, এবং নাফাজ মোহাম্মদের তেলের দর যদি স্থিতিশীল থাকে বা আরও কমে যায়, কি অবস্থা হতে পারে আমাদের? এরপরও কথা আছে, সমস্যার এটাই শেষ নয়। ধরুন, এত কিছুর পর আবার যদি নাফাজ মোহাম্মদ আরও কয়েকটা টি.এল.পি.-কে অপারেশনে নামায়, তখন অবস্থা কি হবে?'

'নাফাজ অয়েল কোম্পানী পানির দামে তেল বেচবে,' গম্ভীর গলায় বলল ভেনিজুয়েলার বেল্লোনি। 'আর আমরা? ওহো, তার আগেই তো ব্যবসায় লাল বাতি জ্বেলে লাপাত্তা হয়ে যাব আমরা।'

'তখন, এমন কি, ওপেক পর্যন্ত বিপদে পড়ে যাবে,' মিন মিন করে, মেয়েলি সুরে বলল নিশ্চেভ। 'গরীব দেশগুলো নাফাজ অয়েল কোম্পানীর কম দামের তেল পেলে ওপেকের বেশি দামের তেল কিনবে কেন?'

'সেক্ষেত্রে ওপেকেরও কিছু করার থাকবে না,' বলল ঈগলটন। 'আমাদের মতই অসহায় বোধ করবে —মার খেয়ে মার হজম করতে হবে ওপেককে।'

'হ্যাঁ,' সায় দেবার ভঙ্গিতে বলল অরবেন, 'মার খাচ্ছি আমরা, সেই মার হজমও করে যাচ্ছি। কিন্তু মার খেতে খেতে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে আমাদের, এখন আমরা মরিয়া। এবার আমরা পাল্টা আঘাত হানব। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে তো বটেই, বিশ্বশান্তি বজায় রাখার জন্যে, একাধিক অন্যায় অপরাধকে আর কোন রকম প্রশ্রয় না দেবার জন্যেও পাল্টা আঘাত হানার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আজ নিতে হবে আমাদেরকে। সেই প্রসঙ্গেই আসছি আমি, তার আগে সমস্যার আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেবার সুযোগ দিন আমাকে।

'এর আগে আমরা অধিকাংশ তেল কোম্পানী একাধিক বৈঠকে বসে একমত হয়েছি যে আমরা কেউ আন্তর্জাতিক জলসীমায় তৈল আবিষ্কার বা উত্তোলনের ব্যাপারে কোন রকম চেষ্টা করব না। তার মানে প্রত্যেকে যার যার দেশের বৈধ এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আঞ্চলিক সীমানার বাইরে তেলের জন্যে হাত বাড়াব না। আমাদের মধ্যে এটা ছিল একটা অলিখিত ভদ্রলোকের চুক্তি। আমরা সবাই এই চুক্তি মেনে চলছি বিশ্বশান্তির স্বার্থে। কেননা, আমরা বুঝতে পারি, এই চুক্তির লঙ্ঘন ডেকে আনতে পারে আইনগত অধিকারের প্রশ্ন, রাজনৈতিক হট্টগোল, ডেকে আনতে পারে সশস্ত্র সংঘর্ষ। ধরুন, দেশ "ক" তার উপকূল থেকে একশো মাইল পর্যন্ত ঘোষণা করল নিজের সমুদ্রসীমা। এবার মনে করুন, দেশ "ক"-এর সমুদ্রসীমার ত্রিশ মাইল বাইরে ড্রিলিং শুরু করল দেশ "খ"। এই দেখে দেশ "ক" যদি তার সমুদ্রসীমা বাড়িয়ে একশো পঞ্চাশ মাইল করার সিদ্ধান্ত নেয়—ভুলে যাবেন না, এরই মধ্যে পেরু দু'শো মাইল সমুদ্রসীমা দাবি করেছে— তখন কি হবে? এই ধরনের সঙ্কট থেকেই শুরু হয় সশস্ত্র সংঘর্ষ, সেই সংঘর্ষ যুদ্ধের আকারও নিতে পারে, শুরু হয়ে যেতে পারে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এসবই অনুমান মাত্র, কিন্তু এসব অনুমান বাস্তব ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, অহেতুক ভীতি বলে উড়িয়ে দিতে পারি না আমরা।'

'পারি না,' সায় দিয়ে বলল নিশেভ। 'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে বলে এই সভা উদ্বিগ্ন বোধ করছে, এতে কোন সন্দেহ নেই।'

'দুঃখের বিষয়, সব ব্যবসায়ী ভদ্রলোক নয়,' আবার শুরু করল অরবেন। 'নাফাজ অয়েল কোম্পানীর চেয়ারম্যান নাফাজ মোহাম্মদ আর তার বোর্ড অব ডিরেক্টরদের কথা বলছি আমি। ব্যবসায়ীর নামাবলী গায়ে চাপিয়ে এরা আসলে ডাকাতি করছে। এরা জলদস্যু। নাফাজ মোহাম্মদের বিরুদ্ধে দুটো অপরাধের অভিযোগ তুলব আমি। প্রথমটা সত্য হলেও প্রমাণ করা যাবে না। তার দ্বিতীয় কাণ্ডটা বিবেকের দৃষ্টিতে অপরাধ বলে গণ্য, কিন্তু এ-ধরনের কাজকে আজও গুরুতর বেআইনী কাজ বলে মনে করা হচ্ছে না।

'তার প্রথম অপরাধ, যার গুরুত্ব আমি কম করে ধরি, টি.এল.পি. তৈরি করা সংক্রান্ত। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী মাত্রই জানেন, টি.এল.পি. তৈরি করতে যতরকম প্ল্যান আর ডিজাইন লেগেছে তার বেশিরভাগই অন্যান্য কোম্পানীর রিসার্চ সেক্টর থেকে চুরি করেছে নাফাজ মোহাম্মদ। যেমন, মোবাইল অয়েল কোম্পানীর চুরি যাওয়া নকশা থেকে তৈরি হয়েছে সাগর কন্যার প্ল্যাটফর্ম। সাগর কন্যার পা আর অ্যাঙ্কোরিং সিস্টেমের ডিজাইন চেভরন অয়েলফিল্ড রিসার্চ কোম্পানীর নিজস্ব সম্পত্তি। নাফাজ মোহাম্মদ সেটাও চুরি করেছে। এই রকম আরও অসংখ্য চুরির ঘটনা আমাদের সবার জানা আছে। কিন্তু, ওই যে বললাম, প্রমাণ করা যাবে না। একই জিনিস একই সময়ে দুজায়গায় তৈরি বা আবিষ্কার হতে পারে, স্বাভাবিক একটা ব্যাপার বলেই মনে করা হয় এটাকে—সুতরাং অভিযোগ তোলা হলে নাফাজ মোহাম্মদ ঠিকই আইনের ফাঁক ফোকর গলে বেরিয়ে যাবে। তার রিসার্চ কর্মীরা অন্যান্য কোম্পানীর রিসার্চ কর্মীদেরকে অল্প সময়ের ব্যবধানে হারিয়ে দিয়েছে, এটাই হবে তার একমাত্র যুক্তি।'

অরবেনের এই অভিযোগের সবটুকুই মিথ্যে নয়। নাফাজ মোহাম্মদ অন্যান্য কোম্পানীর বিভিন্ন আবিষ্কার চুরি করেছেন। কিন্তু অরবেন একটা কথা চেপে গেল। সেটা হলো, চৌর্যবৃত্তির শিকার প্রথমে নাফাজ মোহাম্মদই হয়েছিলেন। তাঁর রিসার্চ সেক্টর থেকে অসংখ্য মূল্যবান ফর্মুলা চুরি গেছে। অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন নাফাজ মোহাম্মদ। দেশের আইন এর কোন বিহিত করতে পারছে না দেখে নিতান্ত বাধ্য হয়েই তিনি তাঁর নিজস্ব ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসপিওনাজ নেটওয়ার্ককে পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে চুরি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অরবেন আরেকটা কথা চেপে গেল। চুরি করা ডিজাইন, ফর্মুলা ইত্যাদি থেকে সরাসরি সাগর কন্যা তৈরি হয়েছে, একথা সত্যি নয়। নাফাজ অয়েল কোম্পানীর রিসার্চ কর্মীরা সেগুলোর ত্রুটি-বিচ্যুতি খুঁজে বের করেছে, সংশোধন করেছে, সাথে যোগ করেছে নিজেদের নব-আবিষ্কৃত ডিজাইন ও কারিগরী জ্ঞান—এভাবেই সম্ভব হয়েছে সাগর কন্যার জন্ম। শুধু চুরি করা ডিজাইন আর ফর্মুলার সাহায্যে তৈরি করা হলে সব দিক থেকে এত নিখুঁত হত না সাগর কন্যা। চুরি করা সমস্ত জিনিসের ত্রুটি দূর করে, সাথে নিজেদের কিছু যোগ করে সেগুলোর এমন একটা আলাদা চেহারা দাঁড় করানো হয়েছিল যাতে কেউ দাবি করতে না পারে যে জিনিসগুলো তাদের, ফলে সেগুলোর পেটেন্ট লাইসেন্স পেতে কোন অসুবিধে হয়নি নাফাজ অয়েল কোম্পানীর।

'... দ্বিতীয় যে অপরাধটা করে চলেছে নাফাজ মোহাম্মদ সেটার কথা ভেবে আমি, আমরা সবাই আতঙ্কিত।' বলে চলেছে অরবেন, 'ভদ্রলোকের যে চুক্তিটা আমরা সবাই মেনে চলছি, সে সেটা মানছে না। শতবার চেষ্টা করেছি আমরা, তাকে বোঝাতে পারিনি। সে তার জেদ বজায় রেখেছে। কোন বাধা মানবে না সে, আন্তর্জাতিক জলসীমায় আজও তেল আবিষ্কার করছে, করে যাবেও। এ-ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপ করা উচিত, কিন্তু সরকার তা করছে না। হস্তক্ষেপ না করার কারণটাও আমরা জানি। সস্তায় তেল পাচ্ছে সরকার, কেন খামোকা নাফাজ মোহাম্মদকে বাধা দিয়ে নিজের স্বার্থহানি ঘটাবে? অর্থাৎ সরকার তার দায়িত্ব পালন করবে না। অতএব দায়িত্বটা আমাদের কাঁধে চাপছে। গভীর সাগরে অফুরন্ত তেল রয়েছে, সেই তেল তোলার ক্ষমতা রয়েছে একমাত্র নাফাজ মোহাম্মদের। টাকার লোভে উন্মাদ হয়ে উঠেছে লোকটা। মানবজাতির কল্যাণ, সব ব্যবসায়ীর স্বার্থ, বিবেকের দংশন—এসব কিছুরই সে তোয়াক্কা করে না। এই উন্মাদকে অবশ্যই থামাতে হবে আমাদের। বিশ্ব শান্তির জন্যে হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে লোকটা, সময় থাকতে একে দমন করতে না পারলে সর্বনাশ ঠেকানো যাবে না। এবং, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, মানব জাতির এই গোঁয়ার শত্রুকে দমন করতে হলে টেকনিক্যাল পদ্ধতি প্রয়োগ করা ছাড়া উপায় নেই, যে পদ্ধতির ব্যবহার একমাত্র আমাদেরই জানা আছে।'

'কিন্তু কিভাবে?' ভেনিজুয়েলার বেলোনির মেদবহুল প্রকাণ্ড মুখে উদ্বেগ আর সংশয়ের ভাঁজ ফুটে উঠেছে। 'এই হারামী লোকটাকে শায়েস্তা করার জন্যে কি ধরনের টেকনিক্যাল পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারি আমরা?'

'এর ব্যাখ্যা দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়,' অরবেনের ঠোঁটে চতুর একটা হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। 'তবে, এইটুকু জানি, একজনকে ডেকে তার কাঁধে সব

ছেড়ে দিলে সে তার নিজস্ব পন্থায় এই সমস্যার একটা সমাধান করতে পারবে। তার পন্থাটা অবশ্যই টেকনিক্যাল হবে।'

'কে সে? আমরা তার পরিচয় জানতে পারি?'

নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্যে চুপ করে আছে অরবেন। সবার মুখের উপর একবার করে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল সে। তারপর বলল, 'আপনাদের অনুমতি পেলে তাকে আমি এই সভায় যোগ দেবার আমন্ত্রণ জানাতে পারি।'

হঠাৎ সবার টনক নড়ে উঠল। অরবেন ছাড়া বাকি সবাই তীব্র প্রতিবাদের সুরে আপত্তি জানাচ্ছে। সবার বক্তব্য—রুদ্ধদ্বার কক্ষের এই গোপন বৈঠকে অন্য কোন ব্যক্তির উপস্থিতি সাংঘাতিক বিপজ্জনক পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

'আমি যার কথা বলছি সে নাফাজ মোহাম্মদ বা আমাদের কোন পক্ষেরই প্রতিনিধিত্ব করছে না,' বলল অরবেন। সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে শুনছে তার কথা। 'এই সভায় তার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন।' একটু থেমে একটা খালি চেয়ারের দিকে তাকাল সে। তারপর আবার বলল, 'আপনারা সবাই তাকে চেনেন, অন্তত নাম শুনেছেন। তার নাম জন হেকটর।'

স্তব্ধ, স্তম্ভিত হয়ে গেছে সবাই। শুধু ঈগলটন ছাড়া। খবরটা আগেই পেয়েছে সে। তারপর শুরু হলো ওদের নিজেদের মধ্যে ফিসফাস। তীব্র প্রতিবাদের বদলে সায় দেবার ভঙ্গিতে এখন সবাই মাথা দোলাচ্ছে। আর একটু পর দেখা গেল উৎসুক, আগ্রহী হয়ে উঠেছে সবাই জন হেকটরকে সভায় দেখতে পাবার জন্যে।

একমাত্র অরবেন ছাড়া উপস্থিত এরা কেউ হেকটরকে আজ পর্যন্ত চোখে দেখেনি। তবে, ক্যাঙ্গার যেমন একটা পরিচিত নাম, এদের সবার কাছে তেমনি পরিচিত হেকটর নামটা। তেল ব্যবসাতে এই লোকের নাম কিংবদন্তীর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এরা সবাই জানে, যে-কোন মুহূর্তে তাদের হয়তো দরকার হতে পারে হেকটরের অমূল্য, অতুলনীয় নৈপুণ্যের সাহায্য, কিন্তু একই সাথে তারা আশা করে তেমন পরিস্থিতি যেন জীবনে কখনও দেখা না দেয়।

তেল খনির কোন পাইপে যখন ফুটো দেখা দেয়, কিংবা আগুন লেগে গর্ত মুখের কয়েক টন ওজনের একটা ছিপি যখন প্রচণ্ড চাপে ছিটকে পড়ে, লেলিহান আগুনের শিখা যখন একশো দেড়শো ফিট উপরে উঠে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে ফেলে গোটা আকাশ, তখন হেকটরের সাহায্য ছাড়া চোখে অন্ধকার দেখে তেল কোম্পানীর মালিকরা। দুনিয়ার যে-কোন তেল খনিতে আগুন জ্বলে উঠলে, সেই আগুন নিজেরা নেভাবার কথা ভেবে পর্যন্ত দেখতে রাজী নয় কেউ। সাথে সাথে পাগলের মত হেকটরকে খুঁজতে শুরু করে তারা। তার হদিস পাওয়া মাত্র চার ইঞ্জিনের জেট পাঠিয়ে দেয়া হয় অকুস্থলে তাকে নিয়ে আসার জন্যে। বিপদের মাত্রা বুঝে নিয়ে যা খুশি পারিশ্রমিক চায় হেকটর। তার সাথে দর কষাকষি চলে না। যা চায় তাই তাকে দিতে হয়। হেকটরের আরেকটা শর্ত থাকে, আগুন নেভানো বা ছিপি পরানোর কাজে আর কারও নাক গলানো মানবে না সে। সে এবং তার দল, সমস্ত ব্যাপারটা তারাই সামলাবে। তার কাজের পদ্ধতিতে কিছু গোপনীয় ব্যাপার আছে, যা সে প্রকাশে অনিচ্ছুক। বলাই বাহুল্য, বিনা তর্কে হেকটরের সমস্ত শর্ত মেনে নিতে হয় সবাইকে।

তেল ব্যবসা সম্পর্কে যা কিছু জানার আছে তার সবটুকু জানে হেকটর, বরং অনেকের চেয়ে কিছু বেশিই জানে। মানুষ হিসেবে তাকে ইস্পাতের মূর্তির সাথে তুলনা করলেও তার বলিষ্ঠতা সবটুকু ফোটে না। শোনা যায় পাষাণের দয়ামায়া নেই, কিন্তু হেকটরের নিষ্ঠুরতার সাথে তুলনা করলে পাষাণকেও মনে হবে দয়ার সাগর। তার উপর দিয়ে টেক্কা মেরে বেরিয়ে যাবে কেউ, এককথায় সেটা অসম্ভব। কেউ তার দিকে একটা ইঁটের টুকরো ছুঁড়লে, বদলা নেবার জন্যে পাহাড় ছুঁড়ে মারে হেকটর।

হন্ডুরাসের তেল ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিত্ব করছে এন্ডারসন, সে জানতে চাইল, 'অসাধারণ গুণী একজন লোক, নিজের পেশায় দুনিয়ার সেরা—আমাদের ঝামেলা ঘাড়ে নিতে তার কি দায় পড়েছে? তার সম্পর্কে যতটুকু জানি, বিশ্বশান্তি বা মানবজাতির কল্যাণ, এসব শব্দ তার হাসির খোরাক।'

'আমাদেরকে সাহায্য করতে রাজী হয়েছে হেকটর,' বলল অরবেন, 'দুটো...না তিনটে কারণে। কোন্ কারণটাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে সে তা আমার জানা নেই। সম্ভবত টাকাটাই সবচেয়ে বড় কারণ। আমরা সবাই জানি, হীরা-জহরতের চেয়েও দামী হেকটরের সার্ভিস। দ্বিতীয় কারণ, নাফাজ মোহাম্মদকে ঘৃণা করে সে।' অরবেন থামল।

'তিন নম্বর কারণটার কথা বললেন না যে?' জানতে চাইল ঈগলটন।

'সেটা জেনে আমাদের কোন লাভ নেই,' বলল অরবেন। 'আমরা নাফাজ মোহাম্মদকে শায়েস্তা করার দায়িত্ব চাপাচ্ছি তার ঘাড়ে, এই সুযোগে হেকটর তার একজন ব্যক্তিগত শত্রুকেও শায়েস্তা করবে। হেকটরের সেই শত্রুকে আমরা কেউ চিনি না, আমাদের সাথে তার কোন সম্পর্কও নেই।'

'তা না থাক,' বলল ঈগলটন, 'কিন্তু আমাদের দেয়া সুযোগের ভেতর থেকে আরেকটা সুযোগ বের করে নিয়ে আরেকজনকে শায়েস্তা করতে চাইছে হেকটর, সুতরাং এই লোকটার পরিচয় জানার অধিকার আছে আমাদের।'

নিশেভ বলল, 'ঠিক কথা। নাফাজ মোহাম্মদের সাথে আর কে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা আমাদের জানা থাকা দরকার।'

'আরেকটা প্রশ্ন,' বলল ভেনিজুয়েলার বেলোনি, 'নাফাজ মোহাম্মদকে ঘৃণা করে হেকটর। কেন?'

কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে কি যেন ভাবল অরবেন, তারপর মৃদু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'বেশ, তবে শুনুন...'

অনেকদিন আগে নাফাজ মোহাম্মদের সাথে হেকটরের তুলকালাম একটা ব্যাপার ঘটেছিল, কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু সে ঘটনার গায়ে মিথ্যে রঙ চড়িয়ে অরবেন যেভাবে বর্ণনা করছে তার মধ্যে আসল সত্যের কোন হদিস খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

ঘটনা বেশ কয়েক বছর আগের। মধ্যপ্রাচ্যে বেশ কয়েকটা তেল খনি আছে নাফাজ মোহাম্মদের, সেগুলোর একটার জ্বলন্ত গাশারে ক্যাপ পরাবার দরকার হওয়ায় তিনি নিজের বোয়িং পাঠিয়ে দেন হেকটরকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্যে। হেকটর যখন সেখানে পৌঁছুল, তার আগেই নাফাজ অয়েল কোম্পানীর লোকেরা

নিজেদের চেষ্টায় ক্যাপ পরিয়ে ফেলেছে। শুধু এই কারণেই প্রচণ্ড অপমানবোধ করে হেকটর। রাগে অন্ধ হয়ে সে তার পুরো ফি দাবি করে বসে। কিন্তু নাফাজ মোহাম্মদ সঙ্গত কারণেই তা দিতে রাজী হননি, তিনি শুধু হেকটরের সময় নষ্ট হওয়ায় সেই সময়টুকুর দাম দিতে চাইলেন। খেপে গিয়ে নাফাজ অয়েল কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল হেকটর। কিন্তু মার্কিন মুলুকের সেরা উকিলরা নাফাজ অয়েল কোম্পানীর পক্ষে থাকায় মামলায় হেরে গেল সে। শুধু তাই নয়, মামলা বাবদ নাফাজ অয়েল কোম্পানীর যত খরচ হয়েছে, সব দিতে হলো তাকে। ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স অর্ধেক হয়ে গেল তার। এতে দমে যাওয়া দূরের কথা, নাফাজ মোহাম্মদের বিরুদ্ধে আরও বেশি খেপে উঠল সে। আইনের কাছে পাত্তা না পেয়ে বেআইনী পন্থায় নিজের আসল চেহারাও দেখাবার সুযোগের অপেক্ষায় থাকল।

সুযোগ পেতে দেরি হলো না হেকটরের। নাফাজ অয়েল কোম্পানীর তেলভর্তি কার্গো জাহাজ দুনিয়ার সবগুলো সাগর-পথে চলাচল করছে, সেগুলোর একটাকে মাঝ-সমুদ্রে লিমপেট মাইন দিয়ে উড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করল হেকটর। দিলও তাই।

আটঘাট বেঁধে, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরিকল্পনাটা রচনা করেছিল হেকটর। ঘটনাটা যে স্যাবোটাজ, নাফাজ মোহাম্মদ তা টেরই পেলেন না। দুনিয়া জোড়া ব্যবসা যার, মাঝে-মধ্যে দুর্ঘটনা ঘটলে সেটাকে স্বাভাবিক বলেই মেনে নেন, এটাকেও তিনি একটা দুর্ঘটনা বলে মনে করলেন। ওদিকে খুশিতে বগল বাজাচ্ছে তখন হেকটর, একই পন্থায় শত্রুর আরেকটা বড় ধরনের কি ক্ষতি করা যায় তাই নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করছে সে।

জাহাজটা তো ডুবল। কিন্তু কয়েক হাজার টন তেল ছাড়া আর কিছু হারাতে হয়নি নাফাজ অয়েল কোম্পানীকে। কারণ, জাহাজটা ছিল ভাড়া করা, কোম্পানীর নিজের নয়।

সাউল শিপিং লাইনসের জাহাজ ছিল ওটা। এই কোম্পানীর অনেকগুলো জাহাজ আর ট্যাঙ্কার আছে, সবগুলোই ভাড়া খাটে। কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্যার ফ্রেডারিক সাউল, তিনি এক দুঃখজনক অভিযানে মারা গেছেন বেশ ক'বছর আগে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র মেয়ে রেবেকা সাউল এই শিপিং লাইনসের চেয়ারম্যান হয়। তার আকস্মিক মৃত্যুর পর জানা গেল সে তার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তার হবু স্বামী মাসুদ রানার নামে উইল করে দিয়ে গেছে। সেই থেকে বোর্ড অভ ডিরেক্টরদের ভোটে প্রতি বছর সাউল শিপিং লাইনসের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে আসছে মাসুদ রানা।

মাঝ-সাগরে জাহাজ ডুবির খবর শুনে সাউল শিপিং লাইনসের চেয়ারম্যান মাসুদ রানাও ব্যাপারটাকে সহজভাবে গ্রহণ করেছিল। বীমা করা ছিল, সুতরাং জাহাজ হারাবার ক্ষতি প্রায় পুষিয়ে গেল। কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটল কিভাবে, কেন ঘটল ইত্যাদি জানার একটা তাগিদ অনুভব করল সে। সময় নষ্ট না করে একটা তদন্ত দল পাঠাল ও।

তিনদিনের মধ্যে খবর পেল জাহাজটা দুর্ঘটনার শিকার হয়নি, সেটাকে

মাইনের সাহায্যে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কে এমন কাজ করল? কেন করল? আরও দু'দিন পর এ-দুটো প্রশ্নেরও উত্তর পেয়ে গেল রানা।

হেকটর সম্পর্কে খবর নিতে শুরু করল রানা। লোকটা সম্পর্কে তৈরি করা ডোসিয়ে পড়ে গম্ভীর হয়ে গেল। হেকটরকে চিনতে ভুল হয়নি ওর। তাকে ছোট করে দেখতে পারেনি। সব যুগেই দুনিয়ায় দু'চারজন লোক জন্মগ্রহণ করে যাদের প্রকৃতির মধ্যে দুনিয়া-বিধ্বংসী প্রচণ্ড শক্তির অস্তিত্ব সুপ্ত থাকে, এদেরকে ঘাঁটানো কোনমতেই উচিত নয়। নাড়াচাড়া করতে গিয়ে একটু যদি ভুলভাল হয়ে যায়, সেই শক্তির বিস্ফোরণ ঠেকানো সম্ভব নয়। রানা বুঝল, হেকটর এই যুগের সেই দু'চারজন লোকের একজন। একে ঘাঁটানো অত্যন্ত বিপজ্জনক। কিন্তু সেই সাথে এও বুঝল নাফাজ মোহাম্মদ হেকটরকে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে ভুল করে ফেলাতেই হোক, অথবা নিজের শক্তির প্রচণ্ড চাপেই হোক, হেকটর জেনে ফেলেছে তার নিজের ভেতর প্রচণ্ড এক ধ্বংসাত্মক শক্তির অস্তিত্ব আছে। এ-কথা জানার পর একের পর এক ধ্বংসযজ্ঞ না চালিয়ে চুপ করে বসে থাকা হেকটরের পক্ষে সম্ভব নয়। কেউ তাকে না খোঁচালেও নিজের শক্তি পরীক্ষা করে আনন্দ পাবার জন্যে একটা না-একটা কিছু করে যেতেই হবে তাকে।

ভেবে-চিন্তে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুল রানা। লোকটাকে জানিয়ে দিতে হবে তাকে প্রতিরোধ করার মত শক্তিরও অস্তিত্ব আছে। সে শক্তি ধ্বংসাত্মক নয়, গঠনমূলক, কিন্তু প্রয়োজনে সে শক্তি ধ্বংস করতেও পিছপা হবে না।

হেকটর নাফাজ মোহাম্মদের দ্বিতীয় কোন ক্ষতি করার আগেই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিল রানা। প্রথমে প্রতিনিধি পাঠিয়ে প্রস্তাব দিল হেকটরকে। যে অপরাধ সে করেছে তা লিখিতভাবে নয়, মৌখিকভাবে স্বীকার করলেই চলবে, কিন্তু জাহাজটার ক্ষতিপূরণ বাবদ নতুন একটা জাহাজ কিনে দিতে হবে তাকে। রানার প্রতিনিধিকে অপমান করে ভাগিয়ে দিল হেকটর। নিজের অপরাধও স্বীকার করল না সে।

তিনদিন পর হেকটরের নিজস্ব ডাকোটা প্লেন, ক্যাডিলাক গাড়ি, টেক্সাস আর নিউ ইয়র্কের বাড়ি দুটো—একই সময়ে আগুন লেগে পুড়ে গেল।

যা ভেবেছিল রানা, তাই ঘটল। নিজের এতগুলো ক্ষতি হয়ে গেল, কিন্তু টুঁ শব্দটি করল না হেকটর।

মাসুদ রানা? আসলে লোকটা কে? খোঁজ-খবর নিতে শুরু করল হেকটর। এবং রানার আসল পরিচয় জানতে না পারলেও, ও যে রানা এজেন্সীর চেয়ারম্যান, দুর্ধর্ষ একজন অ্যাডভেঞ্চারার, ওর যে মৃত্যু ভয় বলে কিছুর সাথে পরিচয় নেই, মুখে যা বলে কাজেও তাই করে—এসবই জানা হয়ে গেল তার। কিন্তু ভয় পেল, তা নয়। রানার প্রতি প্রচণ্ড একটা ঘৃণা জমে উঠল তার মনে, বুঝল, এই লোকের বিরুদ্ধে লাগতে হলে নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে হবে, থাকতে হবে সুযোগের অপেক্ষায়।

'হেকটর এখন প্রতিশোধ নিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত,' তার বক্তব্য শেষ করছে রুবার্ট অরবেন। 'আমরা তাকে একটা সুযোগ দিতে যাচ্ছি। এবার, আপনারা অনুমতি দিলে তাকে আমি সভায় যোগ দিতে অনুরোধ করতে পারি।'

সবাই সম্মতি জানাল। পাশের কামরা থেকে অরবেন নিজেই ডেকে নিয়ে এল

হেকটরকে।

হেকটর একজন টেক্সান। তার ওপর চোখ পড়তেই ছ্যাঁৎ করে উঠল সবার বুক। বন্ধ কামরার ভেতর থেকে বাইরে দৃষ্টি চলে না, কিন্তু দূর গগনে কালো মেঘ দেখতে পাচ্ছে সবাই। স্তব্ধ হয়ে গেছে সভা-ঘর, নিঃশ্বাস পতনের শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না, কিন্তু সবার বুকের ভেতর গুরু গুরু মেঘ ডাকছে।

হেকটরের চেহারাটা প্রচণ্ড একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত। দেখা মাত্র স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। গায়ের রঙ হলদেটে তামার মত, চকচকে। চোখ দুটো মানুষের নয়, যেন কোন মানুষখেকো বাঘের কোটর থেকে তুলে এনে নিজের কোটর দুটোয় বসিয়ে নিয়েছে—সারাক্ষণ জ্বলজ্বল করছে সে-দুটো। খুব লম্বা সে, প্রায় ছয় ফিট, শরীরটা অদ্ভুত রকম বাঁকা। সটান দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তবু একটা ঢেউ খেলানো আকৃতি পেয়েছে কাঠামোটা। বোঝাই যায়, ডানে-বাঁয়ে-সামনে-পেছনে যতটা কল্পনা করা যায় তার চেয়ে বেশি বাঁকা করে ফেলতে পারে শরীরটা সে চোখের পলকে। অবাক বিস্ময়ে দেখার জিনিস হলো তার বিশাল দুটো কাঁধ, শরীরের দৈর্ঘ্য আর প্রস্থের তুলনায় এত বড় যে বেমানান লাগে। হাত দুটো অস্বাভাবিক লম্বা, পায়ের হাঁটু ছুঁই ছুঁই করছে। ঝড়-ঝাপটা-রোদ-বৃষ্টির অত্যাচার সওয়া কর্কশ পাহাড়ের মত ভাঙাচোরা তোবড়ানো মুখ। থমথম করছে।

'মি. হেকটর,' বলল অরবেন, 'মি. হেকটর, ইনি…'

একচুল নড়ল না হেকটর। ঠোঁট দুটো একটু নড়ল, তা প্রায় কারও চোখেই পড়ল না, অথচ গম্ভীর গলার আওয়াজে গমগম করে উঠল সভা-ঘরের ভেতরটা। 'কোন দরকার নেই। আমি কারও নাম শুনতে চাই না।'

হেকটরের বিদ্যুৎগতি প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে মিলিওনিয়র তেল-ব্যবসায়ীরা মুগ্ধ। তার এই একটা কথাতেই সব স্পষ্ট হয়ে গেল—এ লোক কাজের লোক, অকুতোভয়, আত্মবিশ্বাসী। ঠিক এই রকম একটা দুর্যোগই দরকার নাফাজ মোহাম্মদকে তছনছ করে দেবার জন্যে।

'মি. অরবেনের কাছ থেকে,' একটু বিরতি নিয়ে বলে চলেছে হেকটর, জানতে পেরেছি, নাফাজ মোহাম্মদ আর তার সাগর কন্যার একটা ব্যবস্থা করার জন্যে আপনারা আমার সাহায্য চান। আমাকে ব্রিফিং করার দরকার নেই, মি. অরবেন আগেই আমাকে সব জানিয়েছেন। আমি শুধু জানতে চাই এ ব্যাপারে আপনাদের নির্দিষ্ট কোন প্রস্তাব আছে কিনা।' কামরার একমাত্র খালি চেয়ারটায় বসল হেকটর। প্রায় গোল করে কাটা ক্রুকাট চুলসহ মাথার নিচে কাঁধ দুটো যেন মেলে দেয়া ঈগলের ডানা।

পরবর্তী আধঘণ্টা আর কোন কথা না বলে ব্যবসায়ীদের আলোচনা শুনে গেল হেকটর। হাভানা চুরুটটা কামড়ে ধরে আছে দু'সারি দাঁতের ফাঁকে, ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে বারবার মুখটা, এক চুল নড়াচড়া করছে না সে।

নিজেদের মধ্যে আলোচনার আর কিছু বাকি নেই, তবু অযথা সময় নষ্ট করছে ওরা।

'আমেরিকান বন্ধুদের বলছি,' বলল ভেনিজুয়েলার বেলোনি, 'আপনারা চেষ্টা করলে কংগ্রেসকে বলে একটা ইমার্জেন্সী ল,পাস করিয়ে নিতে পারেন না? যাতে

উপকূলের বাইরে, আন্তর্জাতিক জলসীমায় ড্রিলিং নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে?'

করুণার দৃষ্টিতে তাকাল বেলোনির দিকে অরবেন। বলল, 'মি. বেলোনি, দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, আমাদের সাথে কংগ্রেসের সাপে-নেউলে সম্পর্ক, তা আপনার জানা নেই। ট্যাক্সের হার কমাবার জন্যে, আর একটু বেশি মুনাফার আশায় ওদের সাথে বৈঠক করেছি আমরা। ভদ্রভাবে আমাদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছে ওরা। এর বেশি আর কিছু জানতে চাইবেন না।'

'আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা ঠুকে দিলে কেমন হয়?' আরেকজন ব্যবসায়ী প্রশ্ন করল। 'এটা তো একটা আন্তর্জাতিক ব্যাপারই।'

'ভুলে যান ওসব। ওরা কোন সিদ্ধান্ত নেবার আগেই আমাদের নাতি-নাতনীদের যুগ শুরু হয়ে যাবে।'

'জাতিসংঘ?'

'ওটা তো একটা পাঁয়তারা কষার আড্ডাখানা, ওখানে বসে সবাই রাজা-উজির মারছে,' জাতিসংঘ সম্পর্কে নিজের মতামতটা জোর গলায় জানিয়ে দিচ্ছে অরবেন। 'নিউ ইয়র্ককে হুকুম দিয়ে নিজেদের দোরগোড়ায় একটা পার্কিং মিটার বসাবে, এইটুকু ক্ষমতাও নেই ওদের।'

একজন আমেরিকান ব্যবসায়ী সবাইকে হতভম্ব করে দিয়ে একটা প্রস্তাব করল, 'আচ্ছা, অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে আমাদের তেলের দাম কমিয়ে রাখলে কেমন হয়? নাফাজ অয়েল কোম্পানীর চেয়ে সস্তায় যদি তেল বেচি আমরা, ওদের তেল কিনবে না কেউ।'

অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে বক্তার দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। ভাবছে, লোকটা পাগল নাকি!

নরম গলায় কথা বলতে শুরু করল ঈগলটন, 'এসব কথার কোন মানে হয় না। তেলের দর কমালে যে বিরাট অঙ্কের লোকসান দিতে হবে আমাদেরকে, তাতে ব্যবসার অস্তিত্বই থাকবে না। তাছাড়া, আমরা দর কমালে নাফাজ অয়েল কোম্পানীও আবার তাদের দর কমাবে। লোকসান দিয়ে একশো বছর ব্যবসা টিকিয়ে রাখার মত সঙ্গতি আছে নাফাজ মোহাম্মদের। যদিও, আবার সে দর কমালেও কোন লোকসান তাকে দিতে হবে না। আমাদের চেয়ে অনেক, অনেক সস্তায় তেল পায় সে, পরিমাণেও তা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি—ওখানেই তো আসলে মার খাচ্ছি আমরা।'

সবাই গুম মেরে বসে আছে। চিন্তিত। নিস্তব্ধতা ভাঙার জন্যে ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না কেউ।

এখন আর পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে নেই হেকটর। মুখের ভাঁজ আর থমথমে ভাব এক চুল বদলায়নি, কিন্তু চেয়ারের হাতলে তার বাঁ হাতের একটা আঙুল ধীরে ধীরে বাড়ি মারছে। হেকটরের জন্যে এটুকুই একজন হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রুগীর হাত-পা ছোঁড়ার সমান।

আমেরিকান ব্যবসায়ী আবার একটা প্রস্তাব তুলতে যাচ্ছিল। রাষ্ট্রীয় সমুদ্রসীমার বাইরে গিয়ে তারাও যদি তেল তোলে, তাহলে কেমন হয়? কিন্তু প্রস্তাবটা উচ্চারণ করলে হাসির খোরাক হতে হবে তাকে, কথাটা বুঝতে পেরে চুপ করেই থাকল

সে। রাষ্ট্রীয় সীমানার বাইরে গিয়ে তেল আবিষ্কার করতে হলে সাগর কন্যার মত একটা ড্রিলিং রিগ দরকার হবে, যা তাদের কারও নেই, এবং সম্মিলিত চেষ্টায় তৈরি করাও সম্ভব নয়।

তবে, আরেকটা বুদ্ধি ঢুকল তার মাথায়। বলল, 'নাফাজ মোহাম্মদের ব্যবসা আমরা কিনে নিই না কেন?' নিজেও একজন কোটিপতি, কিন্তু নাফাজ মোহাম্মদ কত বড় বিলিওনিয়ার সে সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই, সবাই বুঝে নিল ব্যাপারটা। লোকটা জানে না, উপস্থিত দশজনের সমস্ত ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স, সয়-সম্পত্তি, তেল খনি এবং স্টক একটা মাত্র চেক কেটে যে-কোন মুহূর্তে কিনে নেবার সামর্থ্য রাখে নাফাজ অয়েল কোম্পানী। 'সাগর কন্যার কথা বলছি আমি,' মার্কিন ব্যবসায়ী ব্যাখ্যা করছে নিজের প্রস্তাব। 'একশো মিলিয়ন ডলার। কিংবা আরও ন্যায্য দাম, দুশো মিলিয়ন ডলার। যদি না বেচে···আরও বাড়িয়ে দেয়া যায় দামটা। তবু বেচবে না?'

'না,' অসহায় ভঙ্গিতে হাসছে ঈগলটন। 'তার কারণটাও পরিষ্কার। সর্বশেষ জরিপে জানা গেছে দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী পাঁচজন লোকের মধ্যে নাফাজ মোহাম্মদ অন্যতম। আমাদের তিনশো মিলিয়ন ডলার তার কাছে বড়জোর তিনশো ডলারের সমান, তার বেশি নয়।'

মার্কিন কোটিপতির চেহারা ম্লান হয়ে গেল।

'উঁহু,' বলল অরবেন, 'মি. ঈগলটন, আপনার সাথে আমি একমত নই। তিনশো মিলিয়ন ডলারে হয়তো সাগর কন্যাকে বেচবে না নাফাজ মোহাম্মদ, আরও বেশি দাম হাঁকবে। কিন্তু বেচবে না, একথা বিশ্বাস করি না আমি।'

মার্কিন কোটিপতির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অরবেন অন্তত সমর্থন করছে তাকে।

'বেচবে,' আবার বলল অরবেন। 'বেচে প্রচুর মুনাফা লুটবে। তারপর সে কি করবে জানেন? যে দামে বেচবে তার অর্ধেকেরও কম খরচে আরেকটা সাগর কন্যা বানাবে, তারপর বর্তমান সাগর কন্যার কাছ থেকে মাইল দুই দূরে নোঙর ফেলবে সেটার—রাষ্ট্রীয় জলসীমার বাইরে নিজের এলাকা বলে কারও কিছু নেই, সুতরাং এ-কাজে তাকে বাধা দেয়া যাবে না। তার মানে, সেই পুরানো দামেই বেচার জন্যে তীরের দিকে তেল পাঠাতে শুরু করবে আবার সে।'

সাময়িক নৈরাশ্যে নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মার্কিন কোটিপতি। তারপর শেষ চেষ্টা করে দেখল তার কথায় কেউ উৎসাহবোধ করে কিনা। 'অথবা আমরা যদি তার পার্টনার হতে চাই?' কথার সুরে তেমন জোর নেই।

'প্রশ্নই ওঠে না,' এন্ডারসন দৃঢ় গলায় নাকচ করে দিল সম্ভাবনাটা। 'খুব বেশি ধনীদের মত নাফাজ মোহাম্মদও একাকী পথ চলতে ভালবাসে। ইরানের প্রাক্তন শাহ এবং আরবের এক প্রিন্স তার পার্টনার হবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন বলে শুনেছি, নাফাজ মোহাম্মদ সম্মত হয়নি। আর ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসীকে সে যে প্রত্যাখ্যান করেছিল, এ-ঘটনা তো আমাদের সবার জানা।'

সব কথা ফুরিয়ে গেছে, বলার কিছু নেই আর, সবার মুখ দেখে তাই মনে হচ্ছে

হেকটরের। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল এবার সে।

'আমার ব্যক্তিগত ফি বিশ লক্ষ ডলার,' কোন ভূমিকা বা ইতস্তত না করে সোজা কাজের কথা দিয়ে শুরু করল হেকটর। 'কাজটার পেছনে খরচ হবে দুই কোটি ডলার। এই দুই কোটি ডলারের প্রতিটি সেন্টের হিসাব রাখব আমি, কাজ শেষ হলে সেই হিসাব অনুমোদন করে যদি দেখেন কিছু বেঁচেছে, সাথে সাথে তা ফেরত পাবেন আপনারা। আমার দাবি, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে আমাকে, আপনারা কেউ কোন রকম বাধা দিতে বা নাক গলাতে আসবেন না। এই শর্ত লঙ্ঘন করা হলে খরচপাতির অবশিষ্ট টাকা ফিরিয়ে তো দেবই না, দায়িত্বটাও ঝেড়ে ফেলে দেব কাঁধ থেকে। আমি কিভাবে কি করব, আমার প্ল্যান, আমার পরিকল্পনা—এসব কাউকে আমি জানাব না। দায়িত্ব কাঁধে নেবার পর থেকে যা খুশি করব আমি, আমাকে কেউ বাধা দিতে পারবেন না। তবে, কথা দিচ্ছি, যাই করি না কেন, সবই আপনাদের স্বার্থের অনুকূল হবে। শেষ কথা, আজ থেকে আপনারা কেউ কোন কারণে আমার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবেন না। দরকার হলে আমি যোগাযোগ করব। এক কথায় জবাব দিন—ইয়েস অর নো?'

সাথে সাথে উত্তর পেয়ে গেল হেকটর। ইয়েস। লোকটা শুধু একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত ভয়ঙ্কর নয়, তার প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস লক্ষ্য করেও এরা সবাই বিস্ময় আর স্বস্তি বোধ করছে। দুই কোটি বিশ লক্ষ ডলার খুব একটা বিরাট অঙ্কের টাকা নয় ওদের কাছে, প্রায় এই পরিমাণ টাকা প্রতিমাসে ঘুষ দিতে অভ্যস্ত তারা। ঠিক হলো চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একটা কিউবান নাম্বারড্ অ্যাকাউন্টে টাকাটা জমা দেয়া হবে, গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শুধু এই মায়ামীতেই সুইসটাইপের নাম্বারড্ অ্যাকাউন্ট সিস্টেম চালু আছে। ট্যাক্সের বোঝা যাতে ঘাড়ে না চাপে সেজন্যে যার যার ভাগের চাঁদা প্রত্যেকে নিজের দেশ থেকে না দিয়ে বিদেশে ফুলে ফেঁপে ওঠা ফান্ড থেকে দেবে।

চার

ফোর্ট লডারডেল। নাফাজ ম্যানসন।

ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে ব্র্যান্ডির গ্লাসটা তেপয়ে নামিয়ে রাখল ঈগলটন। বলল, 'হ্যাঁ, মি. নাফাজ, স্যার—ওরা আপনার পিছনে লেগেছে।'

সোফায় হেলান দিয়ে স্থির হয়ে বসে আছেন নাফাজ মোহাম্মদ। সোফার হাতলে লম্বা হয়ে পড়ে রয়েছে ঘন বাদামী রঙের একটা হাত, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছেন টোবাকো পাইপটা। মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'জানতাম এ-ধরনের একটা কিছু ঘটবেই। সব বলো আমাকে।'

স্মরণশক্তিটা ভাল ঈগলটনের, ঘটনার সংক্ষিপ্ত এবং নির্ভুল বর্ণনা দেয়ার অসাধারণ একটা গুণেরও অধিকারী সে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে লেক তাহো মীটিংয়ের সমস্ত ঘটনা জানা হয়ে গেল নাফাজ মোহাম্মদের। অন্য সূত্র থেকে আগেই খবর

এসে গেছে তাঁর কাছে, কিন্তু সে খবরে বিশদ বিবরণ ছিল না।

ব্যবসায়ী মহলের আর সবাই হেকটরকে যতটা চেনে তার চেয়ে বেশি চেনেন তিনি তাকে। ছোটখাট ক্ষতি করার জন্যে দুই কোটি বিশ লক্ষ মার্কিন ডলার নেয়নি সে, এটুকু বুঝতে পারছেন পরিষ্কার। দুনিয়ায় কাউকে যদি সামান্যতম ভয় করেন তিনি, তো সে এই হেকটর। মনের ভেতর ঠিক ভীতি নয়, একটা অস্বস্তি বোধ করছেন। ব্যবসায়ী মানুষ তিনি, দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে আপত্তি নেই, কিন্তু তাই বলে যুদ্ধ করতে নামবেন কিভাবে? আর সব ব্যবসায়ীর মত তাঁর নিজের রক্ষীবাহিনী আছে বটে, কিন্তু তাদেরকে পুষছেন যুদ্ধ করাবেন বলে নয়, তারা আছে জানলে প্রতিদ্বন্দ্বীরা ঘাড়ে চেপে বসতে সাহস পায় না, তাই। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে, রক্ষীবাহিনী পোষা না পোষা সমান কথা। প্রতিদ্বন্দ্বীরা এমন একজনকে তাঁর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে যার সামনে তাঁর এই প্রায়-নিরস্ত্র রক্ষীবাহিনী এক ফুঁয়ে উড়ে যাবে। ঈগলটন তার কথা শেষ করার পর একটা মিনিট গভীরভাবে চিন্তা করলেন নাফাজ মোহাম্মদ। এখন শুধু অস্বস্তি নয়, বিচলিত বোধ করছেন তিনি। কিন্তু চেহারায় তার কোন ছাপ নেই। 'কিভাবে কি করতে হবে সে সম্পর্কে পরামর্শ দেয়নি ওরা হেকটরকে?'

'না। হেকটর কোন পরামর্শ চায়ওনি। শুধু জানিয়েছে তার যা খুশি তাই করবে, কেউ বাধা দিতে পারবে না।'

'যা খুশি তাই, এর কি অর্থ করো তুমি?' অ্যাশট্রেতে টোবাকো পাইপের ছাই ঝাড়ছেন নাফাজ মোহাম্মদ।

'যে-কোন ধরনের আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে আপনাকে, স্যার।'

'হেকটরকে নির্দিষ্ট কোন পরামর্শ না দিয়ে নিজেদের বিবেকের কাছে ওরা পরিষ্কার থাকতে চেষ্টা করেছে,তাই না?'

'তাই।'

'হেকটরের পরিকল্পনা জানার কোন উপায় আছে?'

একটু ইতস্তত করে বলল ঈগলটন, 'নেই, স্যার। তবে ছোট্ট, কিন্তু অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ করেছি আমি। সভা ভেঙে যাবার পর আমরা যখন বিদায় নিচ্ছি, আমাদের দশজনের দু'জনকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে গোপনে কি যেন আলাপ করল হেকটর। কি আলাপ করল জানতে পারলে ভাল হত।'

'জানো।'

'চেষ্টা করা যেতে পারে, গ্যারান্টি দিতে পারি না, স্যার,' বলল ঈগলটন। 'ওদের দু'জনের সাথে যে বিষয়েই আলাপ করে থাকুক হেকটর, অরবেনের কানে তা আসবে। অরবেনই উদ্যোক্তা হয়ে লেক তাহোয় ডেকেছিল আমাদেরকে। এখন থেকে যা কিছু ঘটবে, আর কেউ খবর না রাখলেও, অরবেন রাখবে।'

'অরবেনের কাছ থেকে কথা বের করতে পারবে তুমি?'

'চেষ্টা করব। কথা দিতে পারি না, স্যার।'

হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে মৃদু কাঁধ ঝাঁকালেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'বেশ। কত টাকা?'

'টাকা, স্যার?' চোখ কপালে উঠে গেল ঈগলটনের। এদিক ওদিক মাথা

দোলাচ্ছে। 'টাকা দিয়ে অরবেনকে কেনা সম্ভব নয়, স্যার। সে আমার কাছে কোন কোন ব্যাপারে ঋণী, তার এই দুর্বলতাটা কাজে লাগাতে চেষ্টা করব আমি। আমার সাহায্য ছাড়া আজ সে ওই কোম্পানীর চেয়ারম্যান হতে পারত না।' থামল ঈগলটন, পরমুহূর্তে একটু অবাক হয়ে জানতে চাইল, 'হেকটর যাদের সাথে আলাপ করেছে, আপনি এখনও তাদের পরিচয় জানতে চাননি—তবে কি…'

'হ্যাঁ,' নাফাজ মোহাম্মদ সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন। 'আগেই খবর পেয়েছি আমি। রাশিয়ার নিশ্চেভ আর ভেনিজুয়েলার বেলোনির সাথে গোপনে পরামর্শ করেছে হেকটর।' কথা শেষ করে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন তিনি। চোখ দুটো বুজে আসছে তাঁর, যেন আত্মসম্মোহনের গভীর স্তরে পৌঁছে যাচ্ছেন।

'এর তাৎপর্য কি, বুঝতে পারছেন, মি. নাফাজ?'

চোখ দুটো পুরো মেলে তাকালেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'পারছি। রাশিয়ান নেভির একটা ইউনিট শুভেচ্ছা সফরে ক্যারিবিয়ানে রয়েছে। এই ইউনিটের স্থায়ী ঘাঁটি কিউবায়। দশজনের মধ্যে শুধু এই দু'জনই ইচ্ছা করলে সাগর কন্যার বিরুদ্ধে দ্রুত নৌ শক্তি ব্যবহারের ব্যবস্থা নিতে পারে।' চোখ ভর্তি অবিশ্বাসের ভাব নিয়ে মাথা নাড়ছেন তিনি। 'আমি ভাবতেও পারছি না… কি করেছি আমি ওদের? আদর্শ একজন নাগরিক হিসেবে যতটা পারি কম দামে তেল যোগাচ্ছি সরকারকে, আরও কম দাম ধরে গরীব কিছু দেশের উপকার করছি—এটাই কি আমার অপরাধ? এই অপরাধের জন্যে হেক—, একটা ভয়ঙ্কর দানবকে লেলিয়ে দিল ওরা আমার বিরুদ্ধে?' ভাবাবেগে গলাটা একটু কেঁপে গেল তাঁর, কিন্তু দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে মৃদু একটু হাসলেন। 'আমাকে ওরা দুর্বল ভেবেছে, তাই কি?' পরমুহূর্তে সংশোধন করে নিলেন নিজেকে। 'না, তা ভাবেনি। তা যদি ভাবত, নিশ্চেভ আর বেলোনির সাথে আড়ালে আলাপ করার দরকার হত না হেকটরের।'

'কোথাকার পানি কোথায় গড়ায় কিছুই বলা যায় না, স্যার,' উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে ঈগলটনকে। 'যীশুকে যতটা ভক্তি করি, তারচেয়ে বেশি ভয় করি আমি হেকটরকে। যাই হোক ওদের আলাপের বিষয় সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছি আমি।'

'সম্ভাব্য যে-কোন পরিস্থিতির জন্যে এদিকে আমিও তৈরি হতে যাচ্ছি।' সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন নাফাজ মোহাম্মদ, তার সাথে ঈগলটনও।

ঈগলটনকে বিদায় করে দিয়ে সোজা নিজের রেডিওরুমে এসে ঢুকলেন নাফাজ মোহাম্মদ। তাঁর ব্যক্তিগত বোয়িং সেভেন-জিরো-সেভেন-এর ফ্লাইট ডেকের সাথে অনেকটা মিল রয়েছে এই কামরাটার। বিচিত্র আকার এবং আকৃতির অসংখ্য নব, সুইচ, বাটন আর ডায়াল দেখে ধাঁধায় পড়ে যাবে যে কেউ, কিন্তু নিজের হাতের তালুর মতই কামরার প্রতিটি জিনিস অতি পরিচিত নাফাজ মোহাম্মদের। এখানে যখনই ঢোকেন তিনি, সাথে সাথে অনুভব করেন, গোটা দুনিয়া তাঁর হাতের নাগালে চলে এল।

কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে বসে পরপর কয়েকটা মেসেজ পাঠালেন তিনি।

প্রথম মেসেজ দুটো পাঠালেন তাঁর চারজন হেলিকপ্টার পাইলটের কাছে। খুব

বড় আকারের ছয়টা হেলিকপ্টার আছে তাঁর। পাইলটদেরকে নির্দেশ দিলেন তারা যেন ভোর হবার আগেই দুটো হেলিকপ্টার নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত এয়ারফিল্ডে তৈরি থাকে। পরবর্তী চারটে মেসেজ পাঠালেন চারজনের কাছে, যাদের অস্তিত্ব বা পরিচয় সম্পর্কে তাঁর কোম্পানীর সহ-ডিরেক্টররা কিছুই জানে না। এই চারটে মেসেজের প্রথমটা গেল কিউবায়, দ্বিতীয়টা ভেনিজুয়েলায়। দুনিয়ার প্রায় সব বড় বড় জায়গায় নিজের লোক আছে তাঁর, এরা বেশির ভাগই তাঁর বেতনভুক কর্মচারী। কিউবা আর ভেনিজুয়েলার লোক দু'জনকে সহজ আর স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন তিনি। দুটো দেশেরই সমস্ত নৌ-ঘাঁটির ওয়্যারলেস বার্তা কান সজাগ রেখে শুনতে হবে, আর চোখ খোলা রেখে দেখতে হবে অকস্মাৎ কিংবা প্রত্যাশিত যে-কোন রকম নৌ-যান নোঙর তুলে বন্দর ত্যাগ করছে কিনা। যে-কোন সংবাদ পাবার সাথে সাথে জানাতে হবে তাঁকে।

তৃতীয় এবং চতুর্থ মেসেজ গেল দু'জন মার্কিন অস্ত্র ব্যবসায়ীর কাছে। এরা অস্ত্র তৈরি করে না, চুরি করা জিনিস কিনে বিক্রি করে। ন্যায্য দাম পেলে আণবিক বোমা ছাড়া আর সব ধরনের অস্ত্র সরবরাহ করতে পারে এরা। দু'জনকেই বলা হলো, তারা যেন তৈরি থাকে, দরকার মনে করলে তিনি এদেরকে ডেকে পাঠাবেন।

সব শেষে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে নিজের একজন বিশ্বস্ত ভক্তকে মেসেজ পাঠালেন নাফাজ মোহাম্মদ। লোকটা একজন অ্যারাবিয়ান, বর্তমানে মার্কিন নাগরিক, নাম লিল হাম্মাম। সে একজন কমান্ডার।

কমান্ডার লিল হাম্মাম সাগর কন্যার ক্যাপ্টেন।

সৌদী রয়্যাল নেভির প্রাক্তন অফিসার লিল হাম্মাম। দীর্ঘদেহী। ক্লিনশেভড। সাগর কন্যার কমান্ডার হিসেবে তাকে পেয়ে গর্ব অনুভব করেন নাফাজ মোহাম্মদ। হাম্মাম শুধু দক্ষ একজন নাবিকই নয়, প্রশাসন পরিচালনায় তার বুদ্ধিমত্তার তুলনা হয় না। কেন, কেউ জানে না, লিল হাম্মাম অসম্ভব ভক্তি করে নাফাজ মোহাম্মদকে।

সাগর কন্যা। রেডিও রূম।

গভীর মনোযোগের সাথে নাফাজ মোহাম্মদের কথা শুনছে কমান্ডার হাম্মাম। মাঝে মধ্যে আপনমনে দ্রুত মাথা ঝাঁকাচ্ছে। তারপর একটা সুইচ অন করে ওয়্যারলেস কলটাকে লাউড স্পীকারের সাথে সংযুক্ত করে দিল।

'ইয়েস স্যার, সব পরিষ্কার বুঝতে পারছি,' বলছে কমান্ডার হাম্মাম। 'চারদিকে নজর রাখার নির্দেশ দিচ্ছি আমি। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেয়া হয়ে যাবে। তবে, ঠিক কি ধরনের অস্ত্রশস্ত্র আসছে জানতে পারলে...'

'বুদ্ধি খাটাও, হাম্মাম! আজেবাজে প্রশ্ন করে শুধু শুধু আমার সময় নষ্ট কোরো না,' মৃদু তিরস্কারের সুরে বললেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'আমি ওদের তরফ থেকে কি ধরনের আক্রমণ আশঙ্কা করছি তা তো বললাম, এরপর তোমার নিজেরই বুঝে নেওয়া উচিত কি ধরনের অস্ত্রশস্ত্র পাঠাতে পারি আমি।' এক সেকেন্ড চুপ থেকে আগের চেয়ে নিস্তেজ গলায় আবার বললেন, 'তবে, এখনও কোন ব্যবস্থা করে উঠতে পারিনি। শুধু এইটুকু জানি, প্রচুর আর্মস অ্যান্ড অ্যামুনিশন দরকার পড়বে

সাগর কন্যাকে রক্ষা করার জন্যে। তা আমি সংগ্রহ করব। যেভাবেই হোক।'

'স্যার, আসলে আমি বলতে চাইছিলাম...,' খানিক ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত কথাটা বলেই ফেলল কমান্ডার হাম্মাম, 'আমার মনে হয়, কয়েকটা ব্যাপার আপনার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।'

'হোয়াট! যেমন?' তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইলেন নাফাজ মোহাম্মদ।

'স্যার, আপনি বলছেন সশস্ত্র ভাসমান যুদ্ধ জাহাজ ব্যবহার করা হতে পারে আমাদের বিরুদ্ধে। সত্যি যদি এতদূর বাড়াবাড়ি করতে সাহস পায় ওরা, তাহলে কি ধরে নিতে হয় না যে বাড়াবাড়ির কোন সীমা রাখবে না ওরা?'

'আসল কথাটা বলে ফেলো, কমান্ডার।'

'আমি বলতে চাইছি, স্যার, কয়েকটা নৌ-ঘাঁটির ওপর নজর রাখা তেমন কোন কঠিন কাজ নয়—কিন্তু কয়েক ডজন বিমান ঘাঁটির ওপর নজর রাখা বেশ একটু কঠিন, অথচ তুলনামূলক বিচারে সেটাই বেশি দরকার।'

'গুড গড!' অপর প্রান্তে প্রায় আঁৎকে উঠলেন নাফাজ মোহাম্মদ। পনেরো সেকেন্ড আর কোন সাড়া নেই তাঁর। কমান্ডার হাম্মাম বুঝতে পারছে, বসের মাথার ভিতর ঝড় বয়ে যাচ্ছে। অবশেষে বললেন, 'তুমি কি সত্যিই মনে করো...'

'সাগর কন্যাকে ভালবাসি, স্যার। বোমা বা শেল যাই ছুটে আসুক, সাগর কন্যাকে আঘাত করার আগে নিজের বুক পেতে দেব যাতে নিজের চোখে সর্বনাশটা দেখে যেতে না হয়। যে-কোন জাহাজের চেয়ে একটা বম্বার প্লেন দ্রুত অকুস্থল থেকে সরে যেতে পারে। ইউ. এস. নেভী বা স্থলঘাঁটির ফাইটারগুলো যদি খবর পায়, ধাওয়া শুরু করার আগেই নিজের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে যাবে বম্বারটা। কিন্তু একটা যুদ্ধ জাহাজ এত দ্রুত পালাতে পারবে না, ফেরার পথে হলেও তাদেরকে বাধা দেয়া সম্ভব ইউ. এস. নেভী বা এয়ারফোর্সের পক্ষে। আরেকটা কথা, স্যার।'

অপর প্রান্তে কোন সাড়া নেই নাফাজ মোহাম্মদের।

'একটা জাহাজ একশো মাইল দূরে থাকলেও তাকে থামিয়ে দেয়া যায়,' বলছে কমান্ডার, 'কিন্তু একটা গাইডেড মিসাইলকে? অসম্ভব ব্যাপার, তাই না, স্যার? যতদূর জানি, আজকাল ওগুলোর রেঞ্জ চার হাজার মাইলের মত। মিসাইলটা যখন, ধরুন স্যার, আমাদের কাছ থেকে বিশ মাইল দূরে থাকবে, তখন ওরা হিট-সোর্স ডিভাইসের সুইচ অন করে দেবে। খোদা জানেন, আশে পাশের একশো মাইলের মধ্যে একমাত্র আমরাই হিট-সোর্স।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন নাফাজ মোহাম্মদ। তারপর গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন, 'আর কোন খুশির খবর আছে তোমার কাছে, কমান্ডার হাম্মাম?'

বসের মেজাজ গরম হয়ে উঠছে বুঝতে পেরেও সাগর কন্যা আর নিজের প্রাণের স্বার্থে যা বাস্তব বলে মনে হচ্ছে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিচ্ছে কমান্ডার। বলল, 'আর একটা মাত্র কথা, স্যার। আমি যদি শত্রুপক্ষ হতাম, মানে, ওদেরকে যদি শত্রু বলতে পারি...'

'শয়তানগুলোকে যে কোন নামে ডাকতে পারো তুমি...'

'আমি সাগর কন্যার ধ্বংস চাইলে এক্ষেত্রে একটা সাবমেরিন ব্যবহার

করতাম, স্যার,' শান্ত গলায় বলল কমান্ডার হাম্মাম। 'মিসাইল ছোঁড়ার জন্যে ওটাকে এমন কি পানির ওপর ভেসে উঠতেও হবে না। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা, প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ। পর মুহূর্তে সাগর কন্যা গায়েব। আক্রমণকারীর চিহ্ন পর্যন্ত নেই। সাগর কন্যার ডেকে বিপুল পরিমাণ এক্সপ্লোসিভ ফেলার চেয়ে পানির নিচে দিয়ে এসে নির্বিঘ্নে কাজ সেরে চুপিসাড়ে কেটে পড়া—অনেক বেশি সহজ নয়, স্যার?'

'এরপর তুমি অ্যাটমিক-হেডেড মিসাইলের কথা বলবে নাকি?'

'কয়েকটা সিসমোলজিক্যাল স্টেশনকে আঘাত করার জন্যে অ্যাটমিক-হেডেড মিসাইল? মনে হয় না, স্যার। সেক্ষেত্রে মশা মারতে কামান দাগা হয়ে যাবে। তবে কিছুই জোর করে বলা যায় না, স্যার। সাগর কন্যার সাথে গেছি এটা মেনে নেয়া যায়। তবু ধ্বংসস্তূপ থেকে কিছু উদ্ধারের আশা থাকবে। কিন্তু বাষ্প হয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেছি, ভাবতেও গায়ের রোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে আমার, স্যার।'

'ভোরে দেখা হবে তোমার সাথে,' কানেকশন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

মাউথপীসটা হুকে ঝুলিয়ে রেখে রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিল কমান্ডার হাম্মাম, পাশে দাঁড়ানো লোয়াঙ্গোর দিকে তাকাল।

বাবাল লোয়াঙ্গো কমান্ডার হাম্মামের ডান হাত এবং সাগর কন্যার হেড ড্রিলার। সে-ও একজন আরব, কিন্তু বর্তমানে মার্কিন নাগরিক। নিজের পেশায় অত্যন্ত দক্ষ। একটু বেঁটে সে, গায়ের রঙ মিশমিশে কালো।

'দুঃসংবাদ, লোয়াঙ্গো,' গম্ভীর গলায় বলল কমান্ডার হাম্মাম। 'মি. নাফাজ যা বললেন···' কাঁধ ঝাঁকাল সে, 'তাঁর শত্রুরা একজোট হয়ে ভয়ঙ্কর কিছু একটা করতে যাচ্ছে। ভোর হবার আগেই কিছু লোক পাঠাচ্ছেন এখানে, তিনি নিজেও আসছেন। যতদূর বুঝলাম, সাগর কন্যাকে রক্ষা করার জন্যে যুদ্ধ করতে আসছে লোকগুলো। সাথে করে আর্মস অ্যামুনিশনও নিয়ে আসছে তারা। সম্ভবত আগামীকাল দুপুর বা বিকেলের দিকে সাগর কন্যা আক্রান্ত হবে বলে আশঙ্কা করছেন তিনি।' এক মিনিট; বলে হাত বাড়িয়ে এক ঝাঁক টেলিফোনের ক্রাডল থেকে একটা রিসিভার তুলে নিল কমান্ডার। অপর প্রান্তে রিসিভার তুলল তার একজন সহকারী। তাকে কয়েকটা জরুরী নির্দেশ দিল সে।

'যোদ্ধা? অস্ত্রশস্ত্র?' অবিশ্বাসের ভাব ফুটে উঠেছে হেড ড্রিলার বাবাল লোয়াঙ্গোর চোখেমুখে। 'কমান্ডার, তারমানে, বম্বার-সাবমেরিনের কথা যা বললেন সব আপনি বিশ্বাস করেন?'

'বিশ্বাস না করতে পারলে ভাল হত,' বলল কমান্ডার হাম্মাম। 'কিন্তু মি. নাফাজের শত্রুদেরকে কিছুটা চিনি আমি, তাই এসব একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছি না। যাই হোক, আত্মরক্ষার জন্যে তৈরি থাকতে হবে আমাদেরকে।'

'আমার কাছে একটা পিস্তল আছে। আপনার কাছে একটা রিভালভার আছে। সাগর কন্যা আর নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্যে এগুলো যথেষ্ট বলে মনে করেন?'

'কানে কম শোনো? বললাম না, অস্ত্রশস্ত্র আসছে?'

'কোত্থেকে?' শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল বাবাল লোয়াঙ্গো। 'কি ধরনের

অস্ত্র?'

ভুরু কুঁচকে উঠল কমান্ডার হাম্মামের। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, 'তাইতো! যে-ধরনের আক্রমণ আশঙ্কা করছি আমরা তা ঠেকাতে হলে প্রচলিত সাধারণ অস্ত্র কোন কাজেই আসবে না। টর্পেডো দরকার আমাদের। মিসাইল দরকার। কামান দরকার। অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান...মাই গড! এসব কোত্থেকে যোগাড় করবেন মি. নাফাজ?'

'আমি সেই কথাই জানতে চাইছি,' বলল বাবাল লোয়াঙ্গো। 'ভাড়াটে সৈন্য যোগাড় করা সম্ভব। কিন্তু এসব মারণাস্ত্র বাজারে ভাড়া বা কিনতে পাওয়া যায় না।'

'যায়, তুমি খবর রাখো না,' বলল কমান্ডার। 'কিন্তু মি. নাফাজ তা কিনবেন বলে আমি বিশ্বাস করি না। এ-ধরনের বে আইনী কাজ তিনি করতে পারেন না।' হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ। 'আমার বিশ্বাস, সরকারের কাছ থেকে সাহায্য নেবেন তিনি। বিপদের গুরুত্ব যদি বোঝানো যায়, সরকার সাহায্য করতে বাধ্য।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'চলো, বাইরেটা একবার ঘুরে দেখে আসি। অস্ত্রশস্ত্র কোথায় মোতায়েন করা হবে জায়গাটা বাছাই করে রাখা দরকার।'

সন্ধ্যা লাগছে, দ্রুত অন্ধকার হয়ে আসছে চারদিক। কমান্ডারের পিছু পিছু সাগর কন্যার প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে এল বাবাল লোয়াঙ্গো।

তলা থেকে মাপ দিলে নয়শো ফিট পানির উপর ভাসছে সাগর কন্যা। তার টেনশনিং কেবল ক্যাপাসিটির জন্যে পানির এই গভীরতা কোন সমস্যা নয়। জায়গাটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লীজ দেয়া খনি এলাকার এবং বিখ্যাত পুব পশ্চিম জলপথের দক্ষিণে, গালফ অব মেক্সিকোর তীর ঘিরে এখনও যে প্রকাণ্ডতম তেল ভাণ্ডারটা পুরোপুরি আবিষ্কৃত হয়নি ঠিক তার ওপরে। ড্রিলিং ডেরিকের কাছে থামল ওরা। টেকনিশিয়ানরা একটা অপারেশন নিয়ে ব্যস্ত। একটা ড্রিল তার সাধ্য মত সবটুকু বাঁক নিয়ে তেল-খনির বিস্তৃতি সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা পেতে চেষ্টা করছে। ক্রু আর টেকনিশিয়ানরা কমান্ডারকে দেখে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে অভিবাদন জানাচ্ছে, কথা বলে সময় নষ্ট করছে না কেউ। কঠোর পরিশ্রম করার জন্যে বাছাই করা লোক এরা সবাই।

রাষ্ট্রীয় জলসীমার বাইরে এ-ধরনের ড্রিলিং নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আইন পাস হবার পুরোপুরি সম্ভাবনা রয়েছে। নাফাজ মোহাম্মদ এ-ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন, কিন্তু উদ্বিগ্ন নন। এ-ধরনের একটা আইন তৈরি হতে প্রচুর সময় লাগাই স্বাভাবিক। কিন্তু দেরি যতই হোক, এ-ধরনের ড্রিলিং নিষিদ্ধ করে একটা আইন পাস হবেই একদিন। সেই দিনটা আসার আগে এই বিশাল, অফুরন্ত তেল-ভাণ্ডার থেকে যত বেশি সম্ভব তেল তুলে নিতে চান তিনি। অবশ্য আরও কয়েক হাজার সাগর কন্যাকে যদি এই কাজে লাগানো যায় তাহলেও কয়েকশো ভাগের এক ভাগ তেলও আগামী দশ বছরে তোলা সম্ভব হবে না, এ-থেকেই কল্পনা করা যায় কি পরিমাণ তেল মউজুদ রয়েছে সাগরের নিচে। একাধিক সাগর কন্যা তৈরি করে আরও বেশি তেল আহরণ করার পদক্ষেপ নিতে পারেন নাফাজ মোহাম্মদ, কিন্তু তাতে আরও বেশি করে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে তাঁকে, আরও অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হবে,

ইত্যাদি নানা কথা ভেবে লোভটাকে দমন করে রেখেছেন তিনি। কিন্তু ক্রু আর টেকনিশিয়ানদের প্রতি তাঁর নির্দেশ আছে, কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, এক সেকেন্ড সময় নষ্ট করা চলবে না।

ক্রু আর টেকনিশিয়ানরা সবাই কমান্ডার লিল হাম্মামের বাছাই করা লোক। এদেরকে রাতদিন চব্বিশ ঘন্টা খাটায় সে। তাই বলে কর্মীরা কেউ তার প্রতি অসন্তুষ্ট নয়। তার কারণ, অন্য সব কোম্পানীর কর্মীদের চেয়ে সাগর কন্যার কর্মীরা দ্বিগুণ, কোন কোন ক্ষেত্রে চারগুণ বেশি বেতন পায়। বেশির ভাগ ক্রুই আরব, তবে কিছু বাংলাদেশী, পাকিস্তানী এবং ভারতীয় লোকও আছে। এরা সবাই ভাল খেতে পায়, আরামের বিছানায় শোয়—কোন খরচ দিতে হয় না। মদ বা মেয়েমানুষের সুবিধে নেই বটে, কিন্তু একটানা বারো ঘন্টা বেদম কাজ করে ঘুম ছাড়া আর কিছু চায়ও না তারা। পরিশ্রমটা এদের গায়ে লাগে না আরও একটা কারণে। প্রতি এক হাজার ব্যারেল তেল পিছু মোটা টাকা বোনাস পায় প্রত্যেকে।

প্ল্যাটফর্মের পশ্চিমদিকের মঞ্চে চড়ে প্রকাণ্ড স্টোরেজ ট্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে আছে কমান্ডার হাম্মাম আর হেড ড্রিলার লোয়াঙ্গো, ট্যাঙ্কের মাথায় ওয়ার্নিং লাইটগুলোকে আলোকসজ্জার মত লাগছে দেখতে। কিছুক্ষণ পর ঘুরে দাঁড়াল ওরা, মঞ্চ থেকে নেমে ফিরে আসছে মেস আর কোয়ার্টার এলাকার দিকে।

'ঠিক করতে পেরেছেন, কমান্ডার, কোথায় মোতায়েন করা হবে অস্ত্রশস্ত্র?' সকৌতুকে জানতে চাইল বাবাল লোয়াঙ্গো।

'মেস আর কোয়ার্টার এলাকায় অন্তত নয়,' গম্ভীর ভাবে বলল কমান্ডার।

'কেন?'

'নিজেই বোঝার চেষ্টা করো,' বলল কমান্ডার। 'ঠিক কোথায় মোতায়েন করা যেতে পারে তা এখনও বুঝতে পারছি না। ঘুমের মধ্যে পেয়ে যাব বুদ্ধিটা। চারটের দিকে তুমি আমার ঘুম ভাঙাবে।'

সাগর-তলার গহীন গভীরে লাইমস্টোনের রীফ রয়েছে একটা, তৈরি হয়েছে আনুমানিক পঞ্চাশ কোটি বছর আগে খুদে সামুদ্রিক প্রাণীদের মৃতদেহ থেকে। এই বিশাল রীফের মাঝখানে রয়েছে অফুরন্ত তেল। এই তেলই তুলে আনছে সাগর কন্যা।

টি. এল. পি-তে তেল মউজুদ রাখার কোন ব্যবস্থা নেই। আইনের নিষেধ তো আছেই, স্বাভাবিক বুদ্ধিতেও বলে, কোন অয়েল রিগের উপর বা পাশে হাইড্রোকারবন স্টোর করা সাংঘাতিক বিপজ্জনক একটা বোকামির পরিচয়। কমান্ডার হাম্মামের পরামর্শে তাই একটা প্রকাণ্ড ট্যাঙ্ক তৈরি করা হয়েছে, সাগর কন্যার তিনশো গজ দূরে ভাসছে সেটা। ট্যাঙ্কটাও হুবহু সাগর কন্যার পদ্ধতিতে নোঙর করা। পরিশোধনের পর পাম্প করে এই ট্যাঙ্কে জমা করা হয় তেল।

দিনে কখনও একবার, কখনও দু'বার একটা পঞ্চাশ হাজার ডি-ডব্লিউ ট্যাঙ্কার পাশে এসে ভেড়ে, খালি করে নেয় প্রকাণ্ড ট্যাঙ্কটা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ দিকে যাওয়া আসা করছে এ-ধরনের তিনটে ট্যাঙ্কার। তিনটেই সাউল শিপিং লাইনসের কাছ থেকে চার্টার করা। নাফাজ অয়েল কোম্পানীর একাধিক সুপার ট্যাঙ্কার

থাকলেও সেগুলো এক্ষেত্রে ব্যবহার না করার পিছনে দুটো কারণ আছে। সাগর কন্যা ট্যাঙ্কের সবটুকু তেল দিয়েও একটা সুপার ট্যাঙ্কারের চারভাগের এক ভাগ জায়গা ভরবে না. তার মানে এ-কাজে সুপার-ট্যাঙ্কার ব্যবহার করা লোকসানের ব্যাপার। আরেকটা কারণ হলো তেল খালাস করার জন্যে নাফাজ অয়েল কোম্পানী যে-সব বন্দর বেছে নিয়েছে সে-সব বন্দরে পঞ্চাশ হাজার ডি ডব্লিউ এর চেয়ে বড় ট্যাঙ্কার ভেড়ার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এবং পানির গভীরতা নেই।

এই সব ছোট ছোট বন্দর থেকে ছোট ছোট তেল ব্যবসায়ীরা নাফাজ অয়েল কোম্পানীর তেল সস্তায় কিনে সামান্য লাভে অন্য ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করে দেয়। এদের পুঁজি কম, রিসার্চ এবং অনুসন্ধানের পেছনে টাকা খরচ করার সামর্থ্য নেই। কিন্তু এরাই আবার রাষ্ট্রীয় জলসীমার বাইরে ড্রিলিং করার বিরুদ্ধে সোচ্চার। লেক তাহোর আজকের মীটিংয়ের এদের প্রতিনিধিও ছিল।

নাফাজ অয়েল কোম্পানীর বিরুদ্ধে এরা সবাই একজোট হয়ে মার্কিন সরকারের কাছে বহুবার অভিযোগ করেছে। কিন্তু তেল সঙ্কটের এই যুগে নাফাজ অয়েল কোম্পানী পরিমাণে প্রচুর এবং সস্তায় তেল সরবরাহ করতে পারছে বলে কংগ্রেস বা সিনেট কোন অভিযোগই কানে তোলেনি। এক আনুমানিক হিসেবে জানা গেছে সম্ভবত সরকারের লীজ দেয়া সমস্ত এলাকার মোট তেল উৎপাদনের চেয়েও বেশি তেল উৎপাদন করে একা সাগর কন্যা। তেল আসছে, সেটাই বড় কথা—কোথেকে আসছে এই মুহূর্তে সে-ব্যাপারে মাথা ঘামাবার কোন উৎসাহ নেই মার্কিন সরকারের।

ফ্লোরিডা। রানা এজেন্সী।

বিকেল পাঁচটায় বন্ধ হয়ে গেছে অফিস। এখন সন্ধ্যা সাতটা, কিন্তু দরজা খোলা রেখে নিজের অফিস কামরায় বসে ফাইল পত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছে আনিস। আসলে সে মাসুদ ভাইয়ের অপেক্ষা করছে।

আজ সকালেও একবার অফিসে এসেছিল রানা। আনিসকে বলে গেছে এজেন্সীর জরুরী একটা কাজে মায়ামী যাচ্ছে ও, আজই ফিরে আসবে। কিন্তু কখন ফিরে আসবে তা কিছু বলে যায়নি। তবু বাইরে সমস্ত প্রোগ্রাম বাতিল করে দিয়ে অফিসেই বসে আছে আনিস। ভাবছে, মায়ামী থেকে ফিরে এসে মাসুদ ভাই নিশ্চয়ই তাকে ফোন করবেন। অথবা, বলা যায় না, সশরীরে এই অফিসেই হয়তো চলে আসবেন। বসের লোভনীয় সান্নিধ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার কোন ইচ্ছে নেই তার।

নক হলো দরজায়।

তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে নিজের কামরা থেকে বেরিয়ে এল আনিস। রিসেপশন রুম পেরিয়ে ভেজানো দরজা খুলে বাইরে তাকাতেই বেজার হয়ে উঠল মনটা। মাসুদ ভাই নয়, আগন্তুকের চোখে চোখ রেখে ভাবছে সে, অসময়ে উৎকট ঝামেলা।

আগন্তুক লম্বায় সাড়ে পাঁচ ফিটের বেশি হবে না, আন্দাজ করছে আনিস। একটু মোটা। পরনে দামী স্যুট। চেহারাটা নির্বিকার, মুখে হাসি নেই। 'ভিতরে

আসতে পারি?' জানতে চাইল সে। কণ্ঠস্বরটা মার্জিত. প্রশ্নের ভঙ্গিতে যথেষ্ট ভদ্রতা।

'শিওর,' বলল আনিস। এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে ভিতরে ঢোকার পথ করে দিল আগন্তুককে। 'অবশ্য অফিসটাইমের পরে খুব জরুরী কোন কারণ ছাড়া কারও সাথে দেখা করি না আমরা।'

'বুঝতে পারছি। খুব জরুরী একটা ব্যাপারেই এসেছি আমি।' রিসেপশনে ঢুকল আগন্তুক, 'ডেভিড রীড,' নিজের পরিচয় দিল সে। দ্রুত হাতে পকেট থেকে বের করে আনল একটা আইডেনটিটি কার্ড। 'এফ. বি. আই।'

বাড়ানো হাত থেকে কার্ড নিল না আনিস, সেটার দিকে তাকাল না পর্যন্ত। 'এই রকম কার্ড যে কেউ ছেপে আনতে পারে। কোথেকে আসছেন আপনি?'

'মায়ামী।'

'ফোন নাম্বার?'

হাতের কার্ডটা উল্টো করে আনিসের চোখের সামনে তুলে ধরল আগন্তুক। ফোন নাম্বারটা লেখা রয়েছে সেখানে। চোখ বুলিয়েই কাঁধ ঝাঁকাল আনিস। 'হুঁ,' গম্ভীর হয়ে উঠেছে ও। 'সন্দেহ নেই, এফ. বি. আই। মায়ামীতে আপনিই বস্‌, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল ডেভিড রীড।

'আসুন,' বলে ঘুরে দাঁড়াল আনিস। পিছনে এফ. বি. আই-কে নিয়ে নিজের কামরায় ঢুকল। 'বসুন,' ডেস্কের পিছনে নিজের রিভলভিং চেয়ারে বসে বলল আবার।

ধীরে ধীরে ডেস্কের সামনের একটা চেয়ারে বসল ডেভিড রীড।

'প্রথম প্রশ্ন,' জেরা করার ভঙ্গিতে জানতে চাইল আনিস, 'আমরা কি আপনাদের নেক্ নজরে পড়েছি—মানে, আমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের তদন্ত করতে এসেছেন?'

'সহজ ভাষায়, সাহায্য চাইতে এসেছি,' ব্যঙ্গ বা ঠাট্টার সুরে নয়, গম্ভীর ভাবে বলল ডেভিড রীড। 'আধঘণ্টা আগে সরাসরি স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে নির্দেশ পেয়েছি আমি। আপনার সাহায্য দরকার ওদের, আমি শুধু অনুরোধটা বয়ে এনেছি।'

'রানা এজেন্সীর সৌভাগ্য বলতে হবে,' বলল আনিস। 'তারমানে, আপনি বলতে চান স্টেট ডিপার্টমেন্ট আমাদের খবর রাখে? চেনে?'

'আমি চিনি,' মুচকি একটু হাসল এতক্ষণে রীড। 'আমার কাছে খবর আছে, মি. নাফাজ মোহাম্মদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব আপনার।'

'বন্ধুত্ব! চিন্‌-পরিচয় আছে, তার বেশি কিছু নয়,' সতর্ক হয়ে উঠেছে আনিস।

'মি. নাফাজের সাথে ঘনিষ্ঠতা থাকা অত্যন্ত গর্বের ব্যাপার,' বলল রীড। 'অস্বীকার করছেন কেন, বুঝতে পারছি না। যাই হোক, আমরা চাইছি মি. নাফাজ সম্পর্কে কিছু জরুরী তথ্য আপনি আমাদেরকে জানাবেন।'

'নিরাশ হয়ে ফিরে যান,' সাফ জবাব দিল আনিস। 'জরুরী কেন, ভদ্রলোক সম্পর্কে মামুলি কোন তথ্যও জানা নেই আমার।'

'আগে আমার বক্তব্যটা শুনুন, মি. অ্যানস।
কিন্তু আনিসের চেহারায় কোন রকম আগ্রহের ভাব দেখা যাচ্ছে না।
'টেলিফোনে খুব চেঁচামেচি করছেন মি. নাফাজ মোহাম্মদ, স্টেট ডিপার্টমেন্টের উদ্দেশ্যে,' বলতে শুরু করল রীড। 'স্টেট ডিপার্টমেন্টের ধারণা, তিনি নিরাপত্তাহীনতা বোধে ভুগছেন। রোগী যেহেতু মি. নাফাজ, একজন বিলিওনিয়র, স্টেট ডিপার্টমেন্ট তাই হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারেনি। মি. নাফাজ বড়জোর ঘণ্টা খানেক আগে ফোনে চেঁচামেচি করেছেন, দেখুন, এরি মধ্যে আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে আমাকে। ব্যাপারটা যে সিরিয়াসলি নেয়া হয়েছে, এটুকু নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন?'
'কি ধরনের চেঁচামেচি?'
'অর্থহীন, অবশ্যই। গালফ অব মেক্সিকোতে তাঁর একটা অয়েল রিগ আছে, জানেন নিশ্চয়ই?'
'সাগর কন্যা। হ্যাঁ।'
'মি. নাফাজের দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁর এই সাগর কন্যা ভয়ঙ্কর বিপদের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। ওটার অস্তিত্বই নাকি বিপন্ন হয়ে পড়েছে। তিনি নিরাপত্তা ব্যবস্থা দাবি করছেন। তাঁর দাবি একজন মালটি মিলিওনিয়ারের উপযুক্ত দাবি। বলছেন, ক্ষেপণাস্ত্রবাহী ফ্রিগেট, যে-কোন ধরনের মিসাইল ফাইটার যেন তৈরি হয়ে থাকে, তিনি ডাকলেই এরা যেন ছুটে যায় সাগর কন্যাকে রক্ষা করার জন্যে। আরও বলছেন, মর্টার, অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান, টর্পেডো, বাজুকা—ইত্যাদিও দরকার তাঁর। এগুলো সাগর কন্যায় মোতায়েন করবেন।'
ভুরু কুঁচকে উঠেছে আনিসের। দ্রুত চিন্তা করছে ও। মাসুদ ভাই কি তা হলে এই বিপদটার কথাই বলেছেন তাকে গতকাল?
'কেন? কার কাছ থেকে কি ধরনের বিপদ আশঙ্কা করছেন তিনি?' প্রশ্ন করল আনিস।
'ওখানেই তো গণ্ডগোল,' কাঁধ ঝাঁকাল রীড। 'এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজী নন মি. নাফাজ। শুধু বলছেন, গোপন সূত্রে খবর পেয়েছেন তিনি। গোপন সূত্র যে তাঁর আছে, এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই আমাদের। সব ধনী ব্যবসায়ীদেরই তা থাকে।'
'আমার সাথে বরং খোলাখুলি সব কথা আলোচনা করুন,' বলল আনিস।
'বিশ্বাস করুন, এর বেশি কিছু জানি না আমরা,' আবেদনের সুরে বলল রীড। 'বাকিটা আমাদের বিশ্লেষণ। স্টেট ডিপার্টমেন্টকে ডাকাডাকি করার মানেই ব্যাপারটার সাথে বিদেশী রাষ্ট্র জড়িত। ক্যারিবিয়ানে এই মুহূর্তে সোভিয়েট নৌ-যান রয়েছে। স্টেট ডিপার্টমেন্টের নাকে আন্তর্জাতিক দুর্ঘটনার গন্ধ ঢুকছে। কিংবা আরও উৎকট কোন দুর্গন্ধ।'
'আমাকে কি করতে বলেন আপনি?'
'বেশি কিছু নয়। খোঁজ নিয়ে শুধু এইটুকু জানুন, আগামী দু'দিন কোথায় কোথায় যাবার ইচ্ছে আছে তাঁর।'
'আপনার প্রস্তাব যদি প্রত্যাখ্যান করি?' জানতে চাইল আনিস। 'ফ্লোরিডায়

আমাদের কাজ করার লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে?'

'আমি হয়তো তাই চাইব,' নির্বিকার মুখে বলল রীড। 'কিন্তু আমার চাওয়ায় কিছু এসে যাবে না। আমার চেয়ে এগারো ধাপ ওপরের কর্মকর্তারা রানা এজেন্সীকে ফ্লোরিডায় কাজ করার অনুমতি দিয়েছে, চাইলে তারাও এখন লাইসেন্স বাতিল করতে পারবে না, আরও দুই ধাপ ওপরের কর্মকর্তাদেরকে রাজী করাতে হবে তাদের। সুতরাং সে-প্রশ্ন ওঠে না। যদি প্রত্যাখ্যান করেন, খালি হাতে ফিরে যাব। কিন্তু আমি মনে করি মি. নাফাজ মোহাম্মদের ভাল-মন্দে আপনার অনেক কিছু এসে যায়। ভুল সন্দেহের বশে তিনি যদি কোন আত্মঘাতি চাল চেলে বসেন, তাতে তিনি একা নাজেহাল হবেন না, তাঁর সাথে তাঁর একমাত্র মেয়েরও কিছুটা অশান্তি হবে। বাপের কিছু হলে মেয়ে সইতে পারবে না, আর মেয়েটার কিছু হলে আপনি সইতে পারবেন না—ঠিক কিনা?'

সটান উঠে দাঁড়াল আনিস, বুড়ো আঙুল বাঁকা করে দরজাটা দেখিয়ে বলল, 'অনেক বেশি জানেন আপনি। প্লীজ গেট আউট।'

'সিট ডাউন, প্লীজ,' শান্ত গলায় বলল রীড। 'মাথা গরম করবেন না। ভুলে যাচ্ছেন কেন, খুব বেশি জানাই তো আমার কাজ। যাই হোক, ব্যাপারটাকে একটু অন্যরকম দৃষ্টিকোণ থেকে দেখুন। মনে করুন, এর সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রশ্নও জড়িত। সেরকম ক্ষেত্রেও কি আপনি সাহায্য করবেন না আমাদের সরকারকে?'

'তিলকে তাল করছেন আপনি।'

'হয়তো। কিন্তু স্টেট ডিপার্টমেন্ট আর এফ.বি.আই-এর পলিসি হলো কোন ঝুঁকি না নেয়া।'

ধীরে ধীরে আবার বসে পড়ল আনিস। বলল, 'বেকায়দায় আটকে নিয়ে মোচড় দিচ্ছেন, আপনাদের চরিত্রই এই। তা আমরা কি করব বলে আশা করছেন আপনারা? মি. নাফাজের সাথে দেখা করে জিজ্ঞেস করব স্টেট ডিপার্টমেন্টের কান ফাটাচ্ছেন কেন? জিজ্ঞেস করব আসলে তাঁর উদ্দেশ্য কি? আগামী দু'দিন তিনি কি কি করার পরিকল্পনা নিয়েছেন?'

হাসছে রীড। 'অত কড়া সুরে নয়। মার্জিত অপারেটর হিসেবে খ্যাতি আছে আপনার। কিভাবে প্রসঙ্গ তুলে কথা বের করবেন সে-কৌশল ভালই জানা আছে আপনার।' উঠে দাঁড়াল সে। হাতের কার্ডটা ডেস্কে রেখে টোকা দিয়ে পাঠিয়ে দিল আনিসের সামনে। 'এটা রাখুন। জানাবার মত কোন খবর পেলেই ফোন করবেন আমাকে। কতক্ষণ লাগবে আপনার কাজটায়?'

'ঘণ্টা দুই।'

'কি বললেন?' রীড যেন বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেল। 'মাত্র দু'ঘণ্টা? তার মানে, নাফাজ ম্যানসনে ঢোকার জন্যে আমন্ত্রণ পাবার অপেক্ষায় থাকতে হয় না আপনাকে?'

'হয় না।'

'লক্ষপতিদেরও হয়।'

'আমি এমন কি হাজারপতিও নই।'

একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর রীড বলল, 'আপনি ভাগ্যবান, মি. আনিস। বিশ্বাস করুন, আমার ঈর্ষা হচ্ছে। গুড নাইট।'

রীডকে বিদায় করে দিয়ে নিজের চেয়ারে দু'মিনিট চুপচাপ বসে থাকল আনিস। তারপর হাত বাড়িয়ে ফোনের ক্র্যাডল থেকে রিসিভারটা তুলে নিয়ে ডায়াল করল।

সরাসরি নাফাজ মোহাম্মদ ফোন ধরেন না, জানে আনিস। কিন্তু এই মুহূর্তে অপরপ্রান্তে তিনিই তুলেছেন ফোনের রিসিভার। 'হু ইজ দেয়ার?' বাঘের মত হুঙ্কার ছাড়লেন তিনি, পিলে পর্যন্ত চমকে উঠল আনিসের।

মৃদু গলায় বলল, 'আমি আনিস, মি. নাফাজ।'

'সরি, ম্যান,' বাঘের গর্জন নয়, প্রায় আদরের মত শোনাল কোমল কণ্ঠস্বরটা এবার। 'কিছু মনে কোরো না। ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে মাথাটা গরম হয়ে আছে। তা শিরির নাম্বারে ফোন করলেই পারতে।'

'আপনার সাথে একটু কথা বলা দরকার, মি. নাফাজ। ব্যাপারটা জরুরী আর গুরুত্বপূর্ণ হতেও পারে, আবার নাও পারে—ঠিক বুঝছি না। ফোনে বলা সম্ভব নয়।'

'চলে এসো।' যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সাথে সাথে।

গত দেড় ঘণ্টায় এমন সব তিক্ত অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে, এখনও ডিনামাইটের মত বিস্ফোরিত হননি নাফাজ মোহাম্মদ, সেটাই আশ্চর্য।

স্টেট ডিপার্টমেন্ট তাঁর বক্তব্য শুনেছে, কিন্তু কোনরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়নি, কৌশলে এড়িয়ে গেছে। সাগর কন্যা বিপদে পড়তে যাচ্ছে, নাফাজ মোহাম্মদের এই বক্তব্যের পক্ষে বাস্তব প্রমাণ চেয়েছে তারা, নাফাজ মোহাম্মদ সে-সব দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তার কারণ, ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কতদূর গড়াবে তা নিজেও তিনি ভাল করে বুঝে উঠতে পারছেন না। তাছাড়া, তাঁর হাতে তেমন বাস্তব প্রমাণই বা কোথায়?

এদিকে সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। সাগর কন্যাকে রক্ষার জন্যে কিছু যদি করতে হয়, এখুনি করতে হবে। একটা মিনিটও এখন অত্যন্ত মূল্যবান, ষাট সেকেন্ডের এদিক-ওদিকে সাগর কন্যা হারাতে হতে পারে তাঁকে।

প্রথম কাজ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেয়া। সেজন্যে অস্ত্র, গোলাবারুদ দরকার। মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারছেন না তিনি, দুই কোটি বিশ লক্ষ ডলার হাতে নিয়ে তার বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে হেকটর, তাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করছে ভেনিজুয়েলার বেলোনি, রাশিয়ার নিশেভ।

স্টেট ডিপার্টমেন্ট তাঁকে নিরাশ করেছে, কিন্তু তাই বলে গালে হাত দিয়ে বসে থাকতে পারেন না তিনি। সাগর কন্যা স্রেফ তাঁর একটা পুঁজি নয়, অত্যন্ত প্রিয় শখের জিনিসও বটে। একে রক্ষা করার জন্যে তিনি পারেন না এমন কাজ নেই। অন্তত রক্ষা করার জন্যে সম্ভাব্য সব রকম চেষ্টা তাঁকে করতেই হবে।

আগেই খবর দিয়ে রেখেছিলেন দু'জন বেআইনী অস্ত্র ব্যবসায়ীকে, এবার তিনি তাদেরকে ডেকে পাঠালেন। ফোর্ট লডারডেলের নাফাজ ম্যানসনে নয়, শহরে

তাঁর আর যে-সব বাড়ি আছে সেগুলোর একটাতে তাদের সাথে দেখা করলেন তিনি। এরা তাঁকে আরেকটা অপ্রত্যাশিত ধাক্কা দিল। যার ফলে সাগর কন্যার বিপদ সম্পর্কে আরও নিশ্চিত হলেন তিনি, এবং এই প্রথম নিজেকে তাঁর অসহায় মনে হলো।

খুব বড় স্কেলে ব্যবসা করতে হলে ভাল-মন্দ সব ধরনের লোকের সাথে পরিচয় রাখতে হয়। এই মার্কিন অস্ত্র-ব্যবসায়ীরাও তাঁর পূর্ব পরিচিত। প্রথমেই কয়েক ধরনের আর্মস অ্যামুনিশনের নাম উচ্চারণ করলেন নাফাজ মোহাম্মদ। জানতে চাইলেন, এগুলো তারা যোগাড় করে দিতে পারবে কিনা। দাম যাই হোক।

সবিনয়ে নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করল ওরা। জানাল এ-ধরনের অস্ত্র আগে তারা বিক্রি করেছে বটে, কিন্তু এখন স্টকে নেই। অন্য কোন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে যোগাড় করে দেয়া সম্ভব?—জানতে চাইলেন নাফাজ মোহাম্মদ।

প্রচুর ইতস্তত করে ব্যবসায়ীরা জানাল, হয়তো সম্ভব, কিন্তু সাপ্লাই পেতে অন্তত এক হপ্তা সময় লাগবে। নাফাজ মোহাম্মদ জানালেন, আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এসব অস্ত্র পেতে হবে তাঁকে।

ব্যবসায়ীরা হাসি দমন করে বিদায় নিল।

এরপর মরিয়া হয়ে অন্যান্য অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের প্রায় সবার সাথে যোগাযোগ করলেন নাফাজ মোহাম্মদ। সবচেয়ে বড় অস্ত্র ব্যবসায়ী নিউ ইয়র্কে থাকে, ফোনে তার সাথে যোগাযোগ করে জানতে চাইলেন ফ্লোরিডার গুদাম থেকে এ-ধরনের অস্ত্র সাপ্লাই দিতে পারবে কিনা সে।

সবাই নিরাশ করল নাফাজ মোহাম্মদকে। পারব না, এ-কথা প্রায় কেউই মুখ ফুটে উচ্চারণ করল না। সবাই জানাল, পারবে। তবে সময় দিতে হবে কম পক্ষে সাত দিন।

ক্লান্ত, বিধ্বস্ত অবস্থা নাফাজ মোহাম্মদের। ঘামতে শুরু করেছেন। রীতিমত আতঙ্কবোধ করছেন তিনি।

অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের এই অসহযোগিতার আসল কারণ বুঝতে অসুবিধে হয়নি তাঁর। আঁটঘাট বেঁধেই নেমেছে হেকটর। কাউকে ভয় দেখিয়ে, কাউকে ঘুষ দিয়ে, কাউকে অনুরোধ করে রাজী করিয়েছে তারা কেউ যেন নাফাজ মোহাম্মদের কাছে কোন অস্ত্র বিক্রি না করে। তাদের নিয়মিত খদ্দের হেকটর, রাজী করাতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি তাকে।

পরবর্তী পনেরোটা মিনিটকে নাফাজ মোহাম্মদের জীবনের সবচেয়ে অশান্তিময় সময় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। প্রচণ্ড মানসিক ক্লেশে ভুগেছেন তিনি। কি করা যায় এখন? অস্থির ভাবে পায়চারি করতে করতে ভাবছেন। ভাগ্যের হাতে সঁপে দেবেন সাগর কন্যাকে? তা পরাজয় স্বীকারেরই নামান্তর। কই, মনে তো পড়ে না জীবনে কোন ব্যাপারে পরাজয় মেনে নিয়েছেন কখনও! আজ তাই মেনে নেবেন? নাকি···

আরেকটা পথ দেখতে পাচ্ছেন সামনে। সরকার তাঁকে রক্ষা করতে সম্মত হয়নি। অথচ আত্মরক্ষার অধিকার প্রত্যেকের আছে।

আত্মরক্ষার জন্যে আইন হাতে তুলে নিতে পারেন তিনি। তাহলেই সামনের

প্রাচীরটা সরে যায় তাঁর।

আরও কয়েকটা মিনিট নিজের বিবেক, আদর্শ আর জীবনদর্শনের সাথে কুস্তি করলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত আর কোন পথ তাঁর সামনে খোলা নেই দেখে, নিজের হাতে আইন তুলে নেবারই সিদ্ধান্ত নিলেন।

ঝড়ের বেগে রেডিও রুমে ঢুকলেন তিনি।

প্রথমে ফ্লোরিডার মাফিয়া গুণ্ডা জিউসেপ বারজেনের সাথে কথা বললেন নাফাজ মোহাম্মদ। প্রতিমাসে এই লোকটাকে মোটা টাকা বেতন দিয়ে অনেকদিন থেকে পকেটে ভরে রেখেছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত একে কোন কাজে লাগাননি বা কখনও ভাবেনওনি কাজে লাগাবার প্রয়োজন পড়বে।

বাটন রুজের লুই গিয়ানায় থাকে প্যাটন, এরপর তার সাথে কথা বললেন নাফাজ মোহাম্মদ। প্যাটনের গর্ব হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কোর্ট-মার্শাল হয়েছে এমন সমস্ত ন্যাভাল অফিসারের মধ্যে তার পদটাই সবচেয়ে বড় ছিল। তার আরেকটা গর্ব, কোন সাহায্য না চেয়েও প্রতি মাসে তাকে মোটা টাকা বেতন দেন নাফাজ মোহাম্মদ।

এরা দু'জনেই সুনির্দিষ্ট নির্দেশ পেল নাফাজ মোহাম্মদের কাছ থেকে।

নাফাজ ম্যানসন। খবর পেয়ে আগেই গেট খুলে রেখেছে দারোয়ান, স্যাঁৎ করে বাঁক নিয়ে দ্রুতগতিতে ভেতরে ঢুকে পড়ল আকাশী রঙের একটা স্পোর্টস কার। গাড়ি-বারান্দায় থামল সেটা। স্টার্ট বন্ধ করে দিয়ে নামল আনিস।

স্টাডিরুমে অভ্যর্থনা জানালেন ওকে নাফাজ মোহাম্মদ। নিজেই প্যাড লাগানো দরজাটা বন্ধ করলেন ভেতর থেকে। এগিয়ে গিয়ে দেয়ালের সামনে দাঁড়ালেন, একটা বোতামে চাপ দিতেই ধীরে ধীরে দু'ফাঁক হয়ে গেল সেটা, ভেতরে দেখা যাচ্ছে একটা বার। নিজের জন্যে গ্লাসে বরফ আর স্কচ হুইস্কি ঢালছেন। 'কি দেব তোমাকে, আনিস?' জানতে চাইলেন তিনি।

'ধন্যবাদ,' বলল আনিস। 'কিছু লাগবে না আমার।'

বারটা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়ালেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'বসো,' বললেন তিনি। এগিয়ে এসে একটা সোফায় বসলেন। 'নানা ঝামেলায় খুব অশান্তির মধ্যে আছি, বাবা। তোমাকে দেখে শান্তি লাগছে। কিছুক্ষণ অন্তত সব ভুলে থাকতে পারব।' একটু তীক্ষ্ণ হলো তাঁর দৃষ্টি, আনিসের মুখ দেখে মনের কথা পড়ে নিতে চেষ্টা করছেন। তাঁর ধারণা, আনিস সম্ভবত শিরিকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিতে এসেছে। এ-ধরনের একটা ঘটনার জন্যে অপেক্ষা করছেন তিনি বেশ কিছুদিন থেকে।

'দুঃখিত,' বলল আনিস, 'আমি বরং আপনার অশান্তি আরও বাড়াতে এসেছি।'

'কি রকম?' একটু কৌতুকের সুরে জানতে চাইলেন নাফাজ মোহাম্মদ।

'সাত মিনিট আগে একজন সিনিয়র এফ.বি.আই. এজেন্ট আমার সাথে দেখা করে গেছে,' বলল আনিস। ডেভিড রীডের কার্ডটা বাড়িয়ে দিল সে নাফাজ মোহাম্মদের দিকে। 'এটার পেছনে ফোন নাম্বার আছে। আপনার কাছ থেকে কিছু তথ্য যদি আদায় করতে পারি, এই নাম্বারে ফোন করে জানাতে হবে।'

'হাউ ভেরি ইন্টারেস্টিং!' বলে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন তিনি। তারপর জানতে চাইলেন, 'কি ধরনের তথ্য?'

'রীডের ভাষায় স্টেট ডিপার্টমেন্টকে ডেকে আপনি খুব চেঁচামেচি করেছেন। আপনি নাকি ভাবছেন সাগর কন্যা হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। ওরা জানতে চায়, এই গোপন তথ্য আপনি কোথায় পেলেন? এবং এখন আপনি কি করতে যাচ্ছেন?'

'এফ.বি.আই. সরাসরি আমার কাছে আসেনি কেন?'

'স্টেট ডিপার্টমেন্টকে যতটুকু বলেছেন তারচেয়ে বেশি কিছু ওদেরকেও বলবেন না, তাই। এ-বাড়িতে আমার অবাধ যাতায়াত, এ খবর রাখে ওরা। আমার সাথে আপনি রেখে-ঢেকে কথা বলবেন না, এই ভেবে আমার সাহায্য চেয়েছে।'

'ঠিক জায়গায় টোকা দিয়েছে ওরা, সন্দেহ নেই,' বললেন নাফাজ মোহাম্মদ। একটু হাসলেন তিনি। 'আমি কি ধরে নেব তুমি ওদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এখানে এসেছ? তাহলে সাবধানে কথা বলতে হয় তোমার সাথে।'

'সেটা কোন ব্যাপার নয়। আপনি ইচ্ছা করলে সব কথা জানাতে পারেন আমাকে, নাও পারেন। জানালে যে ওদেরকে সব বলে দেব তাও ঠিক নয়।' একটু থেমে আবার বলল আনিস, 'নিজের বিচার-বুদ্ধিকে সবচেয়ে বেশি মূল্য দিই আমি। যা ভাল মনে হবে, তাই করব।'

'জটিল সব কেসের সমাধান করে দিয়ে খুব তো নাম করেছ তুমি,' বললেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'শুনেছি মক্কেলদের স্বার্থটাই তুমি বড় করে দেখো, যে-জন্যে আইনের সাথে তোমার ভাল বনিবনা নেই। আমার···'

'যারা কোন অপরাধ করেনি বলে বিশ্বাস করি শুধু তাদেরই কেস নিয়ে থাকি আমরা,' নাফাজ মোহাম্মদকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল আনিস। 'কেউ অপরাধ করেছে কি করেনি সেটা অনেক সময় স্রেফ দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। বেশির ভাগ সময় আইনের সাথে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি মেলে না।'

'আমার একটা প্রস্তাব···আমি তোমাদের মক্কেল হতে চাই,' কথাটা কৌতুকের সুরে নয়, ভেবেচিন্তে দেখেই বললেন নাফাজ মোহাম্মদ।

'কিন্তু আমরা আপনাকে মক্কেল হিসেবে চাই না,' স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল আনিস।

'কেন, কেন?'

'আমাদের সাহায্য আপনার দরকার করে না, তাই,' বলল আনিস। 'আপনার নিজেরই অসংখ্য এজেন্ট আছে, স্পাই আছে। প্রচুর টাকা দিয়ে তাদেরকে পুষছেন আপনি।'

'আমাকে মক্কেল করলে তোমরাও প্রচুর···লাভের মুখ দেখবে।'

'আমার মিশন ব্যর্থ,' উঠে দাঁড়াল আনিস। মৃদু হেসে বলল আবার, 'সাক্ষাৎ দান করে কৃতজ্ঞ করেছেন আমাকে, মি. নাফাজ। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'আরে বসো, বসো! ভুল করে ফেলেছি, যা বলেছি ভুলে যাও,' ব্যস্ত হয়ে উঠে দ্রুত বললেন নাফাজ মোহাম্মদ। কি যেন স্মরণ করার ভঙ্গিতে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর মৃদু হাসলেন তিনি। 'শেষবার কবে ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছি মনে করার চেষ্টা করছিলাম এইমাত্র। মনে হচ্ছে, স্মরণ শক্তি সত্যি দুর্বল আমার।

এফ. বি. আই এর জন্যে তথ্য, কেমন? ওদেরকে বলো, আমার তথ্যের উৎস হলো কয়েকটা অজ্ঞাতনামা টেলিফোন কল। ভয়ঙ্কর ধরনের হুমকি দিচ্ছে ওরা। সাগর কন্যার অপারেশন যদি বন্ধ না করি, আমার মেয়েকে কিডন্যাপ করবে বলে শাসাচ্ছে। বলছে, কতদিন আমি লুকিয়ে বা পাহারা দিয়ে রাখব মেয়েকে? একজন স্নাইপারের বুলেটের বিরুদ্ধে আসলে কারও কিছু করার থাকে না। তাছাড়া, আমাকে নত করতে যদি খুব বেশি বেগ পেতে হয়, হুমকি দিচ্ছে, সাগর কন্যাকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। এবার আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। আগামীকাল বিকেলে সাগর কন্যায় যাচ্ছি আমি। চব্বিশ ঘন্টা, এমন কি আটচল্লিশ ঘন্টাও ওখানে থাকতে হতে পারে আমাকে।'

'আপনার দুটো বিবৃতির মধ্যে আদৌ কি কোন সত্যতা আছে?'

'নেই। থাকবে বলে আশা করাও উচিত নয় তোমার। এইটুকু অন্তত তুমি জানো যে ওদের কাছে সাহায্য চেয়ে এখনও কোন সাড়া পাইনি আমি। কোন্ স্বার্থে ওদেরকে সত্যি কথাটা বলতে যাব? রিগে যাব ঠিকই, তবে রওনা হব ভোরের দিকে। আপাতত চলবে এতে?'

'চলবে,' বলল আনিস। কিন্তু ধন্যবাদ জানাল না।

সিঁড়ির ধাপ ক'টা নামার সময় শিরি ফারহানাকে দেখতে পেল আনিস। স্পোর্টস কারের ভেতর বসে আছে ওর অপেক্ষায়।

'এখানে কি করছ?' দরজা খুলে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল আনিস।

'ওটা তো আমার প্রশ্ন,' ফর্সা মুখটা অভিমান আর রাগে লালচে হয়ে ওঠায় আরও সুন্দর দেখাচ্ছে শিরিকে। 'চোরের মত চুপিচুপি এসে বাবার সাথে দেখা করলে, আমার সাথে দেখা করে মাফ চাইবে সে সাধারণ ভদ্রতাটুকু পর্যন্ত দেখালে না...'

'মাফ চাইব?' আকাশ থেকে পড়ল আনিস। 'তোমার কাছে? কেন?'

'অভদ্র আচরণ করলে মাফ চাইতে হয়, তাও তোমার বস্ তোমাকে শেখাননি?'

'এসব আজেবাজে কথার মানে কি?'

হঠাৎ আনিসকে এভাবে রেগে উঠতে দেখে অবাক হয়ে গেছে শিরি। এ-ধরনের ভাষা আগে কখনও ব্যবহার করেনি আনিস। অভিমান, রাগ সব উবে গেল, এখন ভয় লাগছে তার। বলল, 'গতকাল লাঞ্চ খেতে বসে হঠাৎ ওভাবে চলে গেলে...'

'তাহলে তো সারা জীবন ধরে প্রায় রোজই একবার করে মাফ চাইতে হবে তোমার কাছে।'

বিমূঢ় দেখাচ্ছে শিরিকে। ঠিক বুঝতে পারছে না আনিসের কথা।

'বস্ ডাকলে দুনিয়ার সব কাজ ফেলে ছুটতে হবে আমাকে,' বলল আনিস। 'বিয়ের কথা আবার তোলার আগে এই বিষয়টা ভাল করে ভেবে দেখে নিয়ো। আর, এই প্রথম এবং শেষবার জানিয়ে দিচ্ছি, আমার বস্ সম্পর্কে কোন কটু কথা তোমার মুখে আর যেন না শুনি কখনও।'

'মনে হয়,' পরিবেশটাকে হালকা করার জন্যে কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সাথে বলল শিরি। 'ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ফেরেশতা হবেন—তা না হলে সবাই যাকে এত ভক্তি করে সেই আনিস আহমেদের ভক্তি তিনি পেতে পারেন না। এই,' আনিসের গায়ে কাঁধ দিয়ে মৃদু ধাক্কা মারল শিরি, 'ভদ্রলোককে বড় দেখতে ইচ্ছে করছে—একদিন নিয়ে এসো না…সরি!' দ্রুত নিজেকে শুধরে নিল সে, তাড়াতাড়ি বলল, 'আমিই তাঁকে দেখতে যাব, আমাকেই একদিন নিয়ে চলো না তাঁর কাছে—খুব রাগী মানুষ বুঝি?'

'মাটির মানুষ,' এককথায় প্রসঙ্গটার ইতি করল আনিস, তারপর জানতে চাইল, 'জরুরী কাজ আছে, দয়া করে নামবে তুমি?'

'নামব,' লক্ষ্মী মেয়ের মত মাথা কাত্ করে রাজী হয়ে গেল শিরি। 'কিন্তু তার আগে আমার প্রশ্নের উত্তর চাই।'

'কি প্রশ্ন?'

'কেন এসেছিলে বাবার কাছে?'

'তা জেনে তোমার কোন লাভ নেই।'

'এমন গোপন বিষয় যা আমাকেও বলতে পারো না?' আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইল শিরি। 'কি হয়েছে, আনিস? বাবাকে অস্বাভাবিক অস্থির লাগছে। প্লীজ, আমার কাছে কিছু লুকিয়ো না।'

'প্রশ্নটা তোমার বাবাকে করলেই তো পারো,' বলল আনিস। দরজা খুলে নিচে নামল ও। 'এসো। ভয় লাগলে বলো, তোমাকে আমি তাঁর কাছে পৌঁছেও দিয়ে আসতে পারি।' মুখ ভার করে নিঃশব্দে গাড়ি থেকে নামল শিরি। 'কিন্তু যদি ধমক মারেন, আমাকে দোষ দিতে পারবে না।' বলে আবার গাড়িতে উঠে বসল আনিস। দরজাটা বন্ধ করে জানালা দিয়ে মুখ বের করে হাসল একটু। 'গুড নাইট।' স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিল গাড়ি।

গাড়ি-বারান্দায় বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে শিরি।

সবচেয়ে কাছের টেলিফোন বুদের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল আনিস। ডায়াল করে নাফাজ মোহাম্মদকে চাইল। অপর প্রান্তে তাঁর সাড়া পেয়ে বলল, 'মি. নাফাজ, দুঃখিত, আবার বিরক্ত করছি আপনাকে। আমার ভয়, শিরির কৌতূহল মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারে। ওকে কিডন্যাপ করার হুমকি দেয়া হয়েছে, স্থানীয় পুলিসের ওপর আপনার কোন আস্থা নেই—ওকে ডেকে এই ধরনের কিছু কথা শুনিয়ে দিলে বোধহয় ভাল হয়।'

'ঠিক বলেছ তুমি।'

অফিস-কাম-বাড়ি ফেরার পথে দ্রুত চিন্তা করছে আনিস। সাগর কন্যায় ঠিকই যাবেন নাফাজ মোহাম্মদ, কিন্তু কখন যাবেন? এফ.বি.আই-কে বলতে বলেছেন আগামীকাল বিকেলে যাবেন। কিন্তু তাকে বলেছেন ভোরের দিকে রওনা দেবেন। ভদ্রলোক এফ.বি.আই-কে যদি মিথ্যে কথা বলতে পারেন তাকেও বলতে পারেন। যদিও তাকে মিথ্যে কথা বলার কি কারণ থাকতে পারে তা ভেবে পাচ্ছে না সে।

ভদ্রলোক বিপদটাকে যে সাংঘাতিক গুরুত্বের সাথে নিয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্টেট ডিপার্টমেন্টের সাহায্য চাওয়া থেকেই তা বোঝা যায়। কিন্তু

বিপদের লক্ষণ এবং প্রমাণ দেখাতে রাজী নন, সেজন্যে কোন সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও আদায় করতে পারছেন না এই অবস্থায় বোকার মত কিছু করে বসা তাঁর পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। স্টেট ডিপার্টমেন্টের আচরণে নিশ্চিয়ই তিনি অসহায় বোধ করছেন।

তার নিজের কি করা উচিত এই অবস্থায়? ভাবছে আনিস। মাসুদ ভাইয়ের পরামর্শ পেলে ভাল হত।

কিন্তু অফিসে ফিরে নিরাশ হলো আনিস। টেলিফোনের সাথে টেপ-রেকর্ডার রেখে গিয়েছিল, সেটা পরীক্ষা করে দেখল তার অনুপস্থিতিতে কোন ফোন কল আসেনি।

সিগারেট খায় না আনিস, কিন্তু মক্কেল আর বন্ধুদের জন্যে রাখতে হয়। নিজের চেয়ারে বসে একটা সিগারেটের প্যাকেট খুলল সে। ধীরসুস্থে ধরাল একটা। এবং প্রায় সাথে সাথে বুদ্ধিটা এসে গেল মাথায়।

দ্রুত কাগজ কলম নিয়ে রিপোর্ট লিখতে বসে গেল আনিস। ডেভিড রীড তার সাথে দেখা করার পর থেকে যা যা ঘটেছে তার একটা বিশদ বর্ণনা লিখতে বিশ মিনিট সময় নিল ও।

এরপর রীডকে ফোন করল। রীডের সাথে কথা শেষ করে অফিসে তালা ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ল আবার। নাফাজ ম্যানসনের ওপরে নজর রাখবে সে। রানার জন্যে লিখে রেখে যাওয়া রিপোর্টে তার এই নৈশ অভিযানের কথাও উল্লেখ করেছে সে।

কিন্তু নাফাজ ম্যানসনের কাছাকাছি পৌঁছে সিদ্ধান্ত পাল্টাল আনিস। বাড়ির উপর নয়, আসলে নজর রাখা দরকার নাফাজ মোহাম্মদের ব্যক্তিগত হেলিপোর্টের উপর। সাগর কন্যায় যেতে হলে 'কপ্টার নিয়েই যেতে হবে তাঁকে।

গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নিল আনিস।

পাঁচ

ঠিক মাঝরাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দু'জায়গায় দুটো অস্ত্রাগার লুট হলো। দুটোই সরকারী অস্ত্রাগার, একটা স্থলবাহিনীর, অপরটা নৌ-বাহিনীর।

দুই দল লুটেরাই এ-কাজে অত্যন্ত দক্ষ, এর আগে এ-ধরনের অসংখ্য কাজ করে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাতে পেরেছে এরা, এদের কাজে ভুল থাকার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

প্রথম দলটার নেতৃত্ব দিল জিউসেপ বারজেন। বলিষ্ঠ চেহারার নয়জন লোককে সাথে নিয়ে বারোটা বাজার পনেরো মিনিট আগে স্থলবাহিনীর ফ্লোরিডা অস্ত্রাগারে এসে পৌঁছল সে। প্রত্যেকে সামরিক পোশাক পরে এসেছে, তার মধ্যে তিনজনের পোশাকের দিকে তাকালেই মেজর বলে চেনা যাবে।

ছয়জন গার্ড রয়েছে অস্ত্রাগারে। ঘড়ির কাঁটা ধরে পালা বদল হয় এদের। ক্লান্ত,

গা ছেড়ে দেয়া একটা ভাব এসে গেছে সবার মধ্যে। আর মাত্র ক'মিনিট পর পালা বদল ঘটবে. তার অপেক্ষায় আছে এরা। কেউ কেউ চোখ বুজে ঝিমুচ্ছে। মেইন গেটে ধাক্কাধাক্কি হচ্ছে শুনে কেউ তেমন সতর্ক হয়ে উঠল না। গেটটা খুলে দিতে এল দু'জন গার্ড।

গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল তিনজন সামরিক অফিসার। হকচকিয়ে গেল গার্ড দু'জন। ভয়ে থরহরি কম্প! নিরাপত্তা এবং সতর্কতা পরীক্ষা করার জন্যে সারপ্রাইজ ভিজিট দিতে এসেছেন অফিসাররা।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেঁধে ফেলা হলো ছয়জন গার্ডকে। বাধা দিতে গিয়ে আহত হলো দু'জন। সবার হাত পিছমোড়া করে বেঁধে মুখের ভেতর কাপড় গুঁজে দিল জিউসেপ বারজেনের লোকেরা। সবাইকে একটা কামরায় ভরে বাইরে থেকে তালা মেরে দেয়া হলো দরজায়।

এদিকে যখন এসব চলছে, বারজেনের আরেক লোক ওদিকে তখন তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখছে কোথায় কি ধরনের অ্যালার্ম সিস্টেম রয়েছে অস্ত্রাগারে। লোকটার নাম জেমিসন, একজন প্রতিভাবান ইলেকট্রোনিকস এক্সপার্ট। নিকটতম পুলিস আর মিলিটারি হেডকোয়ার্টারকে সতর্ক করে দেবার জন্যে কয়েক প্রস্থ এক্সটার্নাল অ্যালার্ম সিস্টেম থাকার কথা এখানে, রয়েছেও তাই। এক এক করে সবগুলোর কানেকশন কেটে দিল জেমিসন। এতে আধঘণ্টার কিছু বেশি সময় নিল সে।

ইতিমধ্যে, ঠিক বারোটা বাজার একমিনিট আগে, গার্ডদের অপর দলটা এসে পৌঁচেছে। তিনটে মেশিন-কারবাইন তাক করে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে এদেরকে। কয়েক মিনিটের মধ্যে হাত বেঁধে ফেলার কাজও সারা। কিন্তু এদের কারও মুখে কাপড় গুঁজে দেয়নি বারজেনের লোকেরা। প্রথম দলটার সাথে একই কামরায়, আটকে রাখা হলো এদেরকেও। যত পারে চেঁচিয়ে গলা ফাটাক, কিছু এসে যায় না তাতে। অস্ত্রাগারের এক মাইলের মধ্যে কোন জনবসতি নেই। হাতে আট ঘণ্টা সময় পাচ্ছে বারজেন, তার আগে এই লুটের ঘটনা জানাজানি হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

বাইরের জঙ্গলে লুকিয়ে রেখে আসা মিনিবাসটা নিয়ে আসার জন্যে একজন লোককে পাঠাল বারজেন। লোকটার নাম অটকিনস। মেইন গেটের ভেতর দিয়ে উঠানে নিয়ে এসে দাঁড় করাল মিনিবাসটাকে সে। এই মিনিবাসে চড়েই এখানে পৌঁচেছে এরা সবাই।

ইতিমধ্যে সামরিক পোশাক ছেড়ে শ্রমিকদের খাটো পোশাক পরে নিয়েছে অটকিনস ছাড়া বাকি সবাই।

ওদিকে গ্যারেজের তালা ভেঙে দু'টনের একটা ট্রাক বেছে নিচ্ছে অটকিনস। চাবি নেই, তাই তার জোড়া লাগিয়ে স্টার্ট দিল ট্রাকে। অস্ত্রাগারের মেইন লোডিং দরজাটা খুলে ফেলা হয়েছে এরই মধ্যে, সেটার সামনে ট্রাকটাকে নিয়ে এসে দাঁড় করাল সে।

জ্যাকব নামে একজন লোক রয়েছে বারজেনের দলে, লোকটা তালা খোলার যাদুকর। যে-কোন ধরনের তালা কমবিনেশন হোক বা অন্য কিছু, একবার চোখ

বুলিয়েই বলে দিতে পারে ওটা খুলতে কতক্ষণ সময় নেবে সে, কিন্তু কাজের বেলায় দেখা যায় মাত্র অর্ধেক সময়ের মধ্যেই খুলে ফেলেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে জ্যাকবকে কোন কাজ দিতে পারল না বারজেন, কারণ, মেইন অফিসের দেয়ালে চাবির ভারী গোছাটা প্রায় হাতছানি দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওদের।

অটকিনসের বাছাই করা ট্রাকটা ঢাকা-দেয়া ভ্যান টাইপের। ওরা পৌচেছে পৌনে এক ঘন্টাও হয়নি এরই মধ্যে ট্রাক ভর্তি করার কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে। বাজুকা থেকে শুরু করে মেশিন পিস্তল, নানান ধরনের অস্ত্র সাথে করে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। প্রচুর পরিমাণ হাই এক্সপ্লোসিভ আর একটা ব্যাটালিয়নের জন্যে যথেষ্ট অ্যামুনিশন নিতেও ভুল করছে না।

ট্রাক ভরার কাজ শেষ করে অস্ত্রাগারের সবগুলো দরজায় তালা মেরে দিল বারজেন। চাবির গোছাটা পকেটে ভরল সে। সকাল আটটায় এসে কি ঘটেছে জানার জন্যে কিছু অতিরিক্ত সময় ব্যয় করতে হবে পালা-বদলের দলটাকে।

পরিত্যক্ত পোশাকগুলো মিনিবাসে তোলা হয়েছে। গাড়িটাকে চালিয়ে নিয়ে এসে সেই আগের জায়গায় লুকিয়ে রাখল অটকিনস। তারপর পায়ে হেঁটে ফিরে এল সে ট্রাকের কাছে। ড্রাইভিং সীটে উঠে বসে স্টার্ট দিল।

ট্রাকের পেছনে, অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদের উপর বসে আছে বাকি নয়জন। জায়গা কম, বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে সবার। কিন্তু নাফাজ মোহাম্মদের ব্যক্তিগত হেলিপোর্ট এখান থেকে মাত্র বিশ মিনিটের পথ, এর চেয়ে অনেক বেশি সময় ধরে এর চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট সহ্য করার অভ্যাস আছে এদের।

আশপাশে জনবসতি নেই, ঝোপঝাড়-গাছপালা আর ফাঁকা জায়গার মাঝখানে নাফাজ মোহাম্মদের হেলিপোর্ট। বড় আকারের দুটো হেলিকপ্টার দাঁড়িয়ে, এগুলোর পাইলট আর কো-পাইলট ছাড়া ভেতরটা নির্জন আর ফাঁকা।

শুধু সাইড লাইটগুলো জ্বেলে হেলিপোর্টের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল ট্রাকটা। থামল একটা হেলিকপ্টারের পাশে। সুইচ অন করে পোর্টেবল লোডিং লাইট জ্বালা হলো কয়েকটা। আলোর তেমন উজ্জ্বলতা নেই, ম্লান আভায় কাজ করছে ওরা। কিন্তু আশি গজ দূর থেকে চোখে নাইট গ্লাস তুলে সবই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে আনিস আহমেদ। উঁচু একটা মাটির ঢিবিতে, ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছে সে।

কার্গোর পরিচয় বা চেহারা ঢাকার কোন চেষ্টা নেই, বিশ মিনিটের মধ্যে ট্রাক থেকে সব তুলে ফেলা হলো একটা হেলিকপ্টারে। তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করছে পাইলট ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশনে কোন অনিয়ম বা ভুল হয়ে গেল কিনা।

পকেট থেকে বের করে চাবির গোছাটা অটকিনসকে দিল বারজেন, তারপর বাকি আটজন লোককে নিয়ে উঠে বসল দ্বিতীয় 'কপ্টারে। এখন ওদের অপেক্ষার পালা। এই 'কপ্টারের পাইলট এরই মধ্যে নিকটতম এয়ারপোর্টকে রেডিও মারফত তার গন্তব্যস্থান সম্পর্কে অবহিত করেছে। কোন মিথ্যে তথ্য দেয়নি সে, সাগর কন্যায় যাচ্ছে বলেই জানিয়েছে। গালফ স্টেটস বরাবর রাডার ট্র্যাকিং সিস্টেমগুলো প্রথম শ্রেণীর, একদিকে যাব বলে মাঝপথে কোর্স বদল করে আরেক দিকে যাবার চেষ্টা করলে অমনি পিছু ধাওয়া করে একজোড়া সুপারসনিক জেট।

তখন অপ্রীতিকর প্রশ্নের উত্তর দিতে গলদঘর্ম হতে হয় পাইলটকে

অস্ত্রাগারের গ্যারেজে ফিরিয়ে আনল ট্রাকটাকে অটকিনস। তার খুলে স্টার্ট বন্ধ করল সে। গ্যারেজে আর মেইন গেটে তালা মারল আবার। তারপর পায়ে হেঁটে ফিরে এল মিনিবাসের কাছে।

ভোর হবার আগেই বন্ধুদের কাপড়-চোপড় যার যার অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে দেবে অটকিনস। মিনিবাসটা চুরি করা, সেটাকেও যেখান থেকে নিয়ে আসা হয়েছে সেইখানে রেখে আসবে সে। ব্যস, ছুট্টি।

একঘেয়ে বিরক্তিকর লাগছে আনিসের, কনুই দুটোও ব্যথা করছে। আধঘণ্টা আগে হেলিপোর্ট ছেড়ে চলে গেছে ট্রাকটা। সেই থেকে একই ভঙ্গিতে কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে পড়ে আছে সে, চোখ থেকে একবারও নামায়নি নাইট-গ্লাস। খিদেতে হু-হু করছে পেট, তার ওপর মশার কামড়, কতক্ষণ সহ্য করা যায়। ওদিকে, হেলিকপ্টার দুটো স্টার্ট নিচ্ছে না দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, কারও জন্যে অপেক্ষা করছে পাইলটরা। নিশ্চয়ই নাফাজ মোহাম্মদের জন্যে, ভাবল আনিস।

এইসময় একটা শব্দ পেল সে। দ্রুত এগিয়ে আসছে। এঞ্জিনের শব্দ। গেটের দিকে তাকাতেই দেখল একটা মিনিবাস ঢুকছে। লোকজন নিয়ে জিউসেপ বারজেন যে 'কপ্টারে উঠে বসে আছে সেটার পাশে এসে থামল গাড়িটা। গাড়ি থেকে লোক নামছে। সুশৃঙ্খলভাবে উঠে যাচ্ছে সবাই 'কপ্টারে। গুনল আনিস। মোট বারোজন।

শেষ লোকটা 'কপ্টারের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, এই সময় আরেকটা গাড়ি বিদ্যুৎবেগে গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। এটার হেডলাইট অফ করা নয়, জ্বলছে। একটা রোলস-রয়েস। সন্দেহ নেই, নাফাজ মোহাম্মদ পৌঁছুলেন, ভাবল আনিস। প্রায় কোন শব্দ না তুলে, ঝাঁকি না খেয়ে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িটা। সাদা স্যুট পরা কেউ নামছে। চিনতে পারছে আনিস, নাফাজ মোহাম্মদ। প্যাসেঞ্জার 'কপ্টারের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছেন তিনি।

এবার ওরা রওনা হয়ে যাবে, ভাবছে আনিস। অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করেও দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারেনি এখনও সে। চোখের সামনে যা ঘটে গেল, দেখে স্থির থাকা যায় না। কিন্তু করারই বা আছে কি তার? শিরিকে ভালবাসে সে, তার বাবার পেছনে পুলিস লেলিয়ে দেয়া কি ঠিক কাজ হবে?

হঠাৎ মনে হলো, একটা পথ অন্তত খোলা আছে তার সামনে—নাফাজ মোহাম্মদকে বাধা দিতে পারে সে। বোঝাবার চেষ্টা করতে পারে, যা তিনি করেছেন বা করতে যাচ্ছেন তার পরিণাম ভয়ঙ্কর না হয়ে যায় না। শিরির বাবা হিসেবে এটুকু খাতির তিনি পেতে পারেন। যুক্তি যদি শোনেন, ব্যাপারটা মিটে যাবে, আর না শুনলে নিজের বিবেক, বিচার-বুদ্ধি তখন যা বলে তাই করবে সে।

উঠে দাঁড়াল আনিস। নিজেকে গোপন করার দরকার নেই এখন আর। সংক্ষিপ্ত পথটা ধরে হেলিকপ্টারের দিকে এগোতে যাবে, এই সময় ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা কাঁধে একটা হাতের স্পর্শ অনুভব করে।

'থামো। কোথায় যাচ্ছ?' বলল রানা।

ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল আনিস। 'মাসুদ ভাই! আপনি কখন…'

'তোমাকে একটা ব্যাপারে সতর্ক করার জন্যে অফিসে গিয়েছিলাম,' অন্ধকারে রানার গলা শুনতে পাচ্ছে আনিস। 'তোমার রিপোর্ট পড়ে বুঝলাম তুমি নাফাজ ম্যানসনের ওপর নজর রাখছ, তাই এখানে চলে এলাম আমি এসে দেখি…'

'রিপোর্ট লিখে বেরিয়ে আসার পর আমার মনে হলো বাড়ির ওপর নজর না রেখে হেলিপোর্টের ওপর নজর রাখা দরকার,' বলল আনিস। 'কি ব্যাপারে আমাকে সতর্ক করতে গিয়েছিলেন, মাসুদ ভাই?'

'তোমার রিপোর্টের নিচে লিখে রেখে এসেছি,' বলল রানা। 'ওদিকে কোথায় যাচ্ছিলে?'

'মি. নাফাজকে বাধা দেয়া দরকার, মাসুদ ভাই। ভদ্রলোক নিজের কবর খুঁড়তে শুরু করেছেন। একটু আগে…'

'সব দেখেছি আমি,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'বাজুকা, মেশিনগান, এক্সপ্লোসিভ। একুশজন লোক। চেহারাতেই প্রমাণ, একজনও ভাল লোক নয়, আইন ভাঙতে অভ্যস্ত। কিন্তু তুমি যে বাধা দিতে যাচ্ছ, তোমার বাধা উনি মানবেন কেন? যা করছেন, দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েই করছেন। তাছাড়া যা ঘটবার তা তো ঘটেই গেছে। তুমি নিশ্চয়ই আশা করো না মি. নাফাজের লোকেরা ওই সব অস্ত্র আর গোলাবারুদ যেখান থেকে চুরি করেছে সেখানে রেখে আসবে আবার?'

'কোত্থেকে চুরি করেছে…'

'নিশ্চয়ই সবচেয়ে কাছের কোন সরকারী অস্ত্রাগার থেকে।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর বলল আনিস, 'এখনও রওনা হচ্ছে না… বোধহয় আগে থেকে ঠিক করা আছে টেক অফ করার সময়। হয়তো আরও বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে। আমার গাড়িতে রেডিও ফোন আছে। মাসুদ ভাই, কর্তৃপক্ষকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিতে চাই আমি।'

'সবচেয়ে কাছের আর্মি কমান্ড পোস্ট এখান থেকে কত দূরে জানো?'

'জানি,' ম্লান গলায় বলল আনিস। 'সাত মাইল।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু বলার প্রয়োজন বোধ করল না। দুটো 'কপ্টারের এঞ্জিনই একযোগে স্টার্ট নিয়েছে। কর্কশ যান্ত্রিক শব্দে কান ঝালাপালা। কয়েক সেকেন্ড পরই আকাশে উঠে গেল মেশিন দুটো।

'দেখেছেন, মাসুদ ভাই, কেমন জ্বালিয়ে রেখেছে সমস্ত নেভিগেশন্যাল লাইট?' তিক্ত গলায় বলল আনিস। 'যেন ওদের মত ভালমানুষ নেই আর। আসলে কিছুর সাথে ধাক্কা খাবার ভয়ে বাধ্য হয়ে…' হঠাৎ আরেকটা বুদ্ধি ঢুকল তার মাথায়। 'মাসুদ ভাই, সবচেয়ে কাছের এয়ারবেসকে খবরটা দিতে পারি না আমরা? তারা ধাওয়া করে ফিরিয়ে আনবে, বাধ্য করবে ওগুলোকে নামাতে।'

'কোন্ যুক্তিতে? কিসের অভিযোগে?'

'সরকারী জিনিস চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে।'

'কোন প্রমাণ নেই। আমরা বললাম আর ওরা বিশ্বাস করল—ব্যাপারটা সেরকম বলে মনে করছ কেন? 'কপ্টারগুলো নাফাজ মোহাম্মদের, একটায় তিনি

নিজে রয়েছেন. এ-কথা জানার পর তোমার অভিযোগ শুনে হো-হো করে হাসবে ওরা।'

চুপ করে আছে আনিস।

মুচকি একটু হাসল রানা। 'তাছাড়া,' বলল ও, 'হাজার হোক, মি. নাফাজ তোমার শ্বশুর হতে যাচ্ছেন—কোন প্রমাণ না পেয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে যাওয়াটা কি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না? তারচেয়ে, এসো, আগে কিছু প্রমাণ যোগাড় করি। যদি দেখি সত্যিই অপরাধ করেছেন, তখন নাহয় একহাত নেয়া যাবে ভদ্রলোককে। সবচেয়ে কাছের সরকারী অস্ত্রাগারটা এখান থেকে কত দূরে জানো?'

'জানি। কমান্ড পোস্ট থেকে মাইলখানেক দূরে।'

'চলো তাহলে, ওখানেই যেতে হবে।'

'আচ্ছা,' অন্ধকারে রানাকে অনুসরণ করছে আনিস, 'অস্ত্রাগারগুলো কমান্ড পোস্টের ভিতর তৈরি করলেই তো পারে ওরা।'

'ওগুলোয় আগুন লাগার ভয় থাকে। লাগেও। লোক গিজ গিজ করছে এমন একটা ব্যারাকে বসে আছ, এই সময় বিস্ফোরণ শুরু হলে কেমন লাগবে তোমার?'

অস্ত্রাগারের মেইন গেট।

গাড়ি থেকে এক গোছা চাবির একটা রিং বের করে নিয়ে এসেছে আনিস। গোছাটায় অসংখ্য কিম্ভূতকিমাকার চাবি রয়েছে, বদ-মেজাজী কোন পুলিস অফিসার এটা যদি তার হাতে দেখে, ওয়ারেন্ট ছাড়াই গ্রেফতার করবে তাকে। কী-হোলের দিকে ঝুঁকে রয়েছে সে, প্রায় দশ মিনিট ধরে চেষ্টা করছে তালাটা খোলার। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল, চোখে মুখে হতাশার ছাপ। 'হলো না, মাসুদ ভাই। ভাবতাম এমন কোন তালা নেই যেটা এই সেটের চাবি দিয়ে খোলা যাবে না। কিন্তু এখন দেখছি সেটটা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।'

'লোডিং ডোরের তালাগুলোও এই জাতের হবে বলে মনে হয়,' বলল রানা। 'নির্দিষ্ট চাবি ছাড়া ওগুলো খুলে পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। চাবির গোছাটা নিশ্চয়ই আশপাশে কোথাও ফেলে যায়নি ওরা। একটা জিনিস লক্ষ করেছ?'

'কি?'

'এতক্ষণ ধরে কথা বলছি আমরা, তুমি কী-হোলে চাবি ঢোকাবার চেষ্টা করছ—অথচ ভেতরে গার্ডদের টনক নড়ছে না।'

'হাত-পা বাঁধা অবস্থায় একটা ঘরে আটকা পড়ে আছে সবাই?'

'তা ছাড়া আর কি হতে পারে?' বলল রানা। 'তোমার গাড়িতে হ্যাক-স নেই, না?' লোহার বার দিয়ে ঘেরা জানালাগুলোর একটার উপর টর্চের আলো ফেলল ও।

'নেই,' বলল আনিস। 'এখন থেকে রাখব।'

জানালার কাঁচে নিজের প্রতিচ্ছবি ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছে না রানা। শোল্ডার হোলস্টার থেকে রিভলভারটা বের করল ও। সেটা উল্টো করে ধরে গ্লাসের উপর ভারী বাঁট দিয়ে কয়েকটা ঘা মারল। কাজ হচ্ছে না। লোহার

বারগুলোর কাছ থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে কাঁচটা, বাঁটের ঘাগুলো তেমন জোরের সাথে লাগছে না।

'কাঁচ ভেঙে কিছু লাভ হবে, মাসুদ ভাই?' বলল আনিস। 'ভেতরে তো ঢোকা যাবে না।'

'ঢুকতে না পারি, দেখতে আর শুনতে পাব,' বলল রানা। 'ভাবছি এটা সাধারণ প্লেট গ্লাস, নাকি বুলেট-প্রুফ? বুলেট-প্রুফ হলে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে আসবে বুলেট। নিচু হও।'

দু'জনেই হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল ওরা, নিচে থেকে জানালার কাঁচে গুলি করল রানা। চারদিকে অসংখ্য চিড় ধরিয়ে, মাঝখানটা ফুটো করে ভেতরে ঢুকে গেছে বুলেট। গাড়ি থেকে একটা হাতুড়ি নিয়ে এসে চারদিকে বাড়ি মেরে গর্তটাকে বড় করছে আনিস। ডায়ামিটারে এক ফুটের মত হলো সেটা। ভেতরে টর্চের আলো ফেলল রানা। সারি সারি ফাইলিং কেবিনেট দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা একটা অফিস-কামরা, পেছনে একটা মাত্র দরজা, খোলা রয়েছে। গর্তের যত কাছে সম্ভব কান নিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করছে রানা, প্রায় সাথে সাথে গোঙানীর আওয়াজ, সেই সাথে দরজার গায়ে ধাক্কা মারার শব্দ অস্পষ্টভাবে কানে ঢুকল। এক পাশে সরে এসে মাথা ঝাঁকাল রানা, দ্রুত এগিয়ে এসে গর্তের কাছে কান পাতল আনিস।

পাঁচ সেকেন্ড পর আনিস বলল, 'কিছু একটা করা দরকার ওদের জন্যে।'

আর্মি কমান্ড পোস্ট ছাড়িয়ে এক মাইল আসার পর রাস্তার ধারে একটা টেলিফোন বুদ দেখল ওরা। আনিস গাড়ি থামাল, নেমে গেল রানা। আর্মি পোস্টে ফোন করল ও। নিজের পরিচয় না দিয়ে জানাল, এক সেট ডুপ্লিকেট চাবি নিয়ে এখুনি লোক পাঠানো দরকার অস্ত্রাগারে, সাহায্য দরকার গার্ডদের।

'এয়ারফোর্সকে ডেকে এখন আর কোন লাভ নেই, তাই না, মাসুদ ভাই?' রানা গাড়িতে ফিরে এলে জানতে চাইল আনিস।

'অনেক দেরি হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রীয় জলসীমা ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে গেছে ওরা।'

মিসিসিপিতে ন্যাভাল আর্মারী ভেঙে ভেতরে ঢুকতে কোন অসুবিধেই হলো না প্যাটনের। কাজটা হাস্যকর রকম সহজ প্রমাণিত হলো। সাথে মাত্র ছয়জন লোক নিয়ে এসেছে সে। অবশ্য আরও ষোলোজন লোককে রিজার্ভ রেখেছে আর্মারী থেকে মাত্র ত্রিশ গজ দূরে। একশো বিশ ফিট লম্বা একটা জাহাজে অপেক্ষা করছে ওরা। ডকসাইডে বেঁধে রাখা এই জাহাজটার নাম রোমিও। এর আরোহীরা ইতিমধ্যেই ডকের তিনজন নাইট গার্ডকে নিরস্ত্র করেছে।

দু'জনমাত্র অবসরপ্রাপ্ত ন্যাভাল পেটি অফিসার পাহারা দেয় আর্মারীটাকে। এরা লোক হিসেবে ভাল, কিন্তু পাহারা দেবার কাজটাকে গুরুত্বের সাথে নেয়নি। এদের ধারণা পাগল ছাড়া আর কে ন্যাভাল গান আর ডেপথ-চার্জ চুরি করতে আসবে? তাই পালা বদলের সময় এখানে এসে পৌঁছেই এদের প্রথম কাজ হয় ভাল করে বিছানা পাতা, যাতে ঘুমটা নির্বিঘ্নে হয়।

দরজা খুলে সদলবলে প্যাটন যখন ভেতরে ঢুকছে, প্রহরীরা তখন গভীর ঘুমের

মধ্যে নাক ডাকছে। তবু সাবধানের মার নেই ভেবে ওদেরকে বেঁধে ফেলা হলো, মুখে গুঁজে দেয়া হলো কাপড়। ডেপথ-চার্জ, হালকা অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান আর প্রচুর শেল দুটো কর্ক-লিফট ট্রাকে তুলে ডকসাইডে নিয়ে এল ওরা। অসংখ্য ক্রেনের একটার সাহায্যে চুরি করা কার্গো নামানো হলো রোমিওর হোল্ডে। কাস্টমসের ক্লিয়ারেন্স নামকাওয়াস্তে একটা আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। অফিসাররা রোমিওকে এত ঘন ঘন যাওয়া আসা করতে দেখে যে আজকাল তারা কাগজপত্র ইত্যাদি দেখার ঝামেলা পোহাতে যায় না, এমনিতেই ছাড়পত্র দিয়ে দেয়। তাছাড়া, পৃথিবীর অন্যতম একজন ধনী লোকের সমুদ্রগামী জাহাজে করে কি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা পরীক্ষা করার ধৃষ্টতা এদের কারও নেই।

রোমিও নাফাজ মোহাম্মদের একটা সিসমোলজিক্যাল সার্ভে জাহাজ।

রাশিয়ার তৈরি একটা সাবমেরিন। হাভানা থেকে খুব বেশি দূরে নয় এর ঘাঁটি। রাত ভোর হবার আগেই আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এল সেটা খোলা সাগরে। হঠাৎ অত্যন্ত তাড়াহুড়োর সাথে তীর থেকে তুলে নিয়ে আসা হয়েছে ক্রুদেরকে। তাদেরকে বলা হয়েছে কিউবার খুদে ফ্লিটের সতর্কতা পরীক্ষা করার জন্যে রচিত একটা প্রোগ্রামের অধীনে এটা একটা বিশেষ মহড়া। সাবমেরিনের একজন লোকও কথাটা বিশ্বাস করেনি।

চুপ করে বসে নেই হেকটর।

বিস্ফোরক যোগাড় করার জন্যে অন্য কারও তালায় চাবি ঢোকাতে হয়নি তাকে। জ্বলন্ত গাশারে ছিপি পরাবার কাজে দুনিয়ার সেরা এক্সপার্ট সে, বিচিত্র ধরনের অফুরন্ত বিস্ফোরক তার নিজের কাছেই মউজুদ রয়েছে। বাছাই করা কিছু বিস্ফোরক হিউসটন থেকে ট্রাকে তুলে পাঠিয়ে দিল সে। দক্ষিণের অয়েল রিগ সেন্টার বলতে এই জায়গাটাকেই বোঝায়, তাছাড়া কাছাকাছি নাগালের মধ্যে রয়েছে এমন একটা এয়ারপোর্ট যাকে ছুঁয়ে গেছে আন্তর্জাতিক এয়ার রুট আর কানেকশনগুলো। দুনিয়ার যে-কোন জায়গা থেকে যে-কোন মুহূর্তে তার সাহায্য চাওয়া হতে পারে, তাই এই হিউসটনেই বাস করে হেকটর।

বিস্ফোরক নিয়ে গলভেস্টনের দিকে ছুটে আসছে ট্রাকটা।

ওদিকে, আরেকটা সিসমোলজিক্যাল জাহাজ দ্রুত এগিয়ে আসছে গলভেস্টনের দিকে। আসলে এটা একটা কোস্টগার্ড কাটার, একে রূপান্তরিত করা হয়েছে সার্ভে জাহাজে। নাম সানলাইট। লেক তাহোর গোপন বৈঠকে গলভেস্টন এলাকার কোম্পানীগুলোর প্রতিনিধিত্ব করেছে যে লোকটা সেই এটা যোগাড় করে দিয়েছে হেকটরকে। কাটার সানলাইটের প্রায় স্থায়ী ঘাঁটি হলো ফ্রি-পোর্ট, হাত-বদলটা অনায়াসে সেখানেই হতে পারত, কিন্তু তাতে উদ্দেশ্য পূরণ হত না হেকটরের।

সাউল শিপিং লাইনসের কাছ থেকে চার্টার করা তিনটে ট্যাঙ্কার সাগর কন্যা আর গালফ পোর্টগুলোর মধ্যে নিয়মিত যাওয়া আসা করছে। ইংরেজী অক্ষর R সিরিজের ট্যাঙ্কার সবগুলো, তার মানে তিনটি ট্যাঙ্কারেরই নামের প্রথম অক্ষর R.

যেমন—রোবট, রকেট, রঁদেভু।
ট্যাঙ্কার রোবট এই মুহূর্তে পোর্ট গলভেস্টনে তেল খালাস করছে। কাটার সানলাইটকে এই রোবটের পাশে কিছুক্ষণের জন্যে দেখতে চায় হেকটর।
গাড়ি-পথ ধরে হেকটর আর পানি-পথ ধরে সানলাইট প্রায় একই সময় এসে পৌছুল গলভেস্টনে। হেকটরের নির্দেশ আগেই পেয়েছে স্কিপার ময়নিহান, ভদ্রতাসূচক দূরত্ব বজায় রেখে ট্যাঙ্কার রোবটের পাশেই সানলাইটকে ভিড়াল সে।
কাটার সানলাইটের স্থায়ী ক্যাপ্টেন ময়নিহান নয়, আরেক জন। সেই লোকটা নগদ পাঁচ হাজার ডলার চোখে দেখে এমনই অভিভূত হয়ে পড়ল যে সাথে সাথে অসুস্থতার ভান করে বিছানা নিতে রাজী হয়ে গেল। কয়েক দিন এখন অসুস্থই থাকবে সে। সানলাইটের স্কিপার পদের জন্যে হেকটর তার বন্ধু ময়নিহানের নাম সুপারিশ করে।
সানলাইটকে ভিড়তে দেখল হেকটর, কিন্তু সাথে সাথে তাতে চড়ল না। চীফ কাস্টমস অফিসারের সাথে গল্প করছে সে। অফিসার অলস, নিরুৎসুক দৃষ্টিতে লক্ষ করছে বিস্ফোরকের বাক্সগুলো তোলা হচ্ছে সানলাইটে। পরস্পরকে ওরা অনেক বছর ধরে চেনে। সম্পর্কটা প্রায় বন্ধুর মত হয়ে উঠেছে। 'দেখো,' হেকটরকে সাবধান করে দিয়ে বলল সে, 'ক্রুরা যেন দিয়াশলাই জ্বালার সময় সতর্ক থাকে।'
'দিয়াশলাই? দিয়াশলাই পাবে কোথায় ওরা? কারও কাছে যদি পাওয়া যায়, আমার কড়া নির্দেশ আছে, দড়ি বেঁধে সাগরে নামিয়ে দশ মিনিট পানিতে চোবানো হবে। চাকরি তো যাবেই, জরিমানাও হবে। তারপর বিশেষ নজর রাখা হবে, ব্যাটা আর কোথাও যাতে চাকরি না পায়।'
এমন ভাবে হাসল অফিসার যেন হেকটরের কড়াকড়ির ধরন জানতে পেরে প্রভাবিত হয়েছে সে। কথাচ্ছলে এটা-সেটা জানতে চাইছে হেকটর, ভাবটা সময় কাটাবার জন্যে গল্প করছে। রোবট এই মাত্র তার তেল খালাস শেষ করেছে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আবার নোঙর তুলবে, তথ্যটা অফিসারের কাছ থেকে জেনে নিল সে। তারপর বিদায় নিল।
সানলাইটে চড়ে স্কিপার ময়নিহানের অভ্যর্থনার উত্তরে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল হেকটর। হাঁটার গতি মন্থর না করে সোজা গিয়ে ঢুকল ক্রুদের একটা কোয়ার্টারে। অন্যান্যদের সাথে বসে আছে স্কুবা স্যুট পরা তিনজন ডাইভার। দ্রুত, সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দিল হেকটর ওদেরকে। জাহাজের সুপারস্ট্রাকচারের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে অন্ধকার ডেকের শেষ প্রান্তে চলে এল ডাইভাররা। রশির সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে নেমে গেল পানিতে। জাহাজ থেকে মেটালিক ক্ল্যাম্প পরানো ছয়টা রেডিও-ডিটোনেটেড ম্যাগনেটিক মাইন নামিয়ে দেয়া হলো নিচে। এগুলোর সাথে বাতাস ভরা এয়ারব্যাগ রয়েছে, পানির নিচে দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না ডাইভারদের।
ভোর রাতের আবছা অন্ধকার চারদিকে। বন্দরের উজ্জ্বল আলো সাগরের গায়ে সরাসরি পড়েনি কোথাও। জাহাজগুলোর ছায়ায় থেকে পানির ওপর দিয়ে সাঁতার কেটে গেলেও কারও চোখে পড়ার ভয় ছিল না, কিন্তু কোনরকম ঝুঁকি নিতে রাজী নয় হেকটর—নিচ দিয়েই চলেছে ডাইভাররা।

রোবটের খোলের নিচে পৌঁছুল ডাইভাররা। মাইনগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করে ট্যাঙ্কারের পেছনের অর্ধেক অংশে আটকে দেয়া হলো। মাঝখানে ত্রিশ ফিট ব্যবধান, দশ ফিট পানির নিচে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাজ সেরে ফিরে এল ওরা। আরও পাঁচ মিনিট পর সাগরের দিকে মুখ করে বন্দর ত্যাগ করল সানলাইট।

সানলাইটের ব্রিজে বসে আছে হেকটর। চেহারাটা থমথম করছে, চোখের দৃষ্টি আটকে রয়েছে সুইচটার দিকে। স্ক্রু খুলে এখুনি সুইচটা অন করতে পারে সে। কিন্তু তা করছে না। লোকটা নিষ্ঠুর, কিন্তু তাই বলে বুকের ভেতর দয়ামায়া একেবারেই নেই বললে মিথ্যা কথা বলা হবে। গলভেস্টন জায়গাটাকে ভাল লাগে তার, ওখানে যারা বসবাস করে তারা নিরীহ ভাল মানুষ—এদেরকে সে কেন খুন করতে যাবে? তাছাড়া, বিস্ফোরণের ফলে বন্দরের ক্ষতি হলে সবার সাথে তারও অসুবিধে হবে ভবিষ্যতে। ঝুঁকিটা সেজন্যেই নিতে হচ্ছে তাকে।

ঝুঁকিটা কোথায়, পরিষ্কার জানে হেকটর। নোঙর করা জাহাজ উড়িয়ে দিতে লিমপেট মাইনের তুলনা হয় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অ্যালেকজান্দ্রিয়ায় ইটালিয়ান ডাইভাররা একের পর এক রয়্যাল নেভীর জাহাজ উড়িয়ে দিয়ে তা প্রমাণ করেছে। কিন্তু ম্যাক্সিমাম স্পীডে ছুটন্ত একটা জাহাজের খোলে আটকানো লিমপেটের ভাগ্যে কি ঘটবে তা আগে থেকে বলা মুশকিল। চলমান কোন জাহাজ লিমপেট মাইনের বিস্ফোরণে উড়ে গেছে, এ-ধরনের ঘটনার বাস্তব কোন প্রমাণ নেই। একটা ছুটন্ত জাহাজের পানির চাপে কঠিন ম্যাগনেটিক বাঁধনও আলগা হয়ে যেতে পারে, খুলে পড়ে যেতে পারে মাইন।

কি হয় না হয় এই রকম একটা অনিশ্চয়তায় ভুগছে হেকটর, কিন্তু চেহারায় তার কোন ছাপ নেই। সানলাইটের আফটার হেলিপ্যাড থেকে একটা 'কপ্টার নিয়ে আকাশে ওঠার কথা ভাবছে সে। এ-ধরনের সার্ভে জাহাজে হেলিকপ্টার রাখা হয় ওপর থেকে এক্সপ্লোসিভ ফেলে সাগরতলার বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া সিসমোলজিক্যাল কমপিউটরে রেজিস্টার করার জন্যে।

ঝোঁকটা দমন করল হেকটর। রোবট বিস্ফোরিত হবার সময় কাছেপিঠে সানলাইটের 'কপ্টারকে কেউ দেখুক তা সে চায় না।

গলভেস্টন থেকে আট মাইল দূরে সরে এসে ধৈর্য হারিয়ে ফেলল হেকটর। স্ক্রু-খুলে সুইচটা মুক্ত করল সে। তারপর চাপ দিল।

কাজ হলো কিনা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। হেকটরের ভয় হলো, তারা বোধহয় রেডিও রেঞ্জের বাইরে চলে এসেছে। কিন্তু গলভেস্টনের লোকজন যারা বন্দর এলাকায় রয়েছে, প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে ছলকে উঠল তাদের সবার বুকের রক্ত। প্রায় একই সাথে ছয়টা বিস্ফোরণ ঘটেছে। রোবটের পেছন দিকটা ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেছে। ফাটল ধরেছে সামনের দিকে, হাজার হাজার টন পানি ঢুকছে ভেতরে। বিশ সেকেন্ডের মধ্যে কাত হয়ে গেল রোবট। আরও বিশ সেকেন্ড পর সানলাইটের লোকজনদের সজাগ কানে দূর থেকে ভেসে এল বিস্ফোরণের গুরুগম্ভীর আওয়াজ।

অটোমেটিক পাইলটে চলছে সানলাইট। ময়নিহান ব্রিজে রয়েছে হেকটরের সাথে। গম্ভীর মুখ ফিরিয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। গাম্ভীর্যের মধ্যেও ওদের

চেহারায় সন্তুষ্টির ভাব ফুটে উঠেছে। সময় বুঝে মুখ খোলা একটা বোতল হাজির করল ময়নিহান। গ্লাস ভর্তি শ্যাম্পেনে দুটো চুমুক দিল হেকটর, শুধু ঠোঁট জোড়া নড়ল তার। গ্লাসটা নামিয়ে রাখছে সে, ওদিকে এই সময় আগুন ধরে গেল রোবটে

পেট্রল ট্যাঙ্কগুলো খালি ছিল রোবটের, কিন্তু তার এঞ্জিনের ডিজেল ফুয়েল ট্যাঙ্কগুলো কানায় কানায় ছিল ভরা। সাধারণ পরিস্থিতিতে ডিজেলে আগুন লাগলে তা বিস্ফোরিত হয় না, কিন্তু প্রচণ্ড তীব্রতার সাথে জ্বলতে শুরু করে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ধোঁয়ায় ঢাকা আগুনের শিখা প্রায় দুশো ফিট ওপরে উঠে গেল প্রতি সেকেণ্ডে প্রচণ্ড লাফ দিয়ে দিয়ে আরও ওপরে উঠে যাচ্ছে শিখার মাথাগুলো গোটা শহর রক্তের মত লাল আভায় আলোকিত হয়ে উঠেছে। এমন অভূতপূর্ব দৃশ্য আর বোধহয় দেখার দুর্ভাগ্য হবে না গলভেস্টনবাসীদের। বন্দর থেকে আরও ক'মাইল দূরে সরে এসেছে সানলাইট, কিন্তু এর আরোহীরাও রোমহর্ষক অগ্নিকাণ্ড দেখতে পাচ্ছে। তারপর, ধূমকেতুর মত হঠাৎ যেমন মাথা তুলেছিল তেমনি হঠাৎ করেই নিভে গেল আগুনটা। ডুবে গেছে রোবট। পানিতে ভাসমান তেল পুড়ছে, তাছাড়া সেটার আর কোন চিহ্ন নেই কোথাও।

কাজ চালু রাখার জন্যে নতুন আরেকটা ট্যাঙ্কার যোগাড় করতে হবে নাফাজ মোহাম্মদকে। এই মুহূর্তে তাঁর জন্যে সেটা একটা সমস্যাই বটে।

এদিকের সাগরে বিশাল আকারের সুপার-ট্যাঙ্কারের ছড়াছড়ি, টেলিফোন তোলার পরিশ্রমটুকু স্বীকার করলেই যে ক'টা ইচ্ছে ভাড়া করা বা কেনা যায়। কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টনের ডি-ডব্লিউ ট্যাঙ্কারের সংখ্যা সারা দুনিয়ায় দিনে দিনে কমে আসছে। তার কারণ, বড় বড় শিপইয়ার্ড কোম্পানী এগুলো তৈরি করা বেশ দীর্ঘ একটা সময় পর্যন্ত বন্ধ রেখেছিল। বর্তমানে জরুরী ভিত্তিতে আবার এই আকারের এবং এর চেয়ে ছোট আকারের কীল তৈরি হচ্ছে বটে, কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ জাহাজের চেহারা নিয়ে নামতে আরও দু'একটা বছর লাগবে তাদের।

সুয়েজ খাল বন্ধ ছিল বলেই এত ছোট আকারের ট্যাঙ্কারের চাহিদা কমে গিয়েছিল। সুপার-ট্যাঙ্কারের সৃষ্ট প্রচণ্ড ঢেউ সহ্য করার শক্তি সুয়েজ খালের নেই, তাই নতুন করে খালটা খুলে দেয়া হলেও ইউরোপ থেকে অ্যারাবিয়ান গালফে যাতায়াত করার জন্যে সুপার-ট্যাঙ্কারগুলোকে সেই আগের মতই কেপ অভ গুড হোপ ঘুরে যেতে হচ্ছে। এতে কয়েক গুণ বেশি খরচ পড়ে। কোটি কোটি ডলার গচ্চা দেয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্যে সবাই এখন ছোট ট্যাঙ্কার পেতে চাইছে। কিন্তু চতুর গ্রীক জাহাজ ব্যবসায়ীরা সুপার-ট্যাঙ্কারের ব্যবসা পড়তে দিতে চায় না, তারা আরও কিছুদিন ছোট ট্যাঙ্কার তৈরি করা থেকে বিরত থাকবে। তার মানে, পঞ্চাশ হাজার টনের ডি-ডব্লিউ ট্যাঙ্কার পেতে হলে নাফাজ মোহাম্মদকে আবার সেই সাউল শিপিং লাইনসের কাছেই ধরনা দিতে হবে। কারণ এত ছোট আকারের ট্যাঙ্কার বেশির ভাগই এখন এই কোম্পানীর কাছে রয়েছে।

ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে আকাশে।

ছয়

ভোর। সাগর কন্যা।

রকেট। নাফাজ অয়েল কোম্পানীর চার্টার করা আরেকটা পঞ্চাশ হাজার টনের ট্যাঙ্কার। তিনশো গজ দূরে ভাসমান সাগর কন্যার বিশাল তেকোনা অয়েল ট্যাঙ্ক থেকে তেল ভরা প্রায় শেষ করে এনেছে রকেট। ঠিক এই সময় উত্তর-পুব দিগন্তরেখা থেকে উঠে এল দুটো হেলিকপ্টার। দুটোই খুব বড় Sikorsky মেশিন: ভিয়েতনাম যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেও অক্ষত দেহে ফিরে আসতে পেরেছে। সামরিক যান কেনার আগ্রহ সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে নেই বললেই চলে, কিন্তু এগুলো সংগ্রহ করা বিশেষ একটা শখ নাফাজ মোহাম্মদের, নিলামের সময় তিনি নিজে উপস্থিত থেকে এগুলো কিনেছেন।

প্রথম 'কপ্টার থেকে হেলিপ্যাডে নামছেন নাফাজ মোহাম্মদ। তার পেছনে দেখা যাচ্ছে জিউসেপ বারজেনকে। এরপর এক এক করে বেরিয়ে এল বিশজন লোক। এই বিশজনের কাছে পরিচয়পত্র আর সার্টিফিকেট আছে, সেগুলোয় একবার চোখ বুলালেই জানা যাবে এরা প্রত্যেকেই কোন না কোন ধরনের তেল বিশেষজ্ঞ। আসলে তেলের একটা ব্যারেল দেখতে কেমন তাও বোধহয় কেউ জানে না এরা। জানে শুধু খুন করতে আর হতে। এতদিন করেই এসেছে, হবার দুর্ভাগ্য এখনও কাউকে ছুঁতে পারেনি। ছুঁতে না পারার কারণ হলো যার যার ক্ষেত্রে এরা প্রত্যেকে রীতিমত দক্ষ, বিশেষজ্ঞও বলা যেতে পারে। এদের মধ্যে ডাইভার রয়েছে, তারা পানির নিচে ডুব দিয়ে যে-কোন ধ্বংসাত্মক কাজ সারতে পারে। রয়েছে বিস্ফোরক নাড়াচাড়া করার জন্যে ওস্তাদ লোক। নানা জাতের ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র অব্যর্থভাবে ব্যবহার করতে পারে এমন লোকও রয়েছে অনেক।

প্রথমটা আবার আকাশে উঠে যাবার পর দ্বিতীয় 'কপ্টারটা নামল সাগর কন্যার হেলিপ্যাডে। পাইলট আর কো-পাইলট ছাড়া এতে রয়েছে ফ্লোরিডা অস্ত্রাগারের যুদ্ধাস্ত্র। লুটের খবর এখনও ছাপা হয়নি খবরের কাগজে।

অয়েল রিগের ক্রু আর টেকনিশিয়ানরা নিজেদের কাজে এত বেশি ব্যস্ত যে যোদ্ধা আর যুদ্ধাস্ত্র দেখেও চাঞ্চল্য প্রকাশ করল না কেউ। সাগর কন্যার বিপদ সম্পর্কে আগেই অবহিত করা হয়েছে তাদেরকে, এবং নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে বলেও আশ্বাস দেয়া হয়েছে। তবুও সবাইকে আরেকবার নিজে ডাকলেন নাফাজ মোহাম্মদ। ছোট্ট একটা ভাষণ দিলেন তিনি। বিপদের কথা বললেন, প্রতিরোধ ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করলেন, সবশেষে গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজনের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

ক্রু আর টেকনিশিয়ানরা গোপনীয়তা রক্ষা করবে, এ ব্যাপারে অন্তত সাগর কন্যার কমান্ডার লিল হাম্মামের মনে কোন সন্দেহ নেই। এদেরকে বাছাই করে চাকরিতে নিয়েছে সে-ই, কার কোথায় কি দুর্বলতা সব তার নখদর্পণে। তার

ক্রুদের মধ্যে প্রাক্তন কয়েদী রয়েছে, জেল-পলাতক রয়েছে। বড় ধরনের অপরাধ করেছে, কিন্তু পুলিসের চোখে ধরা পড়েনি, ক্রুদের মধ্যে এদের সংখ্যাই বেশি। বেছে বেছে এদেরকে চাকরিতে নেবার কারণ, এরা চাকরি ছেড়ে পালায় না। ক্রু যদি পালায়, নতুন লোক যোগাড় করা খুবই হাঙ্গামার ব্যাপার। কিন্তু বুদ্ধি খাটিয়ে এমন সব লোককে যোগাড় করেছে কমান্ডার লিল হাম্মাম যাদেরকে অন্য কোম্পানী বেশি টাকার লোভ দেখিয়ে ভাগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। ক্রুদের জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হলো নাফাজ মোহাম্মদের প্রাইভেট মোটেল, শিফটিং ডিউটির শেষে সেখানে তাদেরকে রেখে আসা হয়। মোটেলটা নাফাজ মোহাম্মদের, তাই পাগল নয় এমন কোন পুলিস অফিসার সেখানে নাক গলাতে যায় না কখনও।

যোদ্ধাদের থাকা আর যুদ্ধাস্ত্র রাখার জায়গা বের করতে কোন সমস্যায় পড়তে হলো না। প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত কোয়ার্টার রয়েছে সাগর কন্যায়। ক্রুদের জন্যে মেস রয়েছে দুটো। দুই নম্বরটা সব সময় খালিই পড়ে থাকে।

নাফাজ মোহাম্মদের জন্যে আলাদা একটা সিটিংরুম রয়েছে সাগর কন্যায়। ফোর্ট লডারডেলের বাড়ির মতই দামী আসবাবপত্র সাজানো এটা। কমান্ডার লিল হাম্মাম আর মাফিয়া সর্দার জিউসেপ বারজেনকে নিয়ে আলোচনা বৈঠকে বসেছেন তিনি।

হেকটর সম্পর্কে নিজের ধারণা ব্যাখ্যা করে নাফাজ মোহাম্মদ ওদেরকে জানালেন, তার আক্রমণ যেদিক থেকেই আসুক, সে-আক্রমণের প্রচণ্ডতা হবে ভয়াবহ, তাতে অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুরতার পরিচয় অবশ্যই থাকবে।

কিন্তু আক্রমণটা আসবে কোন্ দিক থেকে? এ-ব্যাপারে তিনজনের একজনও পরিষ্কার কিছু অনুমান করতে পারছে না।

যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে কয়েকটা বিষয়ে একমত হলেন নাফাজ মোহাম্মদ।

তেল একবার তীরে খালাস করা হয়ে গেলে সে-ব্যাপারে আর কিছু করার নেই হেকটরের।

তেল ভর্তি কোন ট্যাঙ্কার, অথবা সাগর কন্যার অনতিদূরে ভাসমান প্রকাণ্ড স্টোরেজ ট্যাঙ্ক ধ্বংস করার কথা কল্পনাও করতে পারবে না হেকটর। এ-ধরনের কিছু করলে দুটোর বেলাতেই সাগরে বিপুল পরিমাণে তেল ভাসবে, তা সম্ভবত এ পর্যন্ত সাগরে তেল ছড়িয়ে পড়ার যতগুলো বড় ঘটনা ঘটেছে তার সবগুলোকে ছাড়িয়ে যাবে। চমকে উঠবে দুনিয়া, টনক নড়বে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। ব্যাপক তদন্তের ফলে প্রকৃত রহস্য উদঘাটিত হতে বাধ্য। হেকটরকে দায়ী করা হলে নিজের সাথে বড় বড় তেল কোম্পানীগুলোকে জড়িয়ে নেবে সে—তা ওরা কেউ চাইতে পারে না। ব্যাপক আন্তর্জাতিক তদন্ত অবধারিত, একথা মনে রেখে এ ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজ করতে পারে না হেকটর।

রিগ আর ট্যাঙ্কারকে সংযুক্ত করে রেখেছে একটা ফ্লেক্সিবল অয়েল পাইপ, এটার ওপর হামলা চালাতে পারে হেকটর। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেয়া যাবে, আলোচনা করে একমত হলো তিনজনই। রোমিওকে নিয়ে প্যাটন এসে পৌঁছুলেই তাড়াহুড়ো করে কার্গো নামিয়ে ফেলা হবে। তারপর থেকে রোমিওকে রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে অবিরাম রিগ আর ট্যাঙ্কারের মাঝখানে

টহলের কাজে ব্যবহার করা হবে।

টেনশনিং অ্যাঙ্কর কেবল কন্ট্রোল করার জন্যে ছাড়াও সাগর কন্যায় আরও নানা ধরনের সেনসরী ডিভাইস রয়েছে। ডেরিকের মাথায় একটা রাডার স্ক্যানার সারাক্ষণ চালু রয়েছে, দানবাকৃতির তিনটে পায়ের প্রত্যেকটিতে, বিশ ফিট পানির নিচে সোনার ডিভাইস ফিট করা আছে। সাগর বা আকাশ পথে যে-কোন অনভিপ্রেত আগমন ধরা পড়বে রাডারে, আর ডুয়াল-পারপাস অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গানগুলো বসানো হয়ে গেলে সে-ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করার কিছু থাকবে না। পানির নিচ দিয়ে আক্রমণ আসার সম্ভাবনা খুবই কম, তবুও যদি আসেই সোনার ডিভাইস আক্রমণের উৎস জানিয়ে দিতে পারবে। তখন রোমিও থেকে সুবিধেমত জায়গায় ডেপথ-চার্জ ফেলে সমস্যার সমাধান করা যাবে।

কিন্তু নাফাজ মোহাম্মদের জানার কথা নয়, ঠিক সেই সময় সানলাইটের সাথে যোগ দেবার জন্যে আরেকটা জাহাজ তীরবেগে ছুটে যাচ্ছে। এই ডিজাইনের জাহাজগুলো 'পুল-পুশ' নামে পরিচিত। সামনের দিকের খোলের নিচে একটা টিউব আছে এর, সেটা দিয়ে পানি ঢোকে ভেতরে, প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে সেই পানি বিদ্যুৎগতিতে বের করে দেয়া হয় পেছনের দিক দিয়ে। এর কোন প্রপেলার নেই, তীরের কাছাকাছি বা আগাছা ভর্তি পানিতে ব্যবহার করার জন্যে তৈরি করা হয়েছে, যেখানে প্রপেলার অকেজো হয়ে যাবার আশঙ্কা ষোলো আনা। এই জাহাজটির নাম ইউরেনেস, আর সব জাহাজের সাথে এর একমাত্র পার্থক্য হলো এতে রয়েছে লিড অ্যাসিড ব্যাটারি, এবং বিদ্যুতের সাহায্যে চলতে পারে। সোনার ডিভাইস কোন জাহাজের এঞ্জিন আর প্রপেলারের স্পন্দনই শুধু ধরতে পারে তাই নয়, নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করতে পারে উৎস কেন্দ্র—কিন্তু একটা ইলেট্রিক পুল-পুশের বিরুদ্ধে সেটা একেবারে অসহায়, কিছুই করার নেই তার।

সাগর কন্যার ওপর সরাসরি আক্রমণ আসার সম্ভাবনা আলোচনা করছেন নাফাজ মোহাম্মদ। তেমন সম্ভাবনা নেই, এ-ব্যাপারে তাঁর সাথে একমত হলো কমান্ডার লিল হাম্মাম আর জিউসেপ বারজেন।

তিনটে কারণে সরাসরি আক্রমণ করে সাগর কন্যাকে ধ্বংস করা সম্ভব নয়। ফুটবল মাঠের মত বিশাল আয়তন, পানির ওপর ভেসে থাকার অসাধারণ ক্ষমতা, এবং পাটাতন জুড়ে অসংখ্য উঁচু-নিচু স্ট্রাকচার। একান্তই যদি প্রতিজ্ঞা করে থাকে হেকটর, একে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে হলে অ্যাটম বোমার চেয়ে কম কিছু দিয়ে সম্ভব নয়। প্রচলিত কোন অস্ত্রের সাহায্যে এর ধ্বংস সাধন প্রায় অসম্ভব।

আক্রমণ যদি হয়, সেটা সাগর কন্যার বাছাই করা কোন অংশে হবে। ড্রিলিং ডেরিক সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হতে পারে হামলার, কিন্তু চোখে ধরা না দিয়ে কিভাবে কাছে আসবে হেকটর তা ভেবে পাচ্ছেন না নাফাজ মোহাম্মদ। তবে একটা ব্যাপারে তাঁর মনে কোন সন্দেহ নেই, আক্রমণ যখন করা হবে, সাগর কন্যাকে লক্ষ্য করেই তা করা হবে।

নাফাজ মোহাম্মদের ধারণা যে কত ভুল তার আরও প্রমাণ পরবর্তী আধঘন্টায় পাওয়া গেল।

উত্তর দিগন্তরেখার কাছে হারিয়ে যাচ্ছে তেল ভর্তি রকেট, সিটিংরুমের বাইরে

বেরিয়ে এসে সেদিকে তাকিয়ে আছেন নাফাজ মোহাম্মদ। তিনি জানেন, ট্যাঙ্কার রোবট বিকেলের দিকে এসে ভিড়বে স্টোর-ট্যাঙ্কের পাশে। এই সময় ভগ্নদূতের চেহারা নিয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল কমান্ডার লিল হাম্মাম। মুখটা রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার। এইমাত্র একটা রেডিও মেসেজ এসেছে অফিসে, সেটা নাফাজ মোহাম্মদের দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

নিঃশব্দে মেসেজটা পড়লেন তিনি। রোবটের মৃত্যুসংবাদ। মুখের রঙ লালচে হয়ে উঠল তাঁর। ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালেন, হন হন করে এগোচ্ছেন রেডিও অফিসের দিকে। তাঁকে অনুসরণ করল কমান্ডার হাম্মাম।

ট্যাঙ্কার রঁদেভুর সাথে যোগাযোগ করল কমান্ডার। রঁদেভু এই মুহূর্তে অখ্যাত একটা লুইসিয়ানা বন্দরে তেল খালাস করছে। রোবটের দুর্ভাগ্য বর্ণনা করে কমান্ডার রঁদেভুর ক্যাপ্টেনকে সম্ভাব্য সবরকম বিপদের জন্যে তৈরি থাকতে বলল। ট্যাঙ্কার ছেড়ে কেউ যেন কোথাও না যায়, বন্দর ত্যাগ না করা পর্যন্ত সারাক্ষণ যেন সতর্ক নজর রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

গলভেস্টনের পুলিস চীফের সাথে স্বয়ং কথা বললেন নাফাজ মোহাম্মদ। নিজের পরিচয় ঘোষণা করে ট্যাঙ্কার-ডুবির আরও বিশদ বিবরণ দাবি করলেন তিনি। কিছুক্ষণের মধ্যে পাওয়া গেল বিশদ বিবরণ, পড়তে পড়তে রাগে গরম হয়ে উঠছে তাঁর শরীর। এরপর পুলিস চীফকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনাটা যখন ঘটে তখন হেকটর নামে কোন লোক বা এই নামের কোন লোকের একটা জাহাজ বন্দর এলাকায় ছিল কিনা? পুলিস চীফ কিছুক্ষণ সময় চাইল, বলল, এখুনি কাস্টমসকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিচ্ছে সে। দু'মিনিট পর নাফাজ মোহাম্মদকে জানানো হলো, হ্যাঁ, সানলাইট নামে একটা সার্ভে জাহাজে হেকটর নামে একজন লোক ছিল বটে। সানলাইট রোবটের ঠিক পেছনে এসে ভিড়েছিল। ওটার মালিক হেকটর কিনা জানা যায়নি। রোবট বিস্ফোরিত হবার আধ ঘণ্টা আগে বন্দর ত্যাগ করে সানলাইট।

গম্ভীর নির্দেশের সুরে নাফাজ মোহাম্মদ সানলাইটকে ধাওয়া করে আটক আর হেকটরকে গ্রেফতার করার পরামর্শ দিলেন। খানিক ইতস্তত করে পুলিস চীফ তাঁকে জানাল যুদ্ধাবস্থা ছাড়া গভীর সাগরে কোন জাহাজকে এভাবে আটক করার আইন নেই। আর, রোবট-ডুবির ব্যাপারে হেকটর দায়ী কিনা তার কোন প্রমাণ নেই, ভিত্তিহীন অভিযোগে গ্রেফতার করলে পরে গোলযোগ দেখা দেবে।

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকলেন নাফাজ মোহাম্মদ। তারপর জানতে চাইলেন, সানলাইটের মালিককে খুঁজে বের করা সম্ভব কিনা। সম্ভব, জানাল পুলিস চীফ, কিন্তু বেশ কিছু সময় দরকার। অনেকগুলো রেজিস্টার ঘেঁটে দেখতে হবে।

সেই মুহূর্তে পানির ওপর জেগে উঠল কিউবান সাবমেরিনটা। কী ওয়েস্ট এলাকা থেকে ফুল স্পীডে সরাসরি সাগর কন্যাকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে। প্রায় ওই একই সময়ে একটা মিসাইল সজ্জিত রাশিয়ান ডেস্ট্রয়ার হাভানা থেকে তার নোঙর তুলে বেরিয়ে এল খোলা সাগরে। গভীর সাগরে কোর্স বদল করল ডেস্ট্রয়ার, এখন সে কিউবান সাবমেরিনের পথ অনুসরণ করছে। এর খানিক পর ভেনিজুয়েলায় তার

নিজের আস্তানা থেকে বেরিয়ে এল আরেকটা ডেস্ট্রয়ার।

রোমিও। নাফাজ অয়েল কোম্পানীর সার্ভে জাহাজ। প্যাটার্নের নেতৃত্বে গন্তব্য স্থানের অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এসেছে।

ইউরেনাস। বিদ্যুৎ চালিত পুল-পুশ, এইমাত্র সানলাইটের কাছ থেকে সরে যেতে শুরু করেছে। সানলাইট স্থির হয়ে থেমে রয়েছে সাগরে।

এরই মধ্যে রঙ দিয়ে সানলাইট নামটা মুছে ফেলা হয়েছে জাহাজের গা থেকে। কার্ডবোর্ড স্টেনসিলের সাহায্যে নতুন রঙে নতুন নাম লেখা হচ্ছে সেই জায়গায়—সী-উইচ। অন্যান্য জাহাজের সাথে যোগাযোগ করার ইচ্ছে আছে হেকটরের। তারা রেডিওর সাহায্যে কাটার সানলাইটের গতিবিধি সম্পর্কে খোঁজ খবর দিতে পারে। ঝুঁকিটা তাই নিচ্ছে না হেকটর। সামনের দিক থেকে একটা হেলিকপ্টার স্টার্ট নেবার শব্দ ভেসে এল। আকাশে উঠে একটা চক্কর মারল সেটা, তারপর বাঁক নিয়ে দক্ষিণ-পুব দিকে ছুটে চলল। নাফাজ অয়েল কোম্পানীর চার্টার করা ট্যাঙ্কার রকেটের খোঁজে যাচ্ছে সে। রকেটের দেখা পেলে সাথে সাথে তার লোকেশন আর কোর্স রেডিওর সাহায্যে জানিয়ে দেবে সানলাইট (সী-উইচ)কে।

কয়েক মিনিট পর রওনা হলো সানলাইট (সী-উইচ)। ইতিমধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে হেলিকপ্টারটা। ওটা যেদিকে গেছে সেই কোর্সই অনুসরণ করছে সী-উইচ।

সাত

সাগর কন্যা। ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ছে সাগরে। লিভিংরুমে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন নাফাজ মোহাম্মদ। কমান্ডার লিল হাম্মাম আর জিউসেপ বারজেন পাশাপাশি বসে রয়েছে একটা সোফায়। এই সময় দরজায় নক করে ভেতরে ঢুকল রেডিও অপারেটর, হাতে একটা মেসেজ শীট। নাফাজ মোহাম্মদকে সেটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আপনার মেসেজ, স্যার। কিন্তু এক ধরনের কোড করা—কোড-বুকটা এনে দেব?'

'দরকার নেই,' মৃদু কণ্ঠে বললেন নাফাজ মোহাম্মদ। এই কোডটার আবিষ্কর্তা তিনি নিজেই।

অপারেটর চলে গেল। একটু সময় নিয়ে মেসেজটা ডি-কোড করছেন নাফাজ মোহাম্মদ। ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে তাঁর মুখের স্বাভাবিক রঙ।

নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে কমান্ডার হাম্মাম আর বারজেন।

বড় করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন নাফাজ মোহাম্মদ। কমান্ডারের দিকে তাকালেন তিনি। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর শান্তভাবে বললেন, 'আমার শত্রুকে দুটো দেশ তাদের নৌ-শক্তি দিয়ে সাহায্য করতে যাচ্ছে বলে মনে হয়। একটা দেশ এরই মধ্যে প্রস্তুতি নিয়েছে। ভেনিজুয়েলার ডেরা ছেড়ে রওনা হয়ে গেছে একটা ডেস্ট্রয়ার। কোর্স দেখে ধারণা করা যায় আমাদের দিকেই আসছে

সোজা।'

'গড! কোথাকার পানি কোথায় গড়াবে…!'

'এত দুঃসাহস হবে ওদের?' বারজেনকে থামিয়ে দিয়ে বলল কমান্ডার লিল হাম্মাম। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সে।

'স্বার্থ থাকলে পাগলকেও পাগলামি করতে উৎসাহ দেয় মানুষ,' ভরাট গলায় বললেন নাফাজ মোহাম্মদ।

'আরেকটা দেশ?' জানতে চাইল কমান্ডার লিল হাম্মাম।

'সোভিয়েট ইউনিয়ন,' বলে একটু হাসলেন নাফাজ মোহাম্মদ, কিন্তু ঠোঁট দুটো কেঁপে গেল তাঁর।

হতভম্ব দেখাচ্ছে কমান্ডার লিল হাম্মামকে। থমথম করছে জিউসেপ বারজেনের চেহারা।

টেবিল থেকে একটা টেলিফোন নোটবুক তুলে নিয়ে পাতা উল্টাচ্ছেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'ওয়াশিংটনের সাথে কথা বলতে হবে আমাকে।' ফোনের রিসিভার ধরার জন্যে হাত বাড়াচ্ছেন, এই সময় সেটা বেজে উঠল ঝন ঝন শব্দে। রিসিভারটা তুললেন তিনি, আরেক হাত দিয়ে একটা সুইচ টিপে ইন-কামিং কলের সাথে বাল্কহেড স্পীকারের যোগাযোগ কেটে দিলেন।

'নাফাজ।'

অস্পষ্ট যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল তাঁর কানে। 'আমাকে চিনতে পারছেন?'

'পারছি,' বললেন নাফাজ মোহাম্মদ। ঈগলটন কথা বলছে।

'আমি আমার কন্ট্যাক্ট চেক করেছি, স্যার। দুঃখের বিষয়, আমাদের সন্দেহ নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এক্স এবং ওয়াই, দু'জনেই ওকে ন্যাভাল সাপোর্ট দিতে রাজী আছে।'

'আমি জানি। খানিক আগে রওনা হয়েছে একজন—আমাদের দিকেই আসছে।'

'কোন্ জন?'

'দক্ষিণ। এয়ার ফোর্স সাপোর্ট দেবে কিনা, কিছু জানতে পেরেছ?'

'এখনও তো কিছু শুনছি না,' বলল ঈগলটন। 'কিন্তু এর সম্ভাবনা আমি উড়িয়ে দিই না, স্যার।'

'ভাল। আর কোন খবর থাকলে সাথে সাথে জানাবে আমাকে।'

'অবশ্যই। গুডবাই, স্যার।'

রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন নাফাজ মোহাম্মদ, কিন্তু পরমুহূর্তে আবার সেটা তুললেন তিনি। 'অপারেটর, ওয়াশিংটনের একটা নাম্বার চাই আমি।'

'এক মিনিট অপেক্ষা করবেন, প্লীজ, স্যার?'

'কেন?'

'আরেকটা কোড মেসেজ আসতে শুরু করেছে, স্যার।'

'ঠিক আছে,' অস্বাভাবিক শান্ত গলায় বললেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'যত তাড়াতাড়ি পারো নিয়ে এসো আমার কাছে।'

এখন আর গা এলিয়ে বসে থাকার সময় নেই, বুঝতে পারছেন তিনি। কাজে

নেমে গেছে হেকটর। ভয়াবহ প্রস্তুতি নিয়ে এগোচ্ছে সে। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে তাঁকে, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন বারবার। সাহায্যের জন্যে তাঁর দৌড়ের শেষ সীমা পর্যন্ত যেতে হবে তাঁকে।

ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রেখে চোখ বুজে তিন সেকেন্ড চিন্তা করলেন তিনি। তারপর চোখ মেলে হাত বাড়ালেন তাঁর সামনে রাখা ছোট একটা কনসোলের দিকে। বোতামে চাপ দিয়ে অপর হাতে তুলে নিলেন রিসিভারটা। 'পোস্টার?' পোসটার তাঁর সিনিয়র পাইলট।

'স্যার?'

'তোমার 'কপ্টার ফুয়েল নেয়া শেষ করেছে?'

'ইয়েস, স্যার।'

'ফোন ছেড়ে নোড়ো না,' বলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন তিনি।

'ওয়াশিংটনে আপনি নিজে যেতে চাইছেন, স্যার?' জানতে চাইল কমান্ডার হাম্মাম।

'পরিস্থিতি আমাকে হয়তো যেতে বাধ্য করবে। ফোনে সব ধরনের সাহায্য চাওয়া সম্ভব নয়।' কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'আমার যাওয়া না যাওয়া নির্ভর করছে পরবর্তী মেসেজটার ওপর।'

'আপনাকে যদি যেতেই হয়,' উদ্বেগ চেপে রেখে যথাসম্ভব শান্ত গলায় প্রশ্ন করল কমান্ডার, 'আপনার অবর্তমানে আমাদের করণীয় কি হবে, স্যার?'

'আজ বিকেলে এসে পৌঁছবে রোমিও। ওতে ডুয়াল-পারপাস অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান আছে। প্ল্যাটফর্মে বসাবে ওগুলো।'

'উত্তর, দক্ষিণ আর পুব দিকে—পশ্চিম দিকটা বাদ রেখে?'

'তুমি বা ভাল মনে করো।'

'নিজেদের অয়েল ট্যাঙ্ক ফুটো করার কোন ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না।'

'মাইনও থাকবে রোমিওতে,' বললেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'তিনটে স্তূপ, প্রতিটি একজোড়া পায়ের মাঝামাঝি দূরত্বে।'

'পানির নিচে বিস্ফোরণে পায়ের কোন ক্ষতি হবে না তো?'

'মনে করি না। হয় কি না হয়, বিস্ফোরণের পরে দেখা যাবে। প্রতি আধঘণ্টা পর পর রেডিও যোগাযোগ রাখবে রকেট আর রঁদেভুর সাথে। সারাক্ষণ লোক মোতায়েন রাখবে সোনার আর রাডারে। হেল, কমান্ডার, কি করতে হবে না হবে তা তুমি নিজেই বুঝে নেবে, আমি আর কি বলব!' খস খস করে একটা কাগজে কয়েকটা সংখ্যা লিখলেন তিনি। 'আমাকে যদি যেতেই হয়, এই নাম্বারে ওয়াশিংটনের সাথে যোগাযোগ করবে তুমি। ওদেরকে বলবে, আমি রওনা হয়ে গেছি। পাঁচ ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাব।'

'স্টেট ডিপার্টমেন্টের নাম্বার এটা, স্যার?'

'হ্যাঁ। বলবে, নিদেন পক্ষে আন্ডার সেক্রেটারি যেন অপেক্ষা করে আমার জন্যে ওখানে। তার সাথেও কথা বলবে তুমি। কৌশলে জানিয়ে দেবে আগামী নির্বাচনে খরচের জন্যে তাকে ভাবতে হবে না। এরপর আমার এয়ারক্রাফট পাইলট রনসনের সাথে যোগাযোগ করবে, ওয়াশিংটনের একটা ফাইল করা ফ্লাইট

প্ল্যান নিয়ে সে যেন আমার জন্যে অপেক্ষা করে।'

রেডিও অপারেটর নক করে ভেতরে ঢুকল. নাফাজ মোহাম্মদের হাতে একটা মেসেজ শীট ধরিয়ে দিয়ে দ্রুত আবার বেরিয়ে গেল সে।

মেসেজটা ডিকোড করে পড়ছেন নাফাজ মোহাম্মদ। তাঁর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে না কিছু। কাগজটা টেবিলে নামিয়ে রেখে হাত বাড়ালেন ফোনের দিকে। 'পোসটার, 'কপ্টার রেডি করো. আমি এখুনি আসছি।'

ধীরে ধীরে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন নাফাজ মোহাম্মদ। মুখ তুলে কমান্ডার হাম্মাম আর জিউসেপ বারজেনের দিকে তাকালেন। 'রাশিয়ার তৈরি একটা কিউবান সাবমেরিন হাভানা থেকে রওনা দিয়েছে, তাকে অনুসরণ করছে একটা রাশিয়ান গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ার। দুটোই এদিকে আসছে।'

'হুঁ,' গম্ভীরভাবে মাথা দুলিয়ে বলল কমান্ডার হাম্মাম, 'হয় স্টেট ডিপার্টমেন্ট না হয় সরাসরি পেন্টাগনে যেতে হবে আপনাকে, স্যার। গাইডেড মিসাইলের বিরুদ্ধে কিছুই করার নেই আমাদের।' চিন্তিতভাবে কানের পাশে জুলফির নিচেটা চুলকাচ্ছে সে। 'পাঁচটা জাহাজ ছুটে আসছে আমাদের দিকে—রোমিও, রঁদেভু আর নৌ-বাহিনীর তিনটে যুদ্ধ জাহাজ, এর মধ্যে আবার ডুবো জাহাজও রয়েছে।' কণ্ঠস্বর আর চেহারা থেকে আতঙ্ক লুকিয়ে রাখতে পারছে না সে।

কিন্তু কমান্ডার হাম্মাম জানে না, পাঁচটা নয়, সাতটা জাহাজ দ্রুত এগিয়ে আসছে সাগর কন্যার দিকে। বাকি দুটো ইউরেনাস আর সী-উইচ।

উঠে দাঁড়ালেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'তোমাদের হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছি সাগর কন্যাকে। চোখ খোলা রাখবে। আমার নির্দেশের অপেক্ষায় থেকো না। যা ভাল মনে হবে, করবে। আজ সন্ধ্যার দিকে কোন এক সময় ফিরে আসব আমি। যখনই সময় পাব রেডিও যোগাযোগ করব তোমার সাথে।'

ওয়াশিংটনে যাওয়া আসা করার জন্যে নিজের 'কপ্টার আর প্লেনে চারবার ওঠানামা করতে হবে নাফাজ মোহাম্মদকে। প্রথমে 'কপ্টারে চড়ে মেইনল্যান্ডে যাবেন তিনি, প্রাইভেট বোয়িংয়ে চেপে ওয়াশিংটন পৌছুবেন, তারপর ফিরে আসবেন ফ্লোরিডায়, সবশেষে 'কপ্টারে উঠে সাগর কন্যায় নামবেন। তিনি জানেন না, চার ভাগে ভাগ করা তাঁর এই সফরের প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যের শিকার হবেন তিনি, এবং সেজন্যে পরে নিজের বুদ্ধি এবং দূরদৃষ্টির অভাবকে দায়ী করা ছাড়া উপায় থাকল না।

হেকটরের নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে তাঁর মনে কোন ভুল ধারণা না থাকলেও, হেকটর কতটা বাড়াবাড়ি করবে তা তিনি এখনও আন্দাজ করতে পারেননি। বিরোধটা যেহেতু ব্যবসায়িক, তিনি ধরে নিয়েছেন, প্রতিদ্বন্দ্বীরা শুধু তাঁর ব্যবসার উপরই আঘাত হানবে। তাঁর প্রাণের উপর বা তাঁর পরিবারের উপর কোন আঘাত আসতে পারে, এ-কথা একবারও ভেবে দেখেননি তিনি। তা যদি ভাবতেন, এতটা দুর্ভোগ পোহাতে হত না তাঁকে।

হেলিকপ্টার মেইনল্যান্ডে নিয়ে যাচ্ছে নাফাজ মোহাম্মদকে, এই সময় তাঁর

পরিবারের উপর ছোঁ মারল হেকটর।

নাফাজ ম্যানসন। ভোর। এইমাত্র সূর্য উঠছে আকাশে। দুধ নিয়ে গাড়ি আসবে, তাই মেইন গেট খুলে রেখেছে প্রৌঢ় দারোয়ান। এঞ্জিনের আওয়াজ শুনে সেন্ট্রি বক্স থেকে বেরিয়ে আসছে সে, হঠাৎ মোজা দিয়ে তৈরি করা মুখোশ পরা দু'জন লোক তার সামনে এসে দাঁড়াল। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল দারোয়ান, মুখোশ পরা লোক দু'জন পিস্তল দেখিয়ে তাকে আবার পিছু হটতে বাধ্য করল। সেন্ট্রি বক্সের ভিতরে নিয়ে এসে তাকে ওরা বেঁধে ফেলল, তারপর ঠোঁট জোড়া বন্ধ করে দিল অ্যাঢেসিভ টেপ লাগিয়ে।

ইতিমধ্যে গেট দিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়েছে একটা স্টেট ওয়াগন। বাগানের পাশে থামল সেটা। বাগানে কাজ করছে বুড়ো মালী, অচেনা গাড়িটাকে দেখে ভুরু কুঁচকে উঠল তার। সেটা থেকে কেউ নামছে না দেখে ব্যাপারটা কি দেখার জন্যে এগিয়ে আসছে সে। বেচারা জানে না কৌতূহল তাকে টেনে আনবে সেই আশাতেই অপেক্ষা করছে ওয়াগনের লোকেরা। কাছাকাছি এসেছে, এই সময় লাফ দিয়ে নামল তিনজন কালো মুখোশ পরা লোক। নীলচে রঙের চকচকে তিনটে পিস্তল তার মাথা আর বুকের দিকে তাক করা রয়েছে দেখে শ্বাস কষ্ট শুরু হয়ে গেল বুড়োর, বুক ধড়ফড় করছে, মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছে। পড়ে যাবার আগেই তাকে অবশ্য ধরে ফেলা হলো, ঠোঁটের উপর টেপ লাগিয়ে দিয়ে বেঁধে ফেলা হলো হাত-পা। নেতিয়ে পড়া হালকা শরীরটা কাঁধে তুলে নেবার আগে একজন লোক ঝুঁকে পড়ে দেখে নিল মালী তার কাপড়চোপড় ভিজিয়ে ফেলেছে কিনা। বাগানের ভিতর একটা ঝোপের আড়ালে ফেলে রেখে আসা হলো তাকে।

দলের নেতা সুদর্শন এক যুবক, নাম কন্ডি। মায়ামীর একজন জুয়াড়ী হিসেবে সবাই তাকে চেনে। প্রতিপক্ষের টাকা ছিনতাই করা তার একটা বিশেষ ঝোঁক। পুলিসের খাতায় তার নামে কোন অভিযোগ নেই। তার জুয়ার আড্ডাটা বৈধ লাইসেন্স ছাড়াই চলে। ওখানে যারা ছিনতাইয়ের শিকার হয় তারা কখনও পুলিসের কাছে অভিযোগ করতে যায় না। অননুমোদিত জুয়ার আড্ডায় জুয়া খেললে আইনে শাস্তির বিধান আছে।

জুয়ার আড্ডাটা আসলে কন্ডির একটা ক্যামোফ্লেজ। তাকে যারা বাইরে থেকে চেনে, এমন কি পুলিসের লোকজনেরাও, নেহাত খুদে একটা ঝামেলা ছাড়া আর কিছু মনে করে না। কন্ডিও তাই চায়, কেউ যেন এর বেশি কিছু না ভাবে। এতে তার লাভ হয়েছে এই যে প্রায়ই হেকটর তাকে যে-সব কাজ দেয় সেগুলো সেরে এসে দিব্যি স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে সে। হেকটরের দেয়া কাজগুলোর প্রকৃতি এমন ভয়ঙ্কর, কেউ ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারে না যে কন্ডির মত খুদে একজন লোক ওগুলোর সাথে জড়িত থাকতে পারে।

নাফাজ ম্যানসনের গেট খোলাই রয়েছে। সেন্ট্রি বক্সে অপেক্ষা করছে মুখোশ পরা কন্ডির দু'জন লোক, দুধের গাড়ি এসে পৌঁছুলে সেটাকে অচল করে দেবার দায়িত্ব রয়েছে এদের ঘাড়ে।

প্রথমবার কলিংবেল বাজাতেই দরজা খুলে দিয়ে উঁকি দিল চীফ বাটলার আয়েদ আবদালী। সভ্য একজন কোটিপতির ভদ্র বাটলার সে, কন্ডির হাতের পিস্তল

দেখে চোখের পলকে বুঝে নিল একদল অসভ্য লোকের হাতে পড়েছে সে, এদের সাথে কোন রকম চালাকি করতে গেলে মান-সম্মান তো থাকবেই না, পৈত্রিক প্রাণটাও হারাতে হতে পারে। ধীরে ধীরে মাথার উপর হাত তুলে দিল। টিভির একনিষ্ঠ ভক্ত হিসেবে পিস্তলের সাথে ফিট করা সাইলেন্সারটা দেখামাত্র চিনতে পেরেছে সে।

আয়েদ আবদালীকে নিয়ে মেইন হলরুমে ঢুকল মুখোশ পরা তিনজনের দলটা। দ্রুত, সংক্ষেপে তাকে বুঝিয়ে দেয়া হলো কথা মত কাজ করলে তার বা বাড়ির কারও কোন ক্ষতি করা হবে না। আয়েদ আবদালী মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল তাকে যা করতে বলা হবে সবই সে করতে রাজী আছে।

'বাড়িতে এই মুহূর্তে কে কে আছে?' জানতে চাইল কন্ডি।

'আমি...'

'তোমাকে তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি।'

ঘনঘন ঢোক গিলছে আয়েদ আবদালী, তবু গলা কেঁপে যাচ্ছে তার। 'দু'জন দারোয়ান, আমার দু'জন সহকারী বাটলার, একজন শোফার, একজন মালী, একজন রেডিও অপারেটর, একজন সেক্রেটারি, একজন বাবুর্চি, আর দু'জন চাকরানী। ঘরদোর সাফ-সুতরো করার জন্যে একটা মেয়ে আছে, কিন্তু বেলা আটটার আগে এসে পৌঁছায় না সে।'

'টেপ লাগাও,' বলল কন্ডি। টেপ লাগিয়ে বন্ধ করে দেয়া হলো আয়েদ আবদালীর মুখ। 'এবার, মালী ছাড়া বাকি দশজনের শোবার ঘরে, বা যেখানে এখন তারা আছে সেখানে নিয়ে চলো আমাদেরকে।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওদেরকে আয়েদ আবদালী। দশ মিনিট পর আয়েদ আবদালী সহ আরও দশজনকে বেঁধে ফেলা হলো, সবার মুখে টেপ লাগাবার কাজও শেষ। 'এবার, মিস শিরি ফারহানার কামরায় যাব আমরা।'

এদিক ওদিক মাথা দোলাল আয়েদ আবদালী। অর্থাৎ প্রভুর নিমক খেয়ে এতবড় নিমকহারামী করতে পারবে না সে। সময় নষ্ট করার লোক কন্ডি নয়, হলঘরে নিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসানো হলো আয়েদ আবদালীকে। চেয়ারের সাথে শক্ত করে বাঁধা হলো তাকে। কন্ডি তার চোখ দেখেই বুঝতে পেরেছে মনিবের মেয়ের ঘর দেখাতে রাজী করানো যাবে না লোকটাকে। 'নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকো তুমি, তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। মিস শিরির কামরা আমরা চিনি।'

শিরির বেডরুম খোলা। ধীর এবং শান্ত পায়ে ভেতরে ঢুকল ওরা তিনজন। প্রত্যেকের হাতে পিস্তল। কিন্তু পেছন দিকে লুকানো। প্রাণের ভয়ে হাউমাউ করে উঠুক মেয়েটা তা চাইছে না কন্ডি। বালিশে একরাশ কালো চুল ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ফোমের বিছানায় প্রায় সম্পূর্ণ ডুবে আছে শিরির শরীর। খোশ-আলাপের সুরে শুরু করল কন্ডি, 'বেলা তো আর কম হয়নি, ম্যাডাম, এবার দয়া করে বিছানা থেকে উঠে চলুন না একটু বেড়িয়ে আসা যাক।'

গড়ান দিয়ে বিছানার ওপর উপুড় হলো শিরি, মাথা তুলে তাকাল দরজার দিকে। চোখে এখনও ঘুম লেগে রয়েছে। কালো মুখোশগুলো দেখে চট করে ঘুম

ঘুম ভাব কেটে গেল তার, চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল। কিন্তু খুব যে একটা ভয় পেয়েছে তা মনে হচ্ছে না কন্ডির, অন্তত চিৎকার করে ওঠার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। শিরির চোখ দুটো ধীরে ধীরে স্বাভাবিক আকৃতি ফিরে পাচ্ছে। হাত বাড়িয়ে একটা চাদর টেনে নিজেকে মুড়ে নিল সে, তারপর উঠে বসল বিছানার ওপর শিরদাঁড়া খাড়া করে। 'কে তোমরা? কি চাও?' কিন্তু যতটা তীক্ষ্ণ সুর ফোটাতে চাইল গলায় ততটা ফুটল না, নিজেও সেটা বুঝতে পারল শিরি।

'এর মধ্যে শেখার অনেক কিছু আছে,' নিজের সঙ্গীদের দিকে দেখিয়ে বলল কন্ডি, 'এতদিন শুনে এসেছি ধনীর আদুরী দুলালীরা রোজ রাতে স্বপ্ন দেখে তাদেরকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। এদেরকে দেখো, ওই দলেরই লোক মনে হচ্ছে, ঠিক কিনা?'

'তোমরা কিডন্যাপার?' ভুরু কুঁচকে, কিছুটা কৌতুকের সুরে জানতে চাইল শিরি। এক সেকেন্ডের মধ্যে অনেক কথা মনে পড়ে গেল তার। কথায় কথায় একদিন আনিসকে জিজ্ঞেস করেছিল সে, ধনী লোকের মেয়েকে কিডন্যাপ করা আজকাল একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে—ধরো, আমাকে যদি কেউ কোন দিন কিডন্যাপ করে, এবং সবাই যদি শত খোঁজাখুঁজি করেও আমার কোন হদিস বের করতে না পারে, কি করবে তখন তুমি? এক কথায় উত্তর দিয়েছিল আনিস, রানা এজেন্সী তখন মাত্র দু'দিনে তোমাকে খুঁজে বের করবে। সেদিন আনিসের আত্মবিশ্বাস লক্ষ করে ভাল লেগেছিল শিরির। কিন্তু এই মুহূর্তে আনিসের ওপর ততটা ভরসা রাখতে পারছে না সে।

'আমাদের পরিচয় যাই হোক,' বলল কন্ডি, 'তবে আপনি যে কিডন্যাপ হচ্ছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে তোমরা?' সরল সহজ প্রশ্ন করল শিরি।

'ছুটি কাটাতে। রোদ-ঝলমলে ছোট্ট একটা দ্বীপে,' হাসছে কন্ডি। 'তবে, স্যুইম-স্যুট ওখানে কোন কাজে আসবে না আপনার। দয়া করে বিছানা থেকে নেমে পোশাকটা পরে নিন।'

'তোমাদের কথা যদি না শুনি?'

কন্ডির দেখাদেখি বাকি দু'জনও পেছনে লুকিয়ে রাখা পিস্তল ধরা হাত সামনে নিয়ে এল। 'তাহলে আমরাই পোশাক পরাব আপনাকে। আপনি তাই চান?'

'না। তোমরা কামরা থেকে বেরিয়ে যাও, তা না হলে কাপড় পাল্টাব না আমি।'

'আমার সঙ্গীরা বেরিয়ে গিয়ে বাইরে করিডরে অপেক্ষা করুক,' বলল কন্ডি, 'আর আমি বাথরুমে গিয়ে ঢুকি। বাথরুমের দরজা সিকি ইঞ্চি খোলা থাকবে, আপনাকে দেখার জন্যে নয়, জানালা দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন কিনা লক্ষ্য রাখার জন্যে।'

অযথা সময় নষ্ট করল না শিরি। তিন মিনিট পরই কামরায় ফিরে আসতে বলল ওদেরকে। নীল ব্লাউজ, নীল স্ল্যাকস্ পরেছে সে, মাথায় চিরুনি বুলিয়ে নিয়েছে। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে প্রশংসাসূচক ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কন্ডি। বলল, 'একটা ট্র্যাভেলিং ব্যাগ গুছিয়ে নিন, কয়েকটা দিন যাতে চলে যায়।'

ব্যাগে এটা সেটা ভরছে শিরি. সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে পাশেই দাঁড়িয়ে আছে কন্ডি। চেন টেনে ব্যাগটা বন্ধ করে বিছানা থেকে হ্যান্ডব্যাগ তুলে নিল শিরি. সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে কন্ডির দিকে তাকাল। হাত বাড়িয়ে তার হ্যান্ডব্যাগ একরকম প্রায় ছিনিয়ে নিল কন্ডি। ক্লিপ খুলে উল্টো করে ধরল সেটা, ভেতরের সমস্ত জিনিস ছড়িয়ে পড়ল বিছানার ওপর। সেগুলোর মধ্যে থেকে মুক্তা খচিত হাতওয়ালা ছোট্ট একটা পিস্তল তুলে নিয়ে নিজের পকেটে ভরল কন্ডি। তারপর বলল, 'হ্যান্ডব্যাগটা আবার ভরার কষ্টটুকু আপনাকেই করতে হবে, ম্যাডাম।'

মুখটা লাল হয়ে উঠেছে শিরির। নিঃশব্দে বিছানার দিকে ঝুঁকে পড়ে কাজটা শেষ করল সে।

দল নিয়ে কন্ডি নাফাজ ম্যানসনে ঢোকার পর পঁচিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে। এর মধ্যে দুধের গাড়ি নিয়ে বাড়িতে ঢুকেছে দু'জন লোক। কন্ডির লোকেরা তাদেরকে গাড়ি থেকে নামার কষ্ট পর্যন্ত করতে দেয়নি। কেউ এসে উদ্ধার না করা অবধি গাড়িতেই মুখে টেপ লাগানো আর হাত পা বাঁধা অবস্থায় থাকতে হবে তাদেরকে। সাবধানের মার নেই, তাই গাড়িটার কিছু পার্টস খুলে নিয়ে যাচ্ছে কন্ডি।

সাগর কন্যা থেকে রওনা হবার দশ মিনিট পর নাফাজ মোহাম্মদকে নিয়ে তার ব্যক্তিগত এয়ারপোর্টে নামল হেলিকপ্টারটা। 'কপ্টার থেকে নেমে বোয়িংয়ে চড়লেন নাফাজ মোহাম্মদ। অনেকদিন আগেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যা করার করা হয়েছে, ফলে কাস্টমস্ বা ক্লিয়ারেন্সের ঝামেলা পোহাতে হয় না তাঁকে। বোয়িংয়ে চড়ার সাথে সাথে স্টার্ট নিল এঞ্জিনগুলো।

তাঁর যাত্রার এই দ্বিতীয় পর্যায়েও আরেকটা অঘটন ঘটল, কিন্তু প্রথমটার মত এটা সম্পর্কেও তিনি কিছুই জানতে পারলেন না।

ট্যাঙ্কার রকেটকে খুঁজে পেয়েছে সানলাইটের (সী-উইচের) 'কপ্টার। পাইলট তার রিপোর্টে জানাল, মিনিট দুই আগে ট্যাঙ্কারটাকে দেখেছে সে, সেই আন্দাজে অঙ্ক কষে তার পজিশন জানাচ্ছে। হেকটরের কাছে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, ট্যাঙ্কারের কোর্স তিনশো পনেরো ডিগ্রী বলে উল্লেখ করল পাইলট। তার মানে, সানলাইট (সী-উইচ) যদি তার কোর্স বদল না করে, দুটো জাহাজের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যাবার সমূহ আশঙ্কা। দুটো জাহাজের মাঝখানে কমবেশি পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরত্ব রয়েছে। পাইলটের প্রশংসা করে তাকে সী-উইচে ফিরে আসতে বলল হেকটর।

সী-উইচের ব্রিজে দাঁড়িয়ে আছে হেকটর আর ময়নিহান। ময়নিহানের হাসির উত্তরে হেকটরের গম্ভীর থমথমে মুখে ক্ষীণ সন্তোষের আভাস ফুটল। পরিকল্পনা আর তাঁর বাস্তবায়নের মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক থাকে, কিন্তু এক্ষেত্রে পরিকল্পনা অনুযায়ী সবকিছু ঠিকঠাক মতই চলছে।

'আরও ভাল পোশাক পরার সময় হয়েছে, কি বলো?' ময়নিহানকে বলল হেকটর। 'আর শোনো, নাকে একটু পাউডার ঘষে নিতে ভুলো না।'

সহাস্যে ব্রিজ ছেড়ে চলে গেল ময়নিহান। হেলমস্ম্যানকে কয়েকটা নির্দেশ

দেবার জন্যে রয়ে গেল হেকটর, কথা শেষ করে সেও নেমে এল ব্রিজ থেকে।

একঘন্টাও পেরোয়নি, দিগন্তরেখার উপর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ট্যাঙ্কার রকেটকে। সোজা সেটার দিকে ছুটছে সী-উইচ। মাঝখানে দূরত্ব যখন তিন মাইলে এসে ঠেকল, কোর্স বদলে স্টারবোর্ডের দিকে ত্রিশ ডিগ্রী ঘুরে গেল সে। তারপর ভদ্রতাসূচক একটা বিরতি নিয়ে আচমকা পোর্টের দিকে প্রকাণ্ড একটা বাঁক নিতে শুরু করল। দু'মিনিট পর দেখা গেল রকেটের সাথে সমান্তরাল রেখায় ছুটছে সী-উইচ, তার পোর্ট কোয়ার্টারের পাশে চলে এসেছে—যে-কোন ট্যাঙ্কারের ব্রিজ একেবারে পেছন দিকে থাকে—একই স্পীডে একই দিকে, মাঝখানে ত্রিশ গজ দূরত্ব নিয়ে এগোচ্ছে দুটো জাহাজ। সী-উইচের ব্রিজের ডানায় বেরিয়ে এল হেকটর। হাতে একটা লাউড-হেইলার। সেটা মুখের সামনে তুলে কথা বলতে শুরু করল সে।

'আমরা কোস্টগার্ড বলছি। থামুন। আদেশ নয়, অনুরোধ করছি। বোমার ওপর বসে রয়েছেন আপনারা। যে-কোন মুহূর্তে বিপদ হতে পারে। এক্সপার্টদেরকে নিয়ে এখুনি সার্চ করা দরকার। জাহাজ আর ক্রুদের ওপর যদি মায়া-মমতা থাকে, দয়া করে রেডিও সাইলেন্স ব্রেক করবেন না।'

রকেটের স্কিপার টমসন অতি ভালমানুষ, ঘোরপ্যাঁচ বড় একটা বোঝে না সে, নিজের লাউড হেইলার মুখের সামনে তুলে বলল, 'বোমা? বোমা কোত্থেকে আসবে? তোমরা বোধহয় ভুল করেছ।'

'ভুল করার প্রশ্নই ওঠে না। আপনাদের ভালর জন্যেই বলছি, থামুন, এক সেকেন্ডের এদিক ওদিকে সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে। শুধু কর্তব্যের খাতিরে এত বড় ঝুঁকি নিতে চাইছি আমরা, আসলে আমাদের উচিত আপনাদের কাছ থেকে কমপক্ষে পাঁচ মাইল দূরে সরে থাকা। আমার লেফটেন্যান্টকে সাথে নিয়ে আপনাদের জাহাজে যেতে চাই আমি, ব্যাখ্যা করে বললেই বুঝবেন বিপদটা কোথায়। রকেটের সিসটার-শিপের কপালে গতরাতে কি ঘটেছে নিশ্চয় তা জানা আছে আপনার?'

রকেটের ব্রিজে ওঠার সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করছে দু'জন ক্রু, বোমার কথা শুনে ভয়ে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হবার দশা হয়েছে তাদের। কটমট করে সেদিকে একবার তাকাল ক্যাপ্টেন টমসন। তারপর সী-উইচের দিকে ফিরে কাঁধ ঝাঁকাল সে। বলল, 'ঠিক আছে। থামাচ্ছি জাহাজ। কিন্তু আগে আমি ব্যাখ্যাটা শুনতে চাই, তারপর সার্চ-পার্টির কথা বিবেচনা করা যাবে।'

তিন মিনিট পর। শান্ত সাগরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রকেট। ধীর গতিতে তার পাশ ঘেঁষে এগোচ্ছে সী-উইচ। বিশাল বপু সুপারস্ট্রাকচার একটু সামনে থাকতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। এখন এক পা ফেললেই এক ডেক থেকে আরেক ডেকে যাওয়া সম্ভব। ঠিক তাই করতে যাচ্ছে হেকটর আর ময়নিহান। ট্যাঙ্কারের সাথে সী-উইচকে সামনে পেছনে শক্ত করে বাঁধা হচ্ছে, কাজটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছে ওরা।

ক্রমশ উঠে যাওয়া কয়েকটা কমপ্যানিয়নওয়ে পেরিয়ে ব্রিজে ওঠার সিঁড়ির

গোড়ায় এসে দাঁড়াল হেকটর আর ময়নিহান। দ্রুত চারদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেবার জন্যে দুই সেকেন্ডের জন্যে থামল ওরা। কেউ উঁকিঝুঁকি মারছে না কোথাও থেকে। সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উঠে এল ব্রিজে।

দু'জনেরই আসল চেহারা ঢাকা পড়ে গেছে। হেকটরের মুখে আশ্চর্য ঘন কালো দাড়ি দেখা যাচ্ছে। সুন্দর করে ছাঁটা চওড়া গোঁফ। চোখে সানগ্লাস। ইউনিফর্মটা দারুণ ফিট করেছে শরীরে। একটু ময়লা লেগে ম্লান দেখাচ্ছে ক্যাপটাকে, কিন্তু নোংরা নয়। একটা কোস্টগার্ড কাটারের যোগ্য ক্যাপ্টেন বলেই মনে হচ্ছে তাকে। ছদ্মবেশ নিয়েছে ময়নিহানও, তাকেও যোগ্য ক্যাপ্টেনের উপযুক্ত সহকারীর মত লাগছে দেখতে।

ক্যাপ্টেন টমসন আর বেকার হেলমসম্যান ছাড়া আর কেউ নেই ব্রিজে। ক্যাপ্টেনের সাথে করমর্দন করল হেকটর।

'গুড মর্নিং। পথের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দেরি করাবার জন্যে সত্যি দুঃখিত আমি। কিন্তু এ যাত্রা যদি রেহাই পান, যতদিন বেঁচে থাকবেন আমাদের কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞ বোধ করতে হবে। সময় নেই, কাজ শুরু করে দেয়া যাক। আগে বলুন, আপনার রেডিওরুম কোথায়?' ব্রিজের পেছন দিকের একটা দরজা দেখাল ক্যাপ্টেন টমসন। 'আমার লেফটেন্যান্টকে দিয়ে রেডিও সাইলেন্স চেক করিয়ে নিতে চাই আমি। সবচেয়ে জরুরী কাজ এটাই।' আবার মাথা নেড়ে সম্মতি দিল ক্যাপ্টেন টমসন, কিন্তু তার চেহারায় অস্বস্তির ভাব ফুটে উঠেছে। ময়নিহানের দিকে তাকাল হেকটর। 'যাও, চেক করো, ডিকসন। কুইক!'

কয়েকটা লম্বা পা ফেলে রেডিওরুমে গিয়ে ঢুকল ময়নিহান। ট্র্যান্সিভার থেকে মুখ তুলে তাকাল রেডিও অপারেটর, ময়নিহানকে দেখে একটু অবাক হলো সে।

'বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত,' বলল ময়নিহান। 'আমি পাশের কোস্টগার্ড কাটার থেকে এসেছি। ক্যাপ্টেন তোমাকে রেডিও সাইলেন্স ব্রেক করতে নিষেধ করেছে, তাই না?'

'সেই নিষেধই পালন করছি আমি।'

'সাগর কন্যার সাথে ছাড়াছাড়ি হবার পর কল করেছ ওদেরকে?'

'আধ ঘন্টা পর পর। শুধু রুটিন কল। অন কোর্স, অন টাইম।'

'প্রতিবার সাড়া দিয়েছে ওরা? প্রশ্নটা জানতে চাওয়ার কারণ আছে।' কিন্তু সে কারণটা যে কি তা বলার ধার দিয়েও গেল না ময়নিহান।

'না। মানে, হ্যাঁ—এসব ক্ষেত্রে সাধারণত যেমন হয়, "রজার অ্যান্ড আউট" গোছের।'

'তোমাদের কল-আপ ফ্রিকোয়েন্সিটা জানাবে?'

কনসোলটা দেখাল অপারেটর। 'প্রি-সেট।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করল ময়নিহান। সহজ পায়ে এগিয়ে গেল, দাঁড়াল অপারেটরের পেছনে, ঝুঁকে পড়ল তার দিকে, যেন কনসোলটা ভাল করে দেখতে চেষ্টা করছে। তারপর সিধে হয়ে দাঁড়াতে শুরু করল সে। এই সময় তার হাতে একটা পিস্তল বেরিয়ে এল। সেটা উল্টো করে ধরে অপারেটরের কানের পাশে প্রচণ্ড একটা ঘা বসিয়ে দিল সে। লোকটা জ্ঞান হারিয়েছে কিনা পরীক্ষা করে

দেখে দ্রুত ফিরে এল ব্রিজে।

ক্যাপ্টেন টমসনকে ইতিমধ্যে উদ্বেগ-সাগরে ফেলে দিয়ে হাবুডুবু খাওয়াচ্ছে হেকটর।

'আপনি বলছেন কয়েকদিন আগেও ফিট করা হয়ে থাকতে পারে বোমাটা? মাই গড!' চোখ কপালে উঠে গেল ক্যাপ্টেনের।

'বোমাটা, নাকি বোমাগুলো—সার্চ না করে কিভাবে বলা যায়, বলুন?'

চেহারা কালো হয়ে গেছে ক্যাপ্টেনের। 'কি ধরনের প্রি-সেট বোমা হতে পারে বলে সন্দেহ করছেন আপনি?'

'টাইম-বম্ব নয় তা আমি হলপ করে বলতে পারি। রেডিও সঙ্কেত পেয়ে সাড়া দেবে এমন সব যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজানো আছে ডিটোনেটরগুলো—তার মানে যখন ইচ্ছা কাছাকাছি কোন জাহাজ, প্লেন বা 'কপ্টার থেকে সঙ্কেত পাঠিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো যাবে।'

হতভম্ব ক্যাপ্টেন টমসন বোবা বনে গেছে। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর বলল, 'ফর গডস্ সেক, গালফে এই বিপুল পরিমাণ তেল ভাসাবার দুঃসাহস কোন্ পাগলের হতে পারে?'

'আপনাকে তো আমি আগেই বলেছি, আমাদের তথ্যের উৎস এই মুহূর্তে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই, ওরা পাগল নয়, ম্যানিয়াক। নাফাজ মোহাম্মদের মাথায় বাড়ি মারার জন্যে নিপুণ প্ল্যান নিয়ে এগোচ্ছে ওরা।' একটু বিরতি নিয়ে আবার বলল হেকটর, 'আপনি যদি অনুমতি না দেন, কিছুই করার নেই আমাদের। আমরা সাহায্য করতে চেয়েছিলাম, বিবেকের কাছে মুক্ত থাকার জন্যে এইটুকুই যথেষ্ট। আপনি কি ভাবছেন আমাদের সাহায্য দরকার নেই আপনাদের?'

'না-না।' ঘাবড়ে গিয়ে বলল ক্যাপ্টেন টমসন। 'এত বড় বিপদ জানার পর আপনাদের সাহায্য ফিরিয়ে দিই কিভাবে! কিভাবে সার্চ করতে চান আপনারা? কোথায় লুকানো আছে বোমা তা নিশ্চয় জানা নেই আপনাদের?'

'তা জানা নেই,' বলল হেকটর। 'কিন্তু আমাদের এক্সপার্টদের কাছে ডিটেকটর যন্ত্র আছে, বড়জোর বিশ মিনিটের মধ্যে খুঁজে বের করে ফেলবে ওরা। স্টোরেজ স্পেস, লিভিং অ্যাকোমোডেশন আর এঞ্জিনরূম—এই সব জায়গার কোথাও আছে। বলা যায় না, সব জায়গাতেই হয়তো আছে একটা করে।' পকেট থেকে হাভানা চুরুটের বাক্সটা বের করে ক্যাপ্টেন টমসনের দিকে বাড়িয়ে দিল সে। 'কিন্তু, আমার বিশ্বাস, বোমাগুলো এখুনি ফাটাবে না ওরা। অন্তত যতক্ষণ আপনারা মার্কিন উপকূলের একেবারে কাছাকাছি না পৌছাচ্ছেন।'

'কেন?' হেকটরের লাইটার থেকে চুরুট ধরিয়ে নিয়ে জানতে চাইল ক্যাপ্টেন।

নিজের চুরুটটা ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল হেকটর। 'কেন? উপকূলের কাছাকাছি তেলে আগুন লাগলে তার পরিণতি কি হবে ভেবে দেখুন না! তীর ঘেঁষা শহরগুলো সাংঘাতিকভাবে আক্রান্ত হবে পলিউশনে। তাতে কি প্রতিক্রিয়া হবে ভেবে দেখেছেন? নাফাজ অয়েল কোম্পানীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠবে চারদিক

থেকে। বিস্ফোরণ আর আগুনের জন্যে দায়ী যেই হোক, সবাই দোষ দেবে নাফাজ অয়েল কোম্পানীকে। আন্তর্জাতিক চাপের মুখে সাগর কন্যার অপারেশন বন্ধ করে দেয়াও হতে পারে। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জলসীমায় নাফাজ অয়েল কোম্পানীর ট্যাঙ্কার প্রবেশ করা মাত্র আটক করা হবে সেগুলোকে।' গড় গড় করে দিব্যি মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছে হেকটর। 'সম্ভাব্য সব রকম ক্ষতি করতে চাইছে ওরা নাফাজ মোহাম্মদের, সুতরাং কিভাবে কোত্থেকে কখন কি ঘটবে তা আন্দাজ করে বুঝে নিতে হবে।' টমসনের চোখে চোখ রেখে আসল কথাটা পাড়ল এবার সে, 'ডাকব? আমার লোকদের?'

মাথা কাত করে অনুমতি দিল ক্যাপ্টেন টমসন।

মুখের সামনে লাউড-হেইলার তুলে সার্চপার্টিকে চলে আসতে বলল হেকটর। তৈরি হয়েই আছে ওরা, সাথে সাথে লাফ দিয়ে সী-উইচ থেকে রকেটে চলে এল। প্রত্যেকে মুখোশ পরে আছে, সবার হাতে একটা করে মেশিন-পিস্তল। স্তম্ভিত ক্যাপ্টেন টমসন ঝট্ করে তাকাল হেকটর আর ময়নিহানের দিকে। ইতিমধ্যে ওদের দু'জনের হাতেও বেরিয়ে এসেছে পিস্তল।

'এসবের কি মানে?' বিমূঢ় কণ্ঠে জানতে চাইল ক্যাপ্টেন টমসন।

হাসি ফুটল ময়নিহানের ঠোঁটে। কিন্তু উত্তর দিল হেকটর। ভরাট গম্ভীর গলায় বলল, 'দেখতেই তো পাচ্ছ কি হচ্ছে। হাইজ্যাক।' ক্যাপ্টেনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ল সে। 'দেখো, আর যাই করো, হীরো হবার চেষ্টা কোরো না। তাতে শুধু শুধু নিজের প্রাণটাই হারাবে তুমি। কথা যদি মেনে চলো, তোমাদের কারও কোন ক্ষতি করব না আমরা। বাধা দিয়ে কিছু লাভ হবে না। চোদ্দটা সাবমেশিনগানের বিরুদ্ধে কি করার আছে তোমাদের?'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব ক্রু, অফিসার আর লোকজনকে বেঁধে ফেলা হলো। শুধু একজনকে ছাড়া। সে ডিউটি এঞ্জিনিয়ার, ডিউটি দিচ্ছে এঞ্জিন রূমে। ক্রুদের মেসে আটক করে রাখা হলো বাকি সবাইকে। বাইরে সশস্ত্র পাহারা।

ব্রিজে দাঁড়িয়ে জরুরী নির্দেশ দিচ্ছে ময়নিহানকে হেকটর। 'আধঘণ্টা পর পর অন টাইম অন কোর্স রিপোর্ট পাঠাবে সাগর কন্যাকে। দু'তিন ঘণ্টা চালিয়ে যাবে এভাবে, তারপর জানাবে ছোটখাট গোলমাল দেখা দিয়েছে ট্যাঙ্কারে, ফলে কয়েক ঘণ্টা অচল রাখতে হচ্ছে ট্যাঙ্কারকে। এমন একটা যান্ত্রিক গোলযোগের কথা বলবে, সাগর কন্যা খুব যেন বিচলিত হয়ে না পড়ে। ভুলে যেয়ো না, আজ রাতে গলভেস্টনে পৌঁছুবার কথা রকেটের। সময় সম্পর্কে সচেতন থেকে রিপোর্ট পাঠাতে হবে তোমাকে। তারপর কি করতে হবে না হবে, আগেই জানানো হয়েছে তোমাকে।' একটু থেমে আবার বলল হেকটর, 'নাফাজ মোহাম্মদকে তুচ্ছ জ্ঞান কোরো না। রাত নামার সাথে সাথে সমস্ত নেভিগেশন্যাল লাইট অফ করে দেবে···না, শুধু নেভিগেশন্যাল লাইট নয়, ট্যাঙ্কারের প্রত্যেকটি আলো নিভিয়ে দেবে। অসাধারণ ক্ষমতাশালী লোক সে, যদি একবার সন্দেহ করে যে তার ট্যাঙ্কার হারিয়ে গেছে, সাগর মন্থন করতেও ছাড়বে না।'

সী-উইচে ফিরে এল হেকটর। বাঁধন-মুক্ত হয়ে রকেটের পাশ থেকে সরে এল কাটার। রকেটকে নিয়ে রওনা হলো ময়নিহান। তার কোর্স উত্তর-পশ্চিম বরাবর

হবার কথা, কিন্তু নব্বই ডিগ্রী বাঁক নিয়ে ছুটে চলেছে সে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। আধঘণ্টা পর যথারীতি সাগর কন্যাকে রিপোর্ট পাঠাল—'অন কোর্স, অন টাইম'।

সী-উইচকে নিয়ে অপেক্ষা করছে হেকটর। খানিক পর ইলেকট্রিক পুল-পুশ ইউরেনাস এসে মিলিত হলো তার সাথে। দুটো জাহাজ রওনা হলো পাশাপাশি। দক্ষিণ-পুব দিকে যাচ্ছে ওরা, সোজা সাগর কন্যার দিকে।

সাগর কন্যা যখন আর মাত্র পঁয়ত্রিশ নটিক্যাল মাইল দূরে, সী-উইচ আর ইউরেনাস তাদের এঞ্জিন বন্ধ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। দিগন্তরেখার ওপারে রয়েছে সাগর কন্যা, এদেরকে দেখতে পাচ্ছে না। তার রাডার আর সোনারও এদের নাগাল পাচ্ছে না। এর চেয়ে নিরাপদ জায়গা আর হয় না। এখানেই অপেক্ষা করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে হেকটর।

ফ্লোরিডা থেকে ওয়াশিংটনের দূরত্ব প্রায় অর্ধেক পেরিয়ে এসেছে বোয়িংটা। ফ্লাইট ডেকের ঠিক পেছনে বিলাসবহুল, অত্যাধুনিক আসবাবে সাজানো কেবিনে ঘুমাচ্ছেন নাফাজ মোহাম্মদ। গতরাতটা সম্পূর্ণ অনিদ্রার মধ্যে কেটেছে তাঁর, দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগে আজ সকালেও ঘুমাতে পারছিলেন না, শেষ পর্যন্ত একজোড়া স্লীপিং পিল খেতে হয়েছে তাঁকে।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছেন নাফাজ মোহাম্মদ। দেখছেন, তাঁর চারদিকে ধু ধু করছে ঊষর মরুভূমি। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন ছোট্ট একটা মরুদ্যানের কিনারায়। পেছনে অনেকগুলো ছেঁড়া তাঁবু, সেগুলোর ভেতর থেকে আবালবৃদ্ধবণিতার করুণ বিলাপ আর দুর্বল কান্নার ফোঁপানি ভেসে আসছে। বেদুইন সর্দার তার গোষ্ঠির সমর্থ যুবকদেরকে নিয়ে ডাকাতি করতে বেরিয়েছে আজ পনেরো দিন, এখনও তাদের দেখা নেই। জঠরজ্বালা সহ্য করতে না পেরে এরই মধ্যে আত্মহত্যা করেছে তাঁবুর কয়েকজন পঙ্গু পুরুষ। আর খেতে না পেয়ে মারা গেছে কয়েকটা শিশু, কয়েকজন বৃদ্ধ। সবাই জানে, বেদুইন যুবকরা যদি খাবার লুট করে নিয়ে আসতে না পারে, তাঁবুর একজন লোকও বাঁচবে না। জীবন এখানে কঠিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়া, দুটো খেজুরের জন্যে মানুষের বুকে ছুরি বসানো।

নয় বছরের কিশোর নাফাজ মোহাম্মদ, হঠাৎ দেখতে পেল দিগন্তরেখার কাছে, বহুদূরে, একটা লম্বা লাঠির মত কি যেন কাঁপছে। নিজের অজান্তেই চিৎকার করে উঠল সে। তার সেই চিৎকার শুনে তাঁবু থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এল অভুক্ত নারী আর বুড়ো-বুড়ীর দল। অভিজ্ঞ চোখে দিগন্তরেখার দিকে তাকিয়েই তারা বুঝল আক্রমণ করার জন্যে অন্য কোন ডাকাত দল নয়, আসছে তাদেরই লোকজন।

দলবল নিয়ে তাঁবুর কাছে পৌছুল বেদুইন সর্দার, কিশোর নাফাজের বাবা। ক্ষুধায় কাতর কিশোর অবাক হয়ে দেখছে বেদুইন যুবকদের কাপড়চোপড় শক্ত, খড়খড়ে হয়ে গেছে। সাদা পোশাক পরে গিয়েছিল ওরা সবাই, এখন সেই পোশাকগুলোকেই কালো দেখাচ্ছে। ওগুলো মানুষের রক্তের দাগ, বুঝতে পারছে কিশোর নাফাজ। শুকিয়ে কালো আর শক্ত হয়ে গেছে।

গভীর রাত। মশালের লালচে আলোয় নাচ-গান আর উৎসবের ঢল নেমেছে বেদুইন ক্যাম্পে। কিশোর নাফাজ তার বাবার পাশে বসে রয়েছে। বারবার মুখ

তুলে তাকাচ্ছে সে তার বাবার দিকে।

'কিছু বলবি?' জানতে চাইল বাবা।

'কাদেরকে খুন করো তোমরা, বাবা?' বাবাকে চমকে দিয়ে জানতে চাইল নাফাজ।

'এত খাবার, সোনা আর টাকা নিয়ে আসো—কোথায় পায় ওরা? মানুষ খুন না করে সেখান থেকে তোমরাও আনতে পারো না?'

ছেলের দিকে অনেকক্ষণ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকার পর বাবা বলল, 'ওরাও আমাদেরই মত লুটপাট করে। ওদের পেটে বিদ্যা আছে, সেটা আমাদের হাতের বন্দুকের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী অস্ত্র।'

'ওই অস্ত্রটা আমাদের নেই কেন?' সরল বালক জানতে চাইল।

স্বপ্নের এই পর্যায়ে এসে ঘুম ভেঙে গেল নাফাজ মোহাম্মদের। সিলিংয়ের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে গোটা স্বপ্নটা আরেকবার স্মরণ করলেন তিনি। অবাস্তব কিছু নয়, তাঁর কিশোর বয়সের একদিনের ঘটনাই স্বপ্নের মধ্যে দেখেছেন তিনি। সেই কিশোর বেদুইন সন্তান ঊষর মরু থেকে উঠে এসে কোথায় পৌঁছেচেন আজ, ভাবতে গেলেও অবিশ্বাস্য লাগে। কিশোর বুদ্ধিতে সেদিন বাবার কথার তাৎপর্য বুঝতে পারেননি তিনি। কিন্তু আজ সবই বোঝেন। বাবা ঠিক কথাই বলেছিলেন সেদিন। বিদ্যা একটা আশ্চর্য অস্ত্রই বটে। কিভাবে এটাকে কাজে লাগানো হয় তার ওপর নির্ভর করে এর ভাল-মন্দ। বিদ্যা তিনিও অর্জন করেছেন, কিন্তু বিবেকের কাছে আজ যদি জবাবদিহি করতে হয়, কি বলবেন তিনি? নিজের বিদ্যাকে তিনি কি ভাল কাজে ব্যবহার করেছেন, নাকি মন্দ কাজে ব্যবহার করেছেন? এক কথায় এ-প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব না হলেও নিজের কাছে অন্তত স্বীকার করতে বাধ্য তিনি যে শুধু সৎ পথ ধরে চললে এতটা ওপরে ওঠা আগামী পাঁচশো বছরেও তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। প্রথমে টিকে থাকার জন্যে, তারপর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে, তারপর আরও বড় হবার জন্যে, আরও ক্ষমতা অর্জনের জন্যে বিবেকের নিষেধ অমান্য করে অসংখ্য অন্যায় কাজ করতে হয়েছে তাঁকে। আর সবাইও তাই করছে। সভ্য দুনিয়ার পরিবেশ আর পরিস্থিতি আজও সেই বর্বর যুগের মত হুবহু একই রকম রয়ে গেছে, এতটুকু বদলায়নি। শোষণ আর অত্যাচারের নব নব কৌশল আবিষ্কার হয়েছে লাখে লাখে, এই যা পার্থক্য।

মাটি থেকে তিন হাজার ফিট ওপরে নিজের ব্যক্তিগত বোয়িংয়ের বিলাসবহুল, আরামদায়ক কেবিনে শুয়ে রয়েছেন নাফাজ মোহাম্মদ, কিন্তু মনে এতটুকু শান্তি নেই তাঁর। দুনিয়ার সেরা পাঁচজন ধনী লোকের মধ্যে তিনি একজন, কিন্তু কি হবে এই অগাধ সম্পদ আর ঐশ্বর্য দিয়ে, মুহূর্তের জন্যেও যদি তিনি নিরাপদ বোধ না করেন?

পরিষ্কার উপলব্ধি করছেন তিনি, অসংখ্য বিষাক্ত বর্শা আর তীর তাঁর দিকে ছুটে আসছে চারদিক থেকে। নিজেকে রক্ষা করার জন্যে হন্যে হয়ে ছুটোছুটি করছেন তিনি। তাঁর অবস্থাই যদি এই হয়ে থাকে, দরিদ্র আর নিরস্ত্র কোটি কোটি আদম সন্তানের দিন কিভাবে কাটছে? ভাবতে গিয়ে মাথা ঘুরে উঠল তাঁর।

স্বপ্নটার কথা আবার মনে পড়ে গেল। ভাবছেন, কি লাভ হলো দুনিয়ার সভ্য

আর সবচেয়ে ধনী দেশের নাগরিক হয়ে? এর চেয়ে কোন্‌দিক থেকে খারাপ ছিল বেদুইন যাযাবরের কঠিন সংগ্রামের জীবন?

নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছেন, কিন্তু সেই সাথে এও ভাবছেন যে এই আরাম, এই ভোগ বিলাস ছেড়ে আবার যদি তাঁকে সেই ঊষর মরুতে ফিরে গিয়ে বেদুইন ডাকাত হতে বলা হয়, হেসেই খুন হয়ে যাবেন তিনি। না, তা আর সম্ভব নয়। এবং, নাফাজ মোহাম্মদ আজ হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, তিনি মহৎ পুরুষ হয়ে জন্মাননি; লোভ-লালসা, ভোগ-বিলাসের প্রতি তাঁর আকর্ষণ আর দশটা সাধারণ মানুষের মতই, তাদের চেয়ে কোন অংশে উৎকৃষ্ট প্রাণী নন তিনি।

সবশেষে নিজেকে তিনি এই বলে সান্ত্বনা দিলেন যে তাঁর একার মহৎ হওয়া বা না হওয়ার ওপর দুনিয়ার ভাল-মন্দ নির্ভর করে না। সবাই যা করছে, তিনিও তাই করছেন।

বিবেককে প্রবোধ দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন নাফাজ মোহাম্মাদ।

আট

রানা এজেন্সী।

আনিসের ঘুম ভাঙল বেশ একটু বেলা করে। বাইরে থেকে রাত চারটের দিকে ফিরেছিল ও, ফিরেই বিছানায় উঠে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু শান্তিতে ঘুমুতে পারেনি, বারবার তন্দ্রা ছুটে গেছে, ঘুমের ভেতর একটা অস্থিরতা অনুভব করেছে। স্টোভে কফির পানি চড়িয়ে দিয়ে শাওয়ার সারল, দাড়ি কামাল, পোশাক পরল—কিন্তু মনের খুঁতখুঁতে ভাবটার কোন কারণ এখনও খুঁজে পাচ্ছে না ও। কফির কাপ হাতে নিয়ে কিচেনের মেঝেতে পায়চারি করছে। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত মনে পড়ে গেল একটা কথা। দৌড়াতে গিয়ে কাপ থেকে ছলকে পড়ল কফি, আরেকটু হলে নষ্ট হত শার্টটা। পিরিচসহ কাপটা কিচেনের দেয়ালে ছুঁড়ে মারল আনিস, ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এসে সোজা ঢুকল অফিস সেকশনে, নিজের চেম্বারে। ঢুকেই দেখল রাইটিং প্যাডের ওপর একটা পেপার ওয়েট চাপা দেয়া রয়েছে। সেটা সরাবার ধৈর্য পর্যন্ত নেই ওর, প্যাডের কিনারা ধরে টান মেরে তুলে নিল চোখের সামনে। ওর লেখা রিপোর্টের নিচে লাল কালিতে স্পষ্ট হস্তাক্ষর, দেখেই চিনতে পারল আনিস, মাসুদ ভাইয়ের হাতের লেখা। একটা মাত্র বাক্যে তাকে সতর্ক করে দিতে চেয়েছে রানা। 'শিরি ফারহানার নিরাপত্তার দিকে লক্ষ রেখো।' ছয়টা শব্দ চোখের সামনে নাচানাচি করছে, নিজের ওপর রাগে ঝাড়া পাঁচ সেকেন্ড দাঁতে দাঁত চেপে পাথরের মত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকল ও। পরমুহূর্তে ছোঁ মেরে তুলে নিল ক্রাডল থেকে ফোনের রিসিভারটা।

একবার, দু'বার, তিনবার ডায়াল করল আনিস নাফাজ ম্যানসনের নাম্বারে, কোন সাড়া নেই। অপরপ্রান্তে রিসিভার তুলছে না কেউ। অসংখ্য ফোন আছে ওদের বাড়িতে, ছয়টা ফোনের নাম্বার জানা আছে তার। এক এক করে প্রত্যেকটি

নাম্বারে ডায়াল করছে আনিস। একই অবস্থা, নাফাজ ম্যানসন থেকে রিসিভার তুলছে না কেউ। রিসিভারটা ক্রাডলে রেখে দিয়ে বোকার মত দশ সেকেন্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল ও। ঘামে ভিজে গেছে কপাল, গলা বেয়ে বুকের লোমের ভেতর দিয়ে সড় সড় করে নামছে কয়েকটা ধারা। আবার রিসিভারটা তুলে নিল ও। ফ্লোরিডা ইনস্, ফাইভ স্টার হোটেল, একটা নির্দিষ্ট নাম্বারে ডায়াল করছে এবার। সাথে সাথে পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল অপরপ্রান্ত থেকে। 'ইয়েস?'

'মাসুদ ভাই,' বলল আনিস, 'আমি আনিস। মারাত্মক ভুল করে ফেলেছি একটা। মনে ছিল না, তাই রাতে ফিরে আপনার নোটটা দেখা হয়নি। হঠাৎ মনে পড়তে…'

আনিসকে বাধা দিয়ে বলল রানা, 'বুঝলাম। কি হয়েছে তাই বলো।'

'নাফাজ ম্যানসনের সব ক'টা নাম্বারে ডায়াল করেও ওদের কারও সাড়া পাচ্ছি না।'

'বলো কি!' দুই সেকেন্ড আর কোন কথা বলতে পারল না রানা। তারপর বলল, 'আমার জন্যে অফিসের নিচে নেমে অপেক্ষা করো, পাঁচ মিনিটের মধ্যে গাড়িতে তুলে নেব তোমাকে।' আনিসের উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে কানেকশন কেটে দিল রানা।

পাঁচ মিনিট নয়, চার মিনিটের মাথায় আনিসের সামনে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে থামল একটা মার্সিডিজ। এক ঝটকায় দরজা খুলে প্রায় লাফিয়ে গাড়িটার ভেতর উঠে পড়ল আনিস। ভাল করে বসতে পারেনি এখনও সে, তীব্র একটা ঝাঁকি দিয়ে আবার ছুটতে শুরু করেছে মার্সিডিজ। ঘাড় ফিরিয়ে একবার মাত্র তাকাল আনিসের দিকে রানা, তারপর ড্রাইভিংয়ের দিকে মন দিল। রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে আনিসের চেহারা। কর্তব্য অবহেলার গ্লানিতে মাথা তুলতে পারছে না। ওদিকে শিরির কি না কি হয়েছে আশঙ্কা করে ভয়ে ঢিপ ঢিপ করছে বুকের ভেতরটা।

'যদি কিছু ঘটে গিয়ে থাকে, সেটাকে মেনে নেয়া উচিত,' মৃদু গলায় বলল রানা। 'নিজেকে দোষ দিলে এখন আর লাভ হবে কিছু? আর সব সাধারণ লোকের মত তুমিও যদি বিপদের সময় ঘাবড়ে যাও, চলবে কেন?' একটু থেমে আবার বলল রানা, 'তাছাড়া এখনও আমরা জানি না সত্যি কোন বিপদ ঘটেছে কিনা। ফোনের কানেকশন অনেক কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে।'

রানা তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, বুঝতে পারছে আনিস। 'মাসুদ ভাই, আপনি কোথাও থেকে গোপন খবর পেয়ে…'

'আরে না। হেকটরের পক্ষে এ ধরনের কাজ সম্ভব বলে মনে হয়েছিল, তাই তোমাকে সাবধান করার চেষ্টা করেছিলাম। যদি কিছু ঘটে গিয়ে থাকে, নিজেকেও অপরাধী মনে হবে আমার। নোটটা লেখার পর তোমার সাথে দেখা হলো আমার, তুমি আমাকে জিজ্ঞেসও করেছিলে, অথচ মুখে উত্তর না দিয়ে নোটটা দেখে নিতে বলেছিলাম তোমাকে। উচিত ছিল তখনই তোমাকে কথাটা বলে দেয়া।'

কিন্তু সাধারণ নিয়মের মধ্যে পড়ে না সেটা, জানে আনিস। বাইরে যত কম কথা বলা যায় ততই ভাল। নোট লিখে রেখে আসার পর মুখে কিছু না বলে সেই সাধারণ নিয়মটাই পালন করেছেন মাসুদ ভাই। আসলে এখন তিনি তাকে

স্বাভাবিক হতে সাহায্য করতে চাইছেন, নিজের ঘাড়ে কিছুটা দোষ চাপিয়ে নিয়ে হালকা করতে চাইছেন তার অপরাধবোধ। এতে আরও জড়সড় হয়ে উঠল আনিস, নিজেকে একটা অপদার্থ ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না তার। রাস্তায় আর কোন কথা হলো না।

নাফাজ ম্যানসন। দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছে ওরা, গেটটা খোলা, হা হা করছে। বাঁক নিয়ে স্যাঁৎ করে ভেতরে ঢুকে পড়ল মার্সিডিজ। সামনেই একটা ভ্যান দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে আঁতকে উঠল আনিস। অ্যাক্সিডেন্ট···! আনিসের চিন্তা শেষ হবার আগেই মোজাইক করা রাস্তাটা থেকে পাশের ঘাস-জমির ওপর নামিয়ে ফেলেছে গাড়িটাকে রানা। সাথে সাথে তীব্র একটা ঝাঁকি খেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মার্সিডিজ। 'সেন্ট্রিবক্সে পড়ে আছে একজন,' বলেই নিজের দিকের দরজা খুলে চোখের পলকে নেমে পড়ল রানা। 'খালি হাতে ঢুকো না ওখানে।'

শোল্ডার হোলস্টার থেকে রিভলভারটা বের করে ছুটল আনিস গেটের দিকে। পেছন ফিরে একবার তাকাল সে। দেখল, একহাতে রিভলভার নিয়ে 'পিওর মিল্ক সাপ্লাই কোং' লেখা ভ্যানের দরজার হাতল ধরে হ্যাঁচকা টান মারছে রানা।

ড্রাইভিং সীটে কাউকে দেখছে না রানা। ভ্যানের পেছন দিকে চলে এল ও। সাজানো বোতলের আড়াল থেকে অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য গোঙানির আওয়াজ আসছে। লাফ দিয়ে ওপরে উঠল ও। বোতলগুলো টপকে একটু এগোতেই দু'জন লোককে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেল, দু'জনেরই মুখে টেপ লাগানো রয়েছে।

জুতোর লুকানো খোপ থেকে ছোট্ট একটা ছুরি বের করে বাঁধনগুলো কেটে দিল রানা। টেপের আঠা মুখের সাথে শক্তভাবে সেঁটে আছে, খুলতে একটু সময় লাগল। ড্রাইভার বা তার সহকারী, দু'জনের কারও কাছ থেকেই কোন তথ্য পাওয়া গেল না। কালো মুখোশ পরা দু'জন লোকের কথা বলল ওরা, দু'জনের হাতেই পিস্তল ছিল। বাড়ি বাড়ি দুধ পৌঁছে দিতে এমনিতেই অস্বাভাবিক দেরি হয়ে গেছে, ঝামেলা-মুক্ত হয়ে কোনমতে পালাতে পারলে বাঁচে এখন তারা। ওদেরকে আটকে রাখার কোন যৌক্তিকতা দেখল না রানা। কিন্তু স্টার্ট দিতে গিয়ে দেখা গেল ভ্যান নড়ে না। অগত্যা পায়ে হেঁটে রওনা হয়ে গেল তারা, আরেকটা ভ্যান নিয়ে ফিরে আসবে।

মোজাইক করা পথটা ধরে এগোচ্ছে রানা, পেছন থেকে হন হন করে হেঁটে পাশে চলে এল আনিস। 'দারোয়ান বলছে, প্রথমে দু'জন কালো মুখোশ পরা লোক ঢোকে, তারপর একটা স্টেশন ওয়াগন। এর বেশি কিছু দেখেনি সে।'

সামনের বাঁকটা ঘুরছে ওরা। 'ভ্যানের লোকেরাও কিছু বলতে পারল না,' বলল রানা। বাগানের দিকে চোখ পড়তেই একটা ঝোপ নড়ছে দেখতে পেল ও। হাত তুলে সেদিকটা দেখাল আনিসকে। 'দেখে এসো তো।'

হলরুমে ঢুকে আয়েদ আবদালীকে দেখতে পেল রানা। বেশ আয়েশের সাথে বসে আছে একটা আরাম কেদারায়। রানাকে চেনে না, কিন্তু মুখে মুখোশ নেই দেখে ধরে নিল হ্যাইজ্যাকারদের কেউ নয় ও। কথা বলতে পারছে না, কিন্তু চোখে ফুটে উঠল সম্ভ্রমসূচক দৃষ্টি। কিন্তু হাত-পায়ের বাঁধন কেটে, মুখের টেপ খুলে দিতেও সাথে সাথে বুলি ফুটল না তার মুখে।

'রেডিও অপারেটরের নাম কি?' প্রশ্ন করল রানা। 'কোথায় থাকে সে?'

উঠে দাঁড়িয়েছে আয়েদ আবদালী। হঠাৎ সে থর থর করে কাঁপতে শুরু করে দিল। 'স্যার···স্যার, মিস শিরিকে ওরা কিডন্যাপ···'

ধমকে উঠল রানা। 'কানে কম শোনো নাকি? রেডিও অপারেটর কোথায় থাকে?'

'একরাম লোয়াঙ্গো পেছনের দালানে, দোতলার দক্ষিণ কোণের কামরায়···'

হলরুম থেকে দ্রুত বেরিয়ে এল রানা।

একরাম লোয়াঙ্গো সুদর্শন যুবক, ইলেকট্রিকাল এঞ্জিনিয়ারিঙে গ্রাজুয়েট সে। সদ্য বাঁধন মুক্ত হয়ে হাত-পা মেসেজ করছে। রক্ত চলাচল শুরু হতে ব্যথায় কুঁচকে উঠছে মুখটা।

'সেট অপারেট করতে পারবে?' প্রথমেই জানতে চাইল রানা।

'পারব,' বলল একরাম লোয়াঙ্গো। 'আপনি?'

'আনিস আহমেদের সাথে এসেছি,' সংক্ষেপে উত্তর দিল রানা। 'কিডন্যাপার-দের চেহারার বর্ণনা দিতে পারবে?'

'মোটামুটি পারব···' চোখ কপালে উঠে গেল একরাম লোয়াঙ্গোর। 'কিডন্যাপার?'

'শিরি ফারহানা কিডন্যাপ হয়েছে।'

কয়েক সেকেন্ড স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকল লোয়াঙ্গো। তারপর গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আমেরিকার ওপর এবার নরক ভেঙে পড়বে রে বাবা! মি. নাফাজকে ঠেকানো যাবে না।'

ওদিকে বুড়ো মালীকে ঝোপের ভেতর থেকে উদ্ধার করে বাড়ির অন্দর মহলে চলে এসেছে আনিস। শিরি ফারহানার কামরায় ঢুকে চারদিকে দ্রুত একবার নজর বুলিয়ে নিল ও। তাড়াহুড়োর সাথে বেরিয়ে গেছে শিরি, কামরার অগোছাল চেহারা দেখেই বুঝতে পারছে। আলমিরার দরজা খোলা, দেরাজগুলো টেনে বের করা হয়েছে কিন্তু ঠেলে ভেতরে ঢোকানো হয়নি, মেঝেতে স্তূপ হয়ে রয়েছে কাপড়চোপড়। এসব জিনিস ঘাঁটাঘাঁটি করার কোন উৎসাহ নেই আনিসের। শিরির বেডসাইড টেবিলের দেরাজগুলো চেক করতে শুরু করল সে। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই যা খুঁজছে পেয়ে গেল। একটা আমেরিকান পাসপোর্ট। খুলে দেখল এখনও ভ্যালিড রয়েছে সেটা।

একরাম লোয়াঙ্গোকে নিয়ে রেডিওরুমে চলে এসেছে রানা। তালা খুলে ভেতরে ঢুকল ওরা। প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল লোয়াঙ্গো রানার দিকে।

'কাউন্টি পুলিস চীফ,' বলল রানা, 'উইলিয়াম সালজ্। অন্য কারও সাথে কথা বলব না। প্রথমেই জানিয়ে দেবে, নাফাজ মোহাম্মদের তরফ থেকে কথা বলছ তুমি। যাদুর মত কাজ হবে। তারপর আমাকে কথা বলতে দিয়ো।'

একরাম লোয়াঙ্গো যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে, এই সময় রেডিওরুমে ঢুকল আনিস। 'শিরির পাসপোর্টটা রেখে গেছে ওরা মাসুদ ভাই।'

মুখ তুলে তাকাল একরাম লোয়াঙ্গো। 'লাইন পাওয়া গেছে, স্যার,' ইঙ্গিতে আরেক সেট ফোন দেখাল রানাকে।

কিন্তু একরামের হাতের রিসিভারটাই ছোঁ মেরে নিয়ে নিল রানা। 'চীফ অব পুলিস সালজ্?'

'স্পিকিং।'

'অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনুন, প্লীজ। এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর জরুরী কেস আপনার জীবনে আসেনি, বোধহয় ভবিষ্যতেও আসবে না। আপনি একা?'

'হ্যাঁ। এটা আমার কন্ট্রোল রুম, আমি একাই আছি। কি ব্যাপার? কে বলছেন আপনি?' সালজের গলায় অদ্ভুতভাবে মিশে রয়েছে সন্দেহ আর আগ্রহের সুর।

'অন্য কোন রিসিভার নেই তো? কোন রেকর্ডার?'

'না,' বিরক্ত নয়, অধৈর্য হয়ে উঠছে পুলিস চীফ সালজ্, 'আসল কথাটা পাড়ুন এবার।'

'আমরা মি. নাফাজ মোহাম্মদের বাড়ি থেকে কথা বলছি,' বলল রানা। 'ভদ্রলোককে চেনেন?'

'কি আশ্চর্য! এটা একটা প্রশ্ন হলো?' রেগেমেগে জানতে চাইল পুলিস চীফ। কিন্তু যোগাযোগটা নাফাজ মোহাম্মদের বাড়ি থেকে করা হচ্ছে, কথাটা মনে পড়ে যেতেই নিজেকে সংযত করে নিল সে। 'আপনি কে বলছেন?'

'রানা এজেন্সী। ফ্লোরিডা ব্রাঞ্চের চীফ,' নিজের পরিচয় দিল না রানা, 'আনিস আহমেদ।'

'তাই বলুন,' কিছুটা সমীহ, কিছুটা বিস্ময়ের সাথে অপরপ্রান্তে চিৎকার করে উঠল পুলিস চীফ সালজ্। 'আপনাদের নাম শুনেছি বহুবার। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে আমাদের সরকারকে সাহায্য করে থাকেন আপনারা, তাই না?'

'এখনকার গল্প সেটা নয়,' বলল রানা। 'শুনুন। মি. নাফাজ মোহাম্মদের মেয়ে শিরি ফারহানা...'

রানাকে মাঝপথে বাধা দিয়ে উদ্বেগের সাথে জানতে চাইল পুলিস চীফ, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ—কি হয়েছে মিস শিরির?'

'তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।'

'মার্সিফুল গড ইন হেভেন।' আতঙ্কে, অবিশ্বাসে বিকৃত শোনাল পুলিস চীফের কণ্ঠস্বর। তারপর একেবারে বোবা বনে গেল সে। কোন সাড়া নেই।

'হ্যাঁ,' বলল রানা, 'যা ভাবছেন তাই। এ-ধরনের সুযোগ জীবনে আর কখনও পাবেন কিনা সন্দেহ। যদি কাজ দেখাতে পারেন, ট্রিপল প্রমোশন ঠেকায় কে। উপরি পাওনা আরও কত কি তো আছেই।'

মনের ভাবটা রানা ধরে ফেলেছে বুঝতে পেরে এমন গম্ভীর সুরে প্রশ্ন করল চীফ অভ পুলিস, যেন রানার কথা শুনতেই পায়নি। 'কিডন্যাপ হয়েছে, বলছেন?'

'বলছি।'

'কোন সন্দেহ নেই? আপনি শিওর?'

ধৈর্য ধরে উত্তর দিল রানা, 'হ্যাঁ, শিওর।'

'সব্বোনাশ!'

'এতক্ষণে বুঝেছেন তাহলে?' দ্রুত কথা বলতে শুরু করল এবার রানা, 'এস্কেপ রুটগুলোয় রোডব্লকের ব্যবস্থা করুন। একটা স্টেশন ওয়াগন নিয়ে

এসেছিল ওরা। মিস শিরির পাসপোর্ট নিয়ে যায়নি, তার মানে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটের ওপর নজর রাখার দরকার নেই। ওকে নিয়ে কিডন্যাপাররা কোন কমার্শিয়াল ইন্টারন্যাল ফ্লাইট ধরার চেষ্টা করবে বলেও আমি মনে করি না। লোকের ভিড়ে গিজ গিজ করছে টার্মিনালগুলো, মি. নাফাজের মেয়েকে দেখামাত্র চিনে ফেলবে অনেকে। আমার পরামর্শ, রাজ্যের দক্ষিণ অংশে যত প্রাইভেট এয়ারপোর্ট আর হেলিপোর্ট আছে সবগুলোয় স্টপ অর্ডার পাঠান। এই একই পরামর্শ দেব রাজ্যের ওই অংশের সমস্ত বন্দরগুলো সম্পর্কেও, সেগুলো ছোট হোক আর বড় হোক।'

গলার আওয়াজেই বোঝা যাচ্ছে হতভম্ব হয়ে গেছে পুলিস চীফ সালজ্। 'তাতে যে হাজার হাজার পুলিস নামাতে হবে।'

'দেখুন,' কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব সংযত রেখে বলল রানা, 'মি. সালজ, আমরা আপনার মেয়ে সম্পর্কে আলোচনা করছি না। আমরা মি. নাফাজ মোহাম্মদের মেয়ে সম্পর্কে আলোচনা করছি। দরকার মনে করলে আপনি ন্যাশনাল গার্ডকেও ডাকতে পারেন। এই কোর্সের পয়লা সবক-ই দেখছি মুখস্থ করেননি আপনি—পাস করবেন কিভাবে? নাফাজ মোহাম্মদ দুনিয়ার পাঁচ সেরা ধনীর এক ধনী। মিস শিরি তাঁর একমাত্র মেয়ে। এই দুটো পড়া মনে রাখতে পারলে কিভাবে কি করতে হবে তা বুঝে নিতে অসুবিধে হবে না আপনার।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। বুঝেছি আমি। আপনি ঠিকই বলেছেন...'

'এত কথা আপনার ভালর জন্যেই বলছি, চীফ,' বলল রানা। 'নাফাজ মোহাম্মদের এই উপকারটা কেউ যদি করে দেয়, এই একটার বিনিময়ে তিনি তার এক হাজার উপকার করে দেবেন, এটুকু বোঝার ক্ষমতা আপনার থাকা উচিত।'

'আমাকে আপনি ভুল বুঝবেন না, মি. আহমেদ,' প্রায় কাতর কণ্ঠে বলল পুলিস চীফ সালজ্। লোকটা যে জিভ দিয়ে নিজের ঠোঁট ভিজিয়ে নিচ্ছে, কল্পনার চোখে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। 'চেহারার বর্ণনা দিতে পারেন, মি. আহমেদ?'

'না,' বলল রানা। 'ওরা সবাই মুখোশ পরে এসেছিল। লীডারের হাতে দস্তানা ছিল, কিন্তু তাতে কিছু বোঝা যায় না। তার ক্রিমিনাল রেকর্ড থাকতেও পারে, নাও পারে। সবাই শক্ত-সমর্থ, বিশালদেহী। গাঢ় রঙের বিজনেস স্যুট পরে ছিল। মেয়েটার বর্ণনা দেবার নিশ্চয়ই দরকার নেই?'

'মিস ফারহানার? গুড হেভেনস্, নো। প্রশ্নই ওঠে না। মিস ফারহানার চেয়ে বেশি ফটো এ-দেশে আর কার তোলা হয়েছে?'

'গোটা ব্যাপারটা আপাতত চেপে রাখতে হবে,' বলল রানা। 'কথা দিতে পারেন?'

'নিশ্চয় কথা দিতে পারি, একশো বার কথা দিতে পারি,' বলল পুলিস চীফ। 'মানে, যতটা আর যতক্ষণ চেপে রাখা সম্ভব আর কি। বোঝেনই তো...'

'বুঝি,' বলল রানা। 'আমরা চাইছি যার মেয়ে তার কানে খবরটা আগে পৌঁছাক, তারপর আর সবাই জানল কি না জানল তাতে কিছু এসে যায় না।'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন মি. নাফাজ এখনও খবর পাননি?' নিজের সৌভাগ্যকে যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না পুলিস চীফ।

'না, পাননি,' বলল রানা। 'খবরটা দেবার সময় আপনার কথাও তাঁকে বলব আমি।'

'তাঁকে বলবেন, তিনি যেন কোন রকম দুশ্চিন্তা না করেন। সব দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিচ্ছি আমি। বলবেন...'

'আপনার ওপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস আর আস্থা রাখতে বলব, এই তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'নিশ্চিন্তে থাকুন আপনি।'

'এবার, স্থানীয় পুলিস সম্পর্কে...'

'নিয়ম আছে, তাই ওদেরকে খবর না দিয়ে উপায় নেই,' বলল রানা। 'কিন্তু ওদের ওপর একটুও আস্থা নেই আমার।'

'আপনি শুধু স্থানীয় চীফকে, সে যেই হোক, আমার সাথে যোগাযোগ করতে বলুন,' কঠিন সুরে বলল পুলিস চীফ। 'তার কানে কিভাবে তরল লোহা ঢালতে হয় জানা আছে আমার।' একটু থেমে জানতে চাইল সে, 'ভাল কথা, ব্যাপারটা আর কারও কানে গেছে নাকি?'

'প্রশ্নই ওঠে না,' বলল রানা। 'এস্কেপ রুট বন্ধ করার হুকুম দেবার একমাত্র মালিক আপনি, তাই আমরা সবার আগে আপনার সাথেই যোগাযোগ করেছি।'

'বেশ করেছেন, ঠিক কাজ করেছেন,' সন্তোষ প্রকাশ করল পুলিস চীফ। 'এই মুহূর্ত থেকে কাজ শুরু করে দিচ্ছি আমি। যখনই নতুন কোন খবর পাব, সাথে সাথে জানাব আপনাকে। আপনিও কোন খবর পেলে আমাকে জানাবেন, কেমন?'

'ঠিক আছে, চীফ।' যোগাযোগ কেটে দিল রানা। তাকাল পাশে দাঁড়ানো আনিসের দিকে, জানতে চাইল, 'কেউ আহত হয়েছে নাকি?'

'না,' বলল আনিস। 'হেড বাটলার ওদের সবার রশি কেটে দিচ্ছে। সবাই একটু সুস্থ বোধ করুক, তারপর ওদেরকে জেরা করব আমি। বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।'

'তার আগে মি. নাফাজকে খবর দাও।'

'আমি?' ছোট্ট একটা ঢোক গিলল আনিস।

'ভয়ের কি আছে?' বলল রানা। 'আগের সেদিন নেই, আজকাল আর ভগ্নদূতের গলা কাটা হয় না।'

ম্লান, করুণ চেহারা নিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছে আনিস, মৃদু হেসে বলল রানা, 'আচ্ছা ঠিক আছে, আমিই দিচ্ছি খবরটা।'

অপ্রীতিকর দায়িত্বটা থেকে মুক্ত হয়ে দ্রুত রেডিওরূম থেকে বেরিয়ে গেল আনিস।

'মি. নাফাজের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দাও, একরাম,' বলল রানা।

'কোথায় আছেন তিনি তাই জানি না। রেডিওরূম থেকে কাল রাতে বেরিয়ে যাবার সময় এখানেই তাঁকে দেখে গিয়েছিলাম। তারপর...'

তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল রানা, 'তিনি সাগর কন্যায় আছেন।'

একরাম লোয়াঙ্গোর একটা ভুরু কপালে উঠে গেল, তারপর ধীরে ধীরে নেমে এল সেটা। কথা না বলে মনোযোগ দিল সুইচ বোর্ডের দিকে। পনেরো সেকেন্ডের

মধ্যে যোগাযোগ করে ফেলল সাগর কন্যার সাথে। তার হাত থেকে ফোনটা নিল রানা।

'মি. নাফাজ, প্লীজ,' বলল রানা।

'এক সেকেন্ড ধরুন।'

বিশ সেকেন্ড পর আরেকটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। কর্কশ, গম্ভীর। 'কে? কি চান?'

'মি. নাফাজকে বলব,' বলল রানা। 'তাকে ডেকে দিন।'

'তিনি এখানে আছেন তা আপনি জানলেন কিভাবে?'

'তা জেনে আপনার কি দরকার?' গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা। 'যা বলছি করুন, মি. নাফাজকে ডেকে দিন।'

রানার গলায় কর্তৃত্বের সুর লক্ষ করে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল অপরপ্রান্তে লোকটা। তারপর আরও গাম্ভীর্যের সাথে বলল, 'দেখুন মিস্টার, মি. নাফাজ মোহাম্মদের প্রাইভেসী রক্ষা করার জন্যে এখানে আছি আমি। অনেক আজেবাজে লোক তাঁকে বিরক্ত করতে চেষ্টা করে, তাই সরাসরি তিনি কারও সাথে কথা বলেন না। আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যদি সন্তুষ্ট করতে পারেন, তখন বিবেচনা করে দেখা যাবে আপনার জন্যে কি করা যায়। তিনি এখানে আছেন তা আপনি জানলেন কোত্থেকে?'

'তিনিই আমাদেরকে জানিয়েছেন।'

'কখন?'

'গতরাতে। মাঝরাতের দিকে।'

'আপনার নাম?'

'আমি রানা এজেন্সীর প্রতিনিধি।'

'মাই গড! স্যার, আপনি আনিস আহমেদ কথা বলছেন?' মনিব নাফাজ মোহাম্মদের হবু জামাইকে স্যার বলতে এখন থেকেই অভ্যস্ত হয়ে নিচ্ছে কমান্ডার লিল হাম্মাম। জানে, কোন একদিন জামাইয়ের হাতে ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে অবসর নেবেন নাফাজ মোহাম্মদ।

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল রানা, 'আপনি নিশ্চয়ই কমান্ডার লিল হাম্মাম?'

'ইয়েস, স্যার। আপনি যদি প্রথমেই নিজের পরিচয়টা দিতেন...'

'এ-ধরনের গেস্টাপো ইনভেস্টিগেশন শুরু হয়ে যাবে তা ভাবিনি। যাই হোক, আপনার আচরণে সুখী হতে পারলাম না।'

'স্যার, আমার দায়িত্বটা কঠিন, এটুকু অন্তত বোঝার চেষ্টা করুন...'

'মি. নাফাজকে ডেকে দিন।'

'তিনি তো সাগর কন্যায় নেই, স্যার।'

'তিনি আমাকে মিথ্যে কথা বলতে পারেন না,' বলল রানা। নাফাজ মোহাম্মদকে হেলিকপ্টারে চড়ে রওনা হতে দেখেছে, সে-কথাটা কমান্ডারকে বলতে চাইছে না ও। শুনে যার মাথা ঘুরে উঠবে তাকেই বলবে বলে ঠিক করে রেখেছে।

'তিনি আপনাকে মিথ্যে কথা বলেননি,' বলল কমান্ডার লিল হাম্মাম। 'এখানে

এসেছিলেন, কিন্তু কয়েক ঘণ্টা আগে ওয়াশিংটনের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছেন।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে পরিস্থিতিটা দ্রুত আঁচ করে নিচ্ছে রানা। তারপর বলল, 'প্রয়োজন হলে যোগাযোগ করার জন্যে কোন ফোন নাম্বার রেখে গেছেন?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'ব্যাপারটা জরুরী; ব্যক্তিগত। আপনাকেও জানানো চলে, কিন্তু তা জানাবার আগে মি. নাফাজের অনুমতি নিতে হবে আমাকে। নাম্বারটা দিন।'

একটু ইতস্তত করে নাম্বারটা জানিয়ে দিল কমান্ডার।

রিসিভার নামিয়ে রেখে অপারেটর একরাম লোয়াঙ্গোর দিকে ফিরল রানা। 'মি. নাফাজ সাগর কন্যা থেকে ওয়াশিংটনের দিকে রওনা হয়েছেন। নিশ্চয়ই নিজের বোয়িঙে রয়েছেন এই মুহূর্তে তিনি। পারবে যোগাযোগ করতে?'

চিন্তিত দেখাচ্ছে একরামকে। জানতে চাইল, 'কতক্ষণ আগে সাগর কন্যা ত্যাগ করেছেন তিনি?'

'কমান্ডারকে জিজ্ঞেস করিনি। বলল, কয়েক ঘণ্টা আগে।'

আরও ম্লান হয়ে গেল একরামের চেহারা। 'কোন আশা দিতে পারছি না আপনাকে, মি. রানা। আমার এই সেটের সাহায্যে কয়েক হাজার মাইল দূরে পৌঁছুতে পারি আমি। তার মানে মি. নাফাজের বোয়িং হয়তো আমাদের সেটের রেঞ্জের মধ্যেই আছে। কিন্তু বোয়িংটার রিসিভিং ইকুইপমেন্টগুলোকে এই সেটের লং-রেঞ্জ ট্রান্সমিশন রিসিভ করার উপযোগী করে গড়ে নেয়া হয়নি। এটা একটা অসাধারণ সেট, মি. রানা। এর ট্রান্সমিশন রিসিভ করতে হলে বিশেষ ধরনের রিসিভিং ইকুইপমেন্ট দরকার। তবে পাঁচশো মাইলের মধ্যে থাকলে বোয়িংটা এই সেটের ট্রান্সমিশন রিসিভ করতে পারে। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা আগে রওনা হয়ে গিয়ে থাকলে পাঁচশো মাইল ছাড়িয়ে আরও অনেক দূরে চলে গেছে সেটা।'

'তবু চেষ্টা করো, একরাম।'

মাথা কাত করে সম্মতি জানাল একরাম। একনাগাড়ে পাঁচ মিনিট ব্যর্থ চেষ্টার পর হাল ছেড়ে দিল সে।

রানা এক টুকরো কাগজ দিল তাকে। বলল, 'এই নাম্বারটা পাও কিনা দেখো। ওয়াশিংটন। পারবে বলে মনে করো?'

'এ-ব্যাপারে আমি গ্যারান্টি দিতে পারি, স্যার।'

'আধ ঘণ্টা পর চেষ্টা করো,' বলল রানা। 'নাফাজ মোহাম্মদকে চাইবে। বলবে, সাংঘাতিক জরুরী ব্যাপার। দরকার মনে করলে দুঃসংবাদটা জানিয়ে দেবে। যোগাযোগ করতে না পারলে বিশ মিনিট পর পর চেষ্টা করতে থাকো। স্টাডিরুমে ডাইরেক্ট লাইন আছে?'

'আছে, স্যার।'

'ওখানে আছি আমি। পুলিসকে বিফ্রিং করতে হবে।'

বোয়িংটা এখন তেত্রিশ হাজার ফিট উপর থেকে ডালাস এয়ারপোর্টে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে। নাফাজ মোহাম্মদ ঘুমাচ্ছেন এখনও। তাঁর সুখের সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ছে,

কিন্তু সে-ব্যাপারে কিছুই এখনও জানেন না তিনি।

নয়

ওয়াশিংটন। স্টেট ডিপার্টমেন্ট।

অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেমস পাওয়েলের সুসজ্জিত অফিস কামরা। এক হাতে স্কচ হুইস্কির সরু লম্বা গ্লাস, আরেক হাতে টোবাকো পাইপ নিয়ে আরামকেদারার গভীরে ডুবে বসে আছেন নাফাজ মোহাম্মদ। স্টেট ডিপার্টমেন্ট তাঁকে যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা জানাতে কার্পণ্য করেনি। কিন্তু এরা তাঁর সাথে কি ধরনের আচরণ করতে যাচ্ছে তা এরই মধ্যে টের পেয়ে গেছেন তিনি। মুখের বাদামী রঙ প্রায় টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। কামরায় চারজন হাই অফিশিয়াল উপস্থিত রয়েছে, কথা বলার সময় কটমট করে এর তার দিকে তাকাচ্ছেন তিনি।

ছয় ফিট লম্বা, একহারা, তীক্ষ্ণ চেহারার অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেমস পাওয়েল স্টীল রিমের চশমা পরে রয়েছেন। মুখে কোন ভাঁজ নেই, কিন্তু চোখে অস্বস্তির ছায়া। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ইয়েল ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ছিলেন তিনি। পাশে বসে আছে তাঁর পার্সোনাল সেক্রেটারি। এর নাম জানেন না নাফাজ মোহাম্মদ। জানার কোন দরকার আছে বলেও মনে করছেন না। একেবারে প্রথম সারির কর্তা ব্যক্তিদের সাথে পরিচিত হতেই পছন্দ করেন তিনি। কামরায় উপস্থিত তৃতীয় ব্যক্তি লেফটেন্যান্ট জেনারেল এডওয়ার্ড জিগলার। নাকটা ছোটখাট একটা পিরামিডের মত। প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে তিনজন বসার সোফাটার প্রায় সবটুকু জায়গা একাই দখল করে নিয়েছেন তিনি। তাঁর চেহারার প্রতিটি ইঙ্গিতে লেখা আছে তিনি একজন জাঁদরেল জেনারেল বটে। কামরায় আর একজন রয়েছে, মধ্য বয়স্কা স্টেনোগ্রাফার, যখন মর্জি ওদের কথোপকথন নোট করছে সে, বেশির ভাগ সময় হাত গুটিয়ে বসে থাকছে।

'আমাকে ভুল বোঝার ভান করে কোন লাভ হবে না, পাওয়েল,' দ্রুত কথা বলছেন নাফাজ মোহাম্মদ। কণ্ঠস্বরে তিক্ততার বিস্ফোরণ। 'গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে দুশ্চিন্তায় ছটফট করছি আমি। কোন উপায় না দেখে গালফ অভ মেক্সিকো থেকে এইমাত্র এখানে এসে পৌঁছেচি। এরই মধ্যে পঁচিশটা মিনিট পেরিয়ে গেছে, অথচ কাজের কাজ কিছুই হয়নি। দেখো, আমার সময় তোমাদের মতই মূল্যবান···ভুল হলো, তোমাদের চেয়ে বেশি মূল্যবান। আমার ব্যাপারে কিছু যদি করতে না চাও, প্রথমেই পরিষ্কার করে সেটা বলে দিতে পারতে। যাই হোক, বিদায় নেবার আগে আমি জানতে চাই, আমার প্রতি তোমাদের এই অবহেলা কি কারণে?'

'কোন্ যুক্তিতে এটাকে আপনি অবহেলা বলছেন?' বিস্মিত হয়ে জানতে চাইল পাওয়েল। 'আপনি আমার খাস কামরায় বসে আছেন। জেনারেল জিগলার আপনার কথা শোনার জন্যে তাঁর জরুরী কাজ ফেলে এখানে চলে এসেছেন। এ-ধরনের মনোযোগ আমেরিকার কয়জন নাগরিকের কপালে জোটে?'

'আমি তোমাকে তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে সাবধান করে দিচ্ছি, পাওয়েল,' সংযত কণ্ঠে বললেন নাফাজ মোহাম্মদ, 'আমাকে আর সব সাধারণ মার্কিন নাগরিকের সারিতে ফেলে বিচার করলে তোমার বিরুদ্ধে মানহানির কেস করা যায় কিনা সে-ব্যাপারে আমার আইন উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শ করতে বাধ্য হব আমি। যেভাবে অভ্যর্থনা করেছ আমাকে, যে-কোন মার্কিন নাগরিকের জন্যে হয়তো তা দুষ্প্রাপ্য—কিন্তু আমার জন্যে নয়। একেবারে ওপরের কর্তা ব্যক্তিদের সাথে ওঠাবসা করতে অভ্যস্ত আমি, তোমাদের অসহযোগিতার জন্যে এখনও তাদের কানে পৌঁছুতে পারিনি বটে, কিন্তু কথা দিচ্ছি, অবশ্যই পৌঁছাব। ঠাণ্ডা হিম ভাব দেখিয়ে, কূটনীতির নোংরা কৌশল খাটিয়ে আমাকে তোমরা হতাশ করতে পারবে না। সশরীরে এখানে আসার আগেই তোমাকে আমি জানিয়েছি যে আমার সাগর কন্যা আন্তর্জাতিক হুমকির সম্মুখীন হয়েছে, কিন্তু তুমি হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করোনি, নয়তো আমাকে অগ্রাহ্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছ। হুমকিটা যে কাল্পনিক নয় তার আরও কিছু প্রমাণ নিয়ে এখন আমি তোমার সাথে নিজেই দেখা করতে এসেছি। একটা নয়, দুটো নয়, তিন তিনটে যুদ্ধ-জাহাজ সাগর কন্যার দিকে ছুটে আসছে, এ কথা জানার পরও টনক নড়ছে না তোমার, এর বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেবার কোন ইচ্ছে এখনও তুমি প্রকাশ করছ না। প্রসঙ্গক্রমে বলছি, দুই বিদেশী রাষ্ট্রের এই যুদ্ধ-জাহাজগুলোর গতিবিধি সম্পর্কে এখনও যদি নিজস্ব উৎস থেকে কোন খবর তোমরা না পেয়ে থাকো—আমার পরামর্শ, নিজেদের জন্যে নতুন একটা ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের ব্যবস্থা করো তোমরা।'

'ওদের গতিবিধির ওপর নজর আছে আমাদের,' ভরাট গলায় বললেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল এডওয়ার্ড জিগলার। কিন্তু অ্যাকশন নেবার মত কোন কারণ ঘটেনি এখনও। আপনি কোন প্রমাণ দাখিল করতে পারছেন না। ওগুলো আপনার সন্দেহ, এর বেশি কিছু নয়। একজন নাগরিকের সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে আমরা আমাদের ন্যাভাল ইউনিট আর ফাইটার বোম্বার স্কোয়াড্রনকে সতর্ক করে দিতে পারি না। আমরা অ্যাকশন নেবার পর যদি প্রমাণিত হয় যে আসলে ব্যাপারটা কিছু নয়, তখন অবস্থাটা কি দাঁড়াবে ভাবতে পারেন? কংগ্রেসকে কি জবাব দেব আমরা? মাথা পেতে নিন্দা তো যা নেবার নিতেই হবে, ব্যঙ্গ আর হাসির খোরাক হতে হবে স্টেট ডিপার্টমেন্টকে। জেনে-শুনে এতবড় বোকামি কেন করতে যাব আমরা?'

উত্তর দিতে এক সেকেন্ড দেরি করলেন না নাফাজ মোহাম্মদ, 'পাওয়েলের মত আপনিও একই ভুল করছেন, জেনারেল। আমাকে শুধু একজন নাগরিক হিসেবে দেখছেন আপনারা। ভুলে যাচ্ছেন, আমি একজন দায়িত্ব-সচেতন মানুষ, ভিত্তিহীন সন্দেহে অস্থির হবার লোক নই। ভুলে যাচ্ছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত তেল ব্যবসায়ী বছরে যত ট্যাক্স দেয়, আমি একা তার চেয়ে অনেক বেশি ট্যাক্স দিই। ভুলে যাচ্ছেন, সরকারকে আমি যত সস্তায় তেল দিই, আর কারও পক্ষে অত সস্তায় তেল বিক্রি করা সম্ভব নয়। ভুলে যাচ্ছেন, আপনাদের যারা বস্, তাদের বসের সাথে ওঠাবসা করি আমি, তারা আমার মুখের কথাকেই যথেষ্ট জ্ঞান করে থাকেন, প্রমাণ চেয়ে আমাকে অপমান করেন না।' একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সোফার হাতলে

শরীরের ভার চাপালেন তিনি। মৃদু হাসির রেখা দেখা যাচ্ছে তাঁর ঠোঁটে। ভুরু কুঁচকে উঠল লেফটেন্যান্ট জেনারেল জিগলারের। একটু সন্দেহের ছায়া পড়ল পাওয়েলের চোখে।

'বেশ,' বললেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'ধরে নিচ্ছি আমার ব্যাপারে কিছুই করার নেই তোমার, পাওয়েল। কিন্তু তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে নিজেকে রক্ষা করার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। নিজের ব্যবস্থা নিজেই করব আমি। এখান থেকে বেরিয়ে আমার প্রথম কাজ হবে একটা সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা।'

'সাংবাদিক সম্মেলন?' জেমস পাওয়েল প্রায় আঁতকে উঠল। 'কেন? কেন, মি. নাফাজ?'

'ভয় পেয়ো না,' আশ্বাস দিয়ে বললেন নাফাজ মোহাম্মদ, 'মিথ্যে কোন বিবৃতি দেব না আমি। তোমাদেরকে আমি যা বলেছি আর তার উত্তরে তোমরা আমাকে যা বলেছ, সাংবাদিকরা শুধু তাই জানবে।'

'অসম্ভব!' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে পাওয়েল। 'মি. নাফাজ, আপনাকে আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, এই বৈঠকে যা কিছু বলা হয়েছে তার প্রতিটি শব্দ কনফিডেন-শিয়াল। একান্ত গোপনীয়।'

হাসছেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'সরকারের সিনিয়র মেম্বার না হয়ে কমেডিয়ান হওয়া উচিত ছিল তোমার, পাওয়েল। আগে যে-কথা বলোইনি, সে-কথা আবার আমাকে স্মরণ করিয়ে দাও কিভাবে হে?' হাসিটা মুখ থেকে মুছে ফেলে আবার তিনি বললেন, 'সাংবাদিকদেরকে এ-কথাটাও বলব, স্টেট ডিপার্টমেন্ট আমার মুখে তালা মারতে চেয়েছে। কাল সকালের সব দৈনিক পত্রিকার হেডিংটা কি হবে, বুঝতে পারছ তো?'

পাওয়েল চুপ করে আছে। হাত দুটো নিজের অজান্তেই শক্ত মুঠো পাকিয়ে গেছে তার।

'সাংবাদিক সম্মেলন শেষ করার পর,' আবার বললেন নাফাজ মোহাম্মদ, 'আমার সমস্যা ব্যাখ্যা করার জন্যে রেডিও আর টিভির কয়েক ঘণ্টা সময় কিনব আমি···ভুল হলো, আমার নিজেরই একাধিক রেডিও আর টিভি স্টেশন আছে; ওখান থেকে যা ব্রডকাস্ট হবে, জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলো সাথে সাথে লুফে নেবে। ইন্টারন্যাশনাল ইস্যু হয়ে দাঁড়াবে আমার সমস্যাটা। এতটা পরিশ্রম করতে চাই না আমি, কিন্তু উপায় কি! দেড়শো মিলিয়ন ডলার মূল্যের সাগর কন্যাকে রক্ষা করতে অস্বীকার করায় স্টেট ডিপার্টমেন্টের বিরুদ্ধে অযোগ্যতা, কুঁড়েমি, পক্ষপাতিত্ব, ইত্যাদি অভিযোগ আমার তরফ থেকে নয়, সংবাদপত্র আর সাধারণ নাগরিকদের তরফ থেকেই তোলা হবে।' একটু থেমে নাফাজ মোহাম্মদ গলার আওয়াজ গম্ভীর করে তুললেন, 'আমি একজন বেপরোয়া মানুষ, পাওয়েল। আমার সম্পর্কে অনেক কথাই ভুলে গেছ তোমরা। সেগুলোর মধ্যে একটা কথা, যেটা কখনোই ভুলে থাকা উচিত নয় তোমাদের, সেটা হলো, আমি একজন বেদুইন সর্দারের ছেলে। ভালমানুষ সেজে থাকি বটে, কিন্তু অস্তিত্ব রক্ষার যত রকম কৌশল বই-পুস্তকে লেখা আছে তার চেয়ে কিছু বেশি কৌশল জানা আছে আমার।'

ওদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করার জন্যে থামলেন নাফাজ মোহাম্মদ। উদ্বেগে

মুখগুলো এমন বিকৃত চেহারা ধারণ করেছে, যে দেখে বেশ আনন্দ বোধ করলেন তিনি। পাওয়েল, তার পার্সোনাল সেক্রেটারি এবং জেনারেল, তিনজনই পরিষ্কার বুঝতে পারছেন, মুখে যা বলছেন কাজেও ঠিক তাই করবেন নাফাজ মোহাম্মদ।

'আমাকে প্রত্যাখ্যান করার কারণ হিসেবে তোমরা অজুহাত দেখাচ্ছ আমার হাতে নাকি যথেষ্ট প্রমাণ নেই,' কেউ কিছু বলছে না দেখে আবার বললেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'আসলে প্রমাণ আমার হাতে আছে, এবং সেগুলো অকাট্য প্রমাণ, খণ্ডন করার সাধ্য কারও নেই। কিন্তু সেগুলো তোমাদের সামনে আমি দাখিল করব না, কারণ তাতে লাভ হবে না কিছুই—বিপদের সময় আমার মাথায় নিরাপত্তার ছাতা মেলে ধরার যোগ্যতা বা ইচ্ছে কোনটাই নেই তোমাদের, এটুকু পরিষ্কার বুঝেছি আমি। দ্রুত, বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিতে পারে এমন একজন মানুষ দরকার আমার, সে-ধরনের খ্যাতি একমাত্র সেক্রেটারির আছে। আমি পরামর্শ দিচ্ছি, তাকে তুমি এখানে হাজির করো।'

'সেক্রেটারিকে আপনার সামনে হাজির করব?' হতভম্ব দেখাচ্ছে পাওয়েলকে। 'সেক্রেটারিকে কারও কাছে হাজির করা যায় না, মি. নাফাজ। তাঁর দেখা পেতে হলে আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হয়। তাছাড়া, এই মুহূর্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা মীটিঙে রয়েছেন তিনি।'

একচুল নড়লেন না নাফাজ মোহাম্মদ। প্রচণ্ড রাগ আর জেদের একটা পুরু মুখোশের মত দেখাচ্ছে তাঁর মুখটাকে। 'নিয়ে এসো,' কণ্ঠে পরিষ্কার আদেশের সুর। 'আমার সাথে কথা বলার এই সুযোগটাই হয়তো তার জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান আর গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণিত হবে। আমি ডেকেছি শোনার পরও যদি সে না আসে, তার রাজনৈতিক জীবনের শেষ বৈঠক হতে যাচ্ছে এটা। আমি জানি এখান থেকে বিশ গজ দূরে আছে সে। যাও, নিয়ে এসো।'

'আমি···আমি। ঠিক···মানে···'

আরামকেদারা ছেড়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন নাফাজ মোহাম্মদ। বাদামী রঙের মুখে এখন রাগের ছিটেফোঁটাও নেই, আশ্চর্য একটা কোমল ভাব ফুটে উঠেছে সেখানে, চোখে করুণার দৃষ্টি। অস্বাভাবিক শান্ত গলায় বললেন, 'তোমরা নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছ, সেক্ষেত্রে আমার কি করার আছে? সাংবাদিক সম্মেলন আর রেডিও-টিভির বিশেষ প্রোগ্রামের পর তোমাদের দশা কি হবে, ভাবতে গিয়ে করুণা বোধ করছি আমি। যাই হোক, নিজের বিবেকের কাছে আমি মুক্ত। তোমাদেরকে শেষ একটা সুযোগ দিয়েছিলাম, তোমরা সেটা গ্রহণ করোনি।' অসহায় ভাবে কাঁধ ঝাঁকালেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'অসংখ্য ধন্যবাদ, ভায়েরা। প্রার্থনা করি, তোমরা যেন অন্তত ধকলটা সামলে উঠতে পারো।' কথা শেষ করে ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছেন তিনি।

চিৎকার করে উঠল অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেমস পাওয়েল, 'না! না! বসুন! প্লীজ বসুন, মি. নাফাজ। এক মিনিট সময় দিন আমাকে, দেখি কতটা কি করতে পারি আপনার জন্যে।' উঠে দাঁড়িয়েছে সে, এক ছুটে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

পাওয়েল বেরিয়ে যাবার পর কামরার ভেতর জমাট নিস্তব্ধতা। তিন মিনিট পর প্রকাণ্ড শরীরটা নিয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়লেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল

জিগলার, জানতে চাইলেন, 'যা বলছেন সব তাহলে সত্যি, মি. নাফাজ?'

'আপনি আমাকে অবিশ্বাস করেন, জেনারেল?'

'না। সত্যি তাহলে হুমকিগুলো কাজে পরিণত করবেন?'

'আপনি বোধহয়, আমার বিশ্বাস, "হুমকি" নয়, প্রতিজ্ঞা শব্দটা ব্যবহার করতে চেয়েছেন।'

মুখের উপর সূক্ষ্ম বাড়ি মেরে জেনারেলকে চুপ করিয়ে দিলেন নাফাজ মোহাম্মদ। গম্ভীর, থমথম করছে জেনারেলের চেহারা। কামরার আর দু'জনও আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে আছে। শুধু নাফাজ মোহাম্মদকে হাসিখুশি, শান্ত দেখাচ্ছে। তবে, মনের ভেতরে তুমুল ঝড় বয়ে যাচ্ছে তাঁর। তিনি জানেন, সেক্রেটারির আসা না আসার ওপর নির্ভর করছে তাঁর জয়-পরাজয়।

তাঁরই জয় হলো। শশব্যস্ত ভঙ্গিতে পথ দেখিয়ে সেক্রেটারিকে নিয়ে এল পাওয়েল। সেক্রেটারি স্টিফেন কাসলারের খ্যাতির সাথে তাঁর চেহারার কোন মিল নেই। কাসলার তীক্ষ্ণ, নির্দয়, কঠোর চেহারার লোক নন। একটু মোটাই বলা যায় তাঁকে, ধনী একজন কৃষকের মত চেহারা। মুখের হাসিটা আন্তরিকতায় ভরাট, চোখের দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণ চতুরতার নাম গন্ধ নেই। আমার মনের মানুষ, ভাবলেন নাফাজ মোহাম্মদ। উঠে দাঁড়ালেন।

স্টিফেন কাসলার তাঁর করমর্দন করলেন আন্তরিকতার সাথে। 'মি. নাফাজ! কি সৌভাগ্য, কি দুর্লভ সৌভাগ্য, আমেরিকার টপ অয়েল টাইকুন দয়া করে আমাদেরকে সাক্ষাৎ দান করতে এসেছেন।'

সৌজন্যতা দেখাতে কার্পণ্য করলেন না নাফাজ মোহাম্মদ, কিন্তু চেহারাটা মলিন করে তুললেন। ম্লান গলায় বললেন, 'মাই প্লেজার, মি. সেক্রেটারি। কিন্তু সাক্ষাৎটা এর চেয়ে ভাল পরিস্থিতিতে হলে আরও খুশি হতাম আমি। আপনি সজ্জন ব্যক্তি, তাই আমার জন্যে কয়েকটা মিনিট অপচয় করছেন। সেজন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। পাঁচটা মিনিট, তার বেশি আটকে রাখব না আপনাকে, কথা দিচ্ছি।'

'যত ইচ্ছে সময় নিন, মি. নাফাজ,' হাসছেন সেক্রেটারি কাসলার। 'অযথা সময় নষ্ট করার মানুষ আপনি নন, আমি জানি।'

'ধন্যবাদ,' পাওয়েলের দিকে তাকালেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'চল্লিশ গজ পেরোতে তেরো মিনিট।' আবার তিনি সেক্রেটারির দিকে ফিরলেন। 'মি. পাওয়েল আপনাকে পরিস্থিতিটা সম্পর্কে আভাস দিয়েছে, মি. সেক্রেটারি?'

'ওর ব্রিফিঙে কোন খুঁত নেই, মি. নাফাজ। আপনি শুধু আমাকে জানান কি ধরনের সাহায্য লাগবে আপনার।'

ঈগলটনের কাছ থেকে বিপদ সঙ্কেত পাবার পর থেকে এই প্রথম সাগর কন্যার নিরাপত্তা সম্পর্কে একটু নিশ্চয়তা বোধ করছেন নাফাজ মোহাম্মদ। সরকারের একজন কর্তা ব্যক্তি তাঁকে যে-কোন সাহায্য দেবার আশ্বাস দিচ্ছে।

'আমরা, অবশ্যই, সোভিয়েত আর ভেনিজুয়েলান দূতাবাসকে ব্যাপারটা জানাতে পারি,' বললেন কাসলার। 'তাদেরকে ডেকে পাঠিয়ে কারণ দর্শাতেও বলতে পারি। কিন্তু, তাতে বিশেষ কোন লাভ হবে না। অ্যামবাসেডারদের সে ক্ষমতা আজ আর নেই। দশ বছর আগেও ওদের ওজন ছিল, আজ ওরা নিষ্প্রাণ,

নির্জীব পুতুল ছাড়া কিছুই নয়। দূতাবাসের ড্রাইভার আর তাদের হেলপাররা বরং অনেক বেশি ক্ষমতা রাখে—সবাই জানে, ট্রেনিং পাওয়া এসপিওনাজ এজেন্ট ওরা।

'আরেকটা উপায় হলো, সংশ্লিষ্ট সরকারদেরকে আমরা সরাসরি বলতে পারি। কিন্তু তা বলতে হলে আমাদের হাতে প্রমাণ থাকতে হবে। প্রমাণ আছে, আপনার মুখের এই কথাটাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট, মি. নাফাজ—কিন্তু যাদেরকে আমরা প্রমাণ দেখাতে চাইব তারা এটাকে যথেষ্ট নিরেট এবং শক্তিশালী বলে মেনে নেবে না। সত্যি কথা বলতে কি, এ-ধরনের আবছা প্রমাণ হাতে নিয়ে অভিযোগ করা যায় না; তাতে হাস্যাস্পদ হতে হয়। আপনি বলছেন, আপনার বিরুদ্ধে দেশে এবং বিদেশে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। আপনার কথা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু ওদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হলে আমাদের হাতে থাকতে হবে নিরেট, নিশ্ছিদ্র প্রমাণ।'

'তাও আমি হাজির করতে পারি,' নাফাজ মোহাম্মদ বললেন। 'সলিড প্রমাণ যোগাড় না করে সরকারের অমূল্য সাহায্য চাইতে আসিনি আমি। মি. সেক্রেটারি, এই মুহূর্তে আপনাকে আমি প্রমাণ আর তথ্যের একটা আউটলাইন দিতে পারি। এখুনি সংশ্লিষ্টদের নাম প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ তা করলে আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ক্যারিয়ার ধুলোয় লুটিয়ে দেয়া হবে। যতক্ষণ পারা যায় বন্ধুকে রক্ষা করার চেষ্টা করব আমি। তবে, শেষ পর্যন্ত যদি আর কোন উপায় না দেখি, বন্ধুর সর্বনাশ করতেও দ্বিধা করব না। সেক্ষেত্রে তার ক্ষতি ব্যক্তিগতভাবে যতটা পারি পূরণ করার চেষ্টা করতে হবে আমাকে। ষড়যন্ত্রকারীদের নাম প্রকাশ করা না করা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে ডিপার্টমেন্টের আচরণের ওপর। আউটলাইন দেবার পর আমাকে যদি কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেয়া না হয়, বাধ্য হয়ে জনসাধারণের কাছে যেতে হবে আমাকে। না, না, ব্ল্যাকমেইল নয়। চিপির মধ্যে আটকে ফেলা হয়েছে আমাকে, নিজেকে মুক্ত করতে হলে লড়তে হবে এই অভাগাকে। আপনাদের প্রতিক্রিয়া যদি সন্তোষজনক হয়, শুধু তখনই নামের একটা তালিকা দেব আমি। এবং আশা করব, বাইরে সেটা প্রকাশ করা হবে না। তবে, এও জানি, এখান থেকে বেরিয়ে হেলিকপ্টারে আমিও চড়ব, এফ.বি.আইও আমার পিছু নেবে। কথাটা অপ্রাসঙ্গিকভাবে এসে গেল, কিছু মনে করবেন না।'

'স্টেট ডিপার্টমেন্টের বিরুদ্ধে পাবলিক সেন্টিমেন্ট এই রকমই,' হাসছেন স্টিফেন কাসলার। 'না, কিছু মনে করার নেই, মি. নাফাজ। আপনি অন্যায় কিছু বলেননি। চোখে আঙুল দিয়ে অযোগ্যতা দেখিয়ে দেবার আশ্চর্য গুণ রয়েছে আপনার মধ্যে। সেজন্যেই আজ আপনি একজন মিলিওনিয়র···সরি, মাফ করবেন, বিলিওনিয়র।'

'চলতি হপ্তার প্রথম দিকের ঘটনা। পশ্চিমের লেক এলাকার কোথাও। দশজন বিখ্যাত তেল ব্যবসায়ী একটা গোপন বৈঠকে মিলিত হয়। এদের মধ্যে চারজন ছিল আমেরিকান, এরা অসংখ্য বড় বড় তেল কোম্পানীর প্রতিনিধিত্ব করছিল। পাঁচ নম্বর ব্যক্তি হন্ডুরাস থেকে, ছয় নম্বর ভেনিজুয়েলা থেকে, সাত নম্বর নাইজেরিয়া থেকে, আট আর নয় নম্বর গালফের দু'জন আমীর আর শেখের প্রতিনিধি হয়ে এসেছিল। শেষ ব্যক্তিটি একজন রাশিয়ান, মার্কিন মুলুকে তেল সরবরাহ করার সাথে তার বা তার দেশের কোন সম্পর্ক নেই, সুতরাং ধরে নেয়া যায়, তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল

যতটা সম্ভব গোলমাল পাকানো।'

থামলেন নাফাজ মোহাম্মদ। এক এক করে পাঁচজন লোকের দিকে তাকালেন। দেখলেন সবাই গভীর মনোযোগের সাথে তাঁর কথা শুনছে। খুশি হলেন তিনি, আবার বলতে শুরু করলেন।

'এই গোপন বৈঠকে একটা মাত্র সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যে-কোন মূল্যে নাফাজ মোহাম্মদকে থামাতে হবে। আরও পরিষ্কার করে বলছি, তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে-কোন মূল্যে সাগর কন্যা থেকে তেলের সরবরাহ বন্ধ করতে হবে। সাগর কন্যা, আমার অয়েল রিগের নাম।' একটু থেমে দম নিলেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'প্রসঙ্গক্রমে বলছি, আমাদের দেশের তেল ব্যবসায়ীরা ট্যাক্স ফাঁকি দেয়া থেকে শুরু করে এমন কোন শাস্তিযোগ্য অপরাধ নেই যা করছে না। এটা আমার নিজের কথা নয়। কংগ্রেশনাল ইনভেস্টিগেটিভ কমিটি ব্যাপক তদন্ত করে এই রিপোর্ট তৈরি করেছে। আমার গর্ব এইটুকু যে কমিটি নাফাজ অয়েল কোম্পানীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনতে পারেননি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, কমিটির রিপোর্টে অপরাধের কথা পরিষ্কার উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কোম্পানীগুলোর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত নেয়া হয়নি। অবশ্য এখন সেটা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। আলোচনার উপযুক্ত জায়গাও নয় এটা। ঝামেলা-মুক্ত হয়ে ব্যাপারটা আমি সুপ্রীম কোর্টে তুলব বলে ঠিক করেছি।'

স্টিফেন কাসলারের মুখে হাসি, সব কথা বলার জন্যে মৌন উৎসাহ দিচ্ছেন তিনি নাফাজ মোহাম্মদকে।

'তেল সরবরাহ স্থায়ীভাবে বন্ধ করার একমাত্র উপায় হলো সাগর কন্যাকে ধ্বংস করা। বৈঠকের এক পর্যায়ে তারা এক ভয়ঙ্কর লোককে ডেকে পাঠায়, যাকে খুব ভালভাবে চিনি আমি। লোকটা সম্পর্কে মুখে যত কথাই বলি না কেন, তার আসল প্রকৃতির বর্ণনা দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। নিষ্ঠুর। হিংস্র। অকুতোভয়। আমি নাফাজ মোহাম্মদ, পাঁচ মিনিটের মধ্যে পাঁচ হাজার খুনে-গুণ্ডাকে সাহায্যের জন্যে আমার বাড়ির উঠানে জড়ো করে ফেলতে পারি, কিন্তু তবু সেই লোকটাকে যমের মত ভয় করি আমি। লোকটা কী রকম ভয়ঙ্কর, এ-থেকে আন্দাজ করে নিন। আমার দুর্ভাগ্য, লোকটা আমাকে দু'চোখে দেখতে পারে না। সে আমাকে তার পরম শত্রু বলে মনে করে, যদিও তার কোন ক্ষতি আমি করিনি। অবশ্য তার রোষের শিকার হবার পেছনে একটা কারণ আছে। কিন্তু সেটা আমি প্রকাশ করতে চাই না, যতক্ষণ না আমাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে। ঘটনাচক্রে, এই লোক দুনিয়ার একজন সেরা বিস্ফোরণ এক্সপার্ট।'

টোবাকো পাইপে তামাক ভরছেন নাফাজ মোহাম্মদ। সবাই তাঁর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সেক্রেটারি স্টিফেন কাসলারের কপালে চিন্তার রেখা।

একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন নাফাজ মোহাম্মদ। বৈঠকের শেষে এই লোক ভেনিজুয়েলান আর রাশিয়ান ডেলিগেটকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাদের কাছ থেকে ন্যাভাল সাপোর্ট চায়। ডেলিগেটরা তাকে সাপোর্ট দেবে বলে কথা দেয়।

'এই লোক আমাকে এত বেশি ঘৃণা করে যে বিনা পারিশ্রমিকেই সে আমার যে কোন ক্ষতি করার জন্যে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। যাই হোক, আমার সর্বনাশ

করার বিনিময়ে ফি হিসেবে বিশ লক্ষ মার্কিন ডলার চায় সে, এবং পায়। খরচপাতির জন্যে সে চায় দুই কোটি মার্কিন ডলার, এবং পায়। এখন, মি. সেক্রেটারি, আপনি আমাকে বলুন: দুই কোটি ডলার আমার বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কাজে ছাড়া আর কি কাজে ব্যবহার করতে পারে এই লোক?'

'বিস্ময়কর! অবিশ্বাস্য!' এদিক ওদিক মাথা দোলাচ্ছেন সেক্রেটারি। 'কিন্তু, আপনার কথা নির্ভেজাল সত্য না হয়েও যায় না। বোঝাই যাচ্ছে, অত্যন্ত নিপুণ একটা সিস্টেমের সাহায্যে তথ্যগুলা যোগাড় করেছেন আপনি।' একটু হাসলেন তিনি। 'শুনে মনে হচ্ছে আমাদের সাথে টক্কর দিতে পারে এমন একটা ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস রয়েছে আপনার।'

'আপনাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। আমার এজেন্টদেরকে আরও বেশি বেতন আর সুযোগ-সুবিধে দিই আমি। তেল ব্যবসা বুনো পশুদের ব্যবসা, এই জঙ্গলে সেই টিকে থাকে যার শয়তানী বুদ্ধি কারও চেয়ে কম নয়।'

'আপনার বন্ধু, যার ক্যারিয়ার··· তিনিও কি সেই বৈঠকে···'

'হ্যাঁ।'

'বিশদ বিবরণ, সেই সাথে নামের একটা তালিকা তৈরি করে দিন আমাকে। আপনার বন্ধুর নামের পাশে একটা টিক্ চিহ্ন দিলেই হবে। তালিকাটা আমি ছাড়া আর কেউ দেখবে না। আপনার বন্ধু যাতে এর মধ্যে জড়িয়ে না পড়েন সে-জন্যে যা করার দরকার করব আমি।'

'আপনার বিচক্ষণতার তুলনা হয় না, মি. সেক্রেটারি।'

'এই তালিকার বিনিময়ে ডিফেন্স আর পেন্টাগনের সাথে আলোচনা করব আমি,' এক সেকেন্ডের জন্যে থামলেন সেক্রেটারি। 'না, তারও কোন দরকার নেই। বিনিময়ে আপনাকে আমি যে-কোন হুমকির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় নৌ এবং বিমান কাভারের গ্যারান্টি দেব।'

সেক্রেটারির কথা বিশ্বাস করলেন নাফাজ মোহাম্মদ। তিনি জানেন, এই লোকের কথার দাম আছে। প্রেসিডেন্টের ডান হাত বলতে স্টিফেন কাসলারকেই বোঝায়। 'আমি সন্তুষ্ট, মি. সেক্রেটারি,' বললেন তিনি। তাকালেন পাওয়েলের দিকে। 'এই ভদ্রমহিলার সাহায্য যদি পাই···'

'অবশ্যই,' বলল স্টেনোগ্রাফার। নোটবুকের একটা নতুন পাতা খুলে তৈরি হয়ে গেল সে।

'জায়গার নাম—লেক তাহো, ক্যালিফোর্নিয়া। ঠিকানা···' আউটলাইন দিচ্ছেন নাফাজ মোহাম্মদ।

ঝন ঝন শব্দে টেলিফোনটা বেজে উঠে বাধা দিল নাফাজ মোহাম্মদকে। ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে একটু হেসে স্টেনোগ্রাফার টেলিফোনের রিসিভারটা তুলল হাতে।

পার্সোনাল সেক্রেটারির দিকে ফিরল পাওয়েল। 'কি আশ্চর্য, কড়া নির্দেশ দিয়ে রেখেছি আমি···'

'মি. নাফাজের কল,' বলল স্টেনোগ্রাফার, তাকিয়ে আছে সেক্রেটারি স্টিফেন কাসলারের দিকে। 'ফ্লোরিডা থেকে একজন মি. আনিস আহমেদ। এক্সট্রিমলি আর্জেন্ট।' মাথা নাড়লেন সেক্রেটারি, সেটাকে অনুমতি ধরে নিয়ে রিসিভারটা

নাফাজ মোহাম্মদের দিকে বাড়িয়ে দিল স্টেনোগ্রাফার।

'আনিস? আমি এখানে. তুমি জানলে কিভাবে···হ্যাঁ. শুনছি আমি

নিঃশব্দে শুনছেন নাফাজ মোহাম্মদ। সবাই তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। দেখছে, ধীরে ধীরে রক্তশূন্য হয়ে যাচ্ছে তাঁর মুখের চেহারা স্টিফেন কাসলার নিজেই উঠে দাঁড়ালেন, গ্লাসে ব্র্যান্ডি ঢেলে সেটা নিয়ে এলেন নাফাজ মোহাম্মদের কাছে। নাফাজ মোহাম্মদ তাকালেন না, হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা নিয়ে এক ঢোকে নিঃশেষ করে ফিরিয়ে দিলেন সেটা। স্টিফেন কাসলার পিছিয়ে এসে আবার ব্র্যান্ডি ভরলেন গ্লাসে। ফিরে এলেন নাফাজ মোহাম্মদের কাছে। নাফাজ মোহাম্মদ গ্লাসটা নিলেন বটে, কিন্তু তাতে আর চুমুক দিলেন না। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তাঁর বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। রিসিভারটা সেক্রেটারির দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

রিসিভারটা নিয়ে কথা বলছেন স্টিফেন কাসলার, 'স্টেট ডিপার্টমেন্ট। আপনি কে বলছেন?'

আনিসের গলা ক্ষীণ কিন্তু স্পষ্ট। 'আনিস আহমেদ। ···আপনি ড. কাসলার?'

'ইয়েস। মি. নাফাজ প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ। তাঁর মেয়েকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।'

'গুড গড অ্যাবাভ্।' আঁতকে উঠলেন স্টিফেন কাসলার, এভাবে আঁতকে উঠতে এর আগে কেউ তাঁকে দেখেনি। 'আপনি শিওর?'

'ইয়েস, স্যার।'

'আপনার পরিচয়? মি. নাফাজের সাথে আপনার সম্পর্ক?'

'রানা এজেন্সী, ফ্লোরিডার ব্রাঞ্চ চীফ। মি. নাফাজের প্রতিবেশী আমি, পারিবারিক বন্ধু, তাঁর কোন ইনভেস্টিগেশনের সাথে জড়িত নই।'

'রানা এজেন্সী?' সামান্য একটু ভুরু কুঁচকে উঠল সেক্রেটারির। 'মেজর মাসুদ রানার···'

'ইয়েস, স্যার।'

'হুঁ,' শব্দটা উচ্চারণ করে সেক্রেটারি ঠিক কি বোঝাতে চাইলেন ধরতে পারল না আনিস। 'পুলিসকে খবর দেয়া হয়েছে?'

'জী, স্যার!'

'কি করা হয়েছে এর মধ্যে?'

'সী আর এয়ার এস্কেপরুটগুলো ব্লক করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

'ওদের চেহারার বর্ণনা পাওয়া গেছে?'

'যায়নি, স্যার। পাঁচজন লোক, সবাই সশস্ত্র, মুখোশ পরে ছিল।'

'স্থানীয় ল সম্পর্কে আপনার ধারণা?'

'ভাল নয়।'

'এফ.বি.আই-কে ডাকছি আমি।'

'ইয়েস, স্যার। কিন্তু কিডন্যাপারদের যেমন কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি, তারা যে রাজ্য ত্যাগ করেছে তারও কোন প্রমাণ নেই।'

'রাজ্য সীমানা ত্যাগ করুক বা না করুক, আইনে থাক বা না থাক, আমি যদি

বলি এফ.বি.আইকে আসতে হবে, তারা আসবে। এটাই শেষ কথা। একটু ধরুন। মি. নাফাজ সম্ভবত আপনার সাথে কথা বলতে চাইছেন।'

সেক্রেটারির হাত থেকে রিসিভারটা নিলেন নাফাজ মোহাম্মদ। ইতিমধ্যে নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়েছেন তিনি। 'এখুনি রওনা হচ্ছি আমি, আনিস। চার ঘণ্টার বেশি লাগবে না। আধ ঘণ্টা পর রেডিওতে যোগাযোগ করব আমি। এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করো আমার জন্যে।'

'ঠিক আছে, মি. নাফাজ। কমান্ডার লিল হাম্মাম জানতে চান···'

'জানাও।' রিসিভারটা ফোনের ক্রাডলে রেখে দিলেন নাফাজ মোহাম্মদ।

গ্লাস থেকে আরেক চুমুক ব্র্যান্ডি খেলেন তিনি। বললেন, 'দুর্ভাগ্য নয়, অদূরদর্শিতা। আমারই দোষ। অঘোষিত, কিন্তু এটা একটা যুদ্ধ তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমার উচিত ছিল আনিস আহমেদকে সতর্ক করে দেয়া, তাহলে আর মেয়েকে হারাতে হত না আমার।'

সেক্রেটারি স্টিফেন কাসলার সবিস্ময়ে কিন্তু মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'পাঁচজন সশস্ত্র লোকের বিরুদ্ধে একা একজন লোক কি করতে পারত, মি. নাফাজ?'

'ওকে আপনি চেনেন না, মি. সেক্রেটারি। শিরি, আমার মেয়েকে, রক্ষা করার জন্যে আনিস পারে না এমন কোন কাজ নেই।'

'রানা এজেন্সীর নাম শুনেছি,' বললেন স্টিফেন কাসলার, 'মাসুদ রানা সম্পর্কেও কিছু কিছু জানি বটে,' রানাকে যে তিনি চেনেন, ওর সাথে ভাল পরিচয় আছে, তা আর উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করলেন না। 'কিন্তু তার একজন সহকারীকে আপনি এতবড় সার্টিফিকেট দিচ্ছেন শুনে একটু অবাকই লাগছে আমার। কিছু মনে করবেন না, মার্কিন সমাজে এবং সারা দেশে আপনার পরিবারের যে সম্মান তাতে সাধারণ একজন ইনভেস্টিগেটর আপনার পরিবারের বন্ধু, কথাটা শুনতে কেমন যেন লাগে।' একটু থেমে কণ্ঠস্বর আরও খাদে নামিয়ে আবার বললেন, 'ওই আনিস আহমেদ এই কিডন্যাপিঙের সাথে কোনভাবে জড়িত নয় তো?'

'মাথা খারাপ!' আরেক ঢোক ব্র্যান্ডি খেলেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'হ্যাঁ, আনিস আমার মেয়েকে কিডন্যাপ করতে চায় বটে, ওর হাতে আমার মেয়েও কিডন্যাপড হতে চায়।'

'তাই?' রীতিমত অবাক হলেন স্টিফেন কাসলার।

'হ্যাঁ। এবং আপনার পরবর্তী প্রশ্ন দুটোর উত্তরে বলছি—হ্যাঁ, ওদের মেলামেশায় আমার পুরো মত আছে। এবং—না, আমার টাকার ওপর আনিসের কোন লোভ নেই।' একটু থেমে ব্র্যান্ডির গ্লাসে চুমুক দিলেন তিনি, তারপর আবার বললেন, 'শুনতে হাস্যকর আর বিদঘুটে লাগতে পারে, কিন্তু আমার বিশ্বাস কথাটা হয়তো ফলে যাবে: আমার মেয়েকে আমি যখন ফিরে পাব—তখন দেখা যাবে পুলিস বা আপনাদের সুযোগ্য এফ. বি.আই তাকে ফিরিয়ে আনেনি, ফিরিয়ে এনেছে রানা এজেন্সীর ওই আনিস আহমেদ। আমার মেয়ের জন্যে নিজের প্রাণ দিতে পারে ও।' হাতের গ্লাসটা ডেস্কে নামিয়ে রেখে ঘুরে সবার দিকে তাকালেন তিনি। 'এবার আমাকে যেতে হয়। আন্তরিক অভ্যর্থনা আর সহযোগিতার জন্যে

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।' কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি, পাশে সেক্রেটারি স্টিফেন কাসলারকে নিয়ে।

এক প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে রোদ-ঝলমলে লনে নেমে এলেন ওঁরা। অদূরে দেখা যাচ্ছে হেলিকপ্টারটাকে।

'সহানুভূতি জানাবার ভাষা আমার নেই...'

সেক্রেটারিকে থামিয়ে দিয়ে বললেন নাফাজ মোহাম্মদ, 'তবু ধন্যবাদ।'

'আমি বরং আপনার সাথে আমার ব্যক্তিগত ফিজিশিয়ানকে দিচ্ছি, ফ্লোরিডা পর্যন্ত আপনার সাথে যাক সে।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু তার কোন দরকার নেই, আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করছি।'

'ইশ্, আপনার বোধহয় লাঞ্চও খাওয়া হয়নি?'

'বোয়িঙে ফ্রেঞ্চ রাঁধুনি আছে,' বললেন নাফাজ মোহাম্মদ।

হেলিকপ্টারের সিঁড়ির কাছে পৌঁছুলেন ওঁরা। 'নামের তালিকা দেবার সময় বা সুযোগ কিছুই পেলেন না আপনি,' বললেন স্টিফেন কাসলার, 'এই মুহূর্তে সেটা কোন জরুরী ব্যাপার নয়। আমি চাই আপনি নিশ্চিন্ত বোধ করুন। আমার দেয়া প্রতিশ্রুতি বহাল থাকবে।'

আশ্চর্য একটা হতাশ ভঙ্গিতে এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন নাফাজ মোহাম্মদ। তারপর নিঃশব্দে উঠে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে। 'কপ্টারে অদৃশ্য হয়ে যাবার সময়ও পেছন ফিরে তাকালেন না একবার।

দশ

ইতিমধ্যে রোমিওকে নিয়ে সাগর কন্যায় পৌঁছে গেছে প্যাটন। প্ল্যাটফর্মের বিশাল ডেরিক ক্রেনের সাহায্যে লুসিয়ানা থেকে লুট করে নিয়ে আসা ভারী অস্ত্রশস্ত্র আর মাইন নামানো হচ্ছে। কাজটা জটিল আর বিপজ্জনক। তার অনেক কারণের মধ্যে একটা, ডেরিক থামের ডগাটা সী-লেভেল থেকে দুশো ফিট উঁচুতে। স্থানান্তরের কাজটা শেষ হতে তিন ঘণ্টা সময় লেগে গেল।

একটা করে ডুয়াল-পারপাস অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান সাগর কন্যায় এসে নামছে, সাথে সাথে সেটাকে বসাবার জায়গা নির্বাচন করছে কমান্ডার লিল হাম্মাম, আর জিউসেপ বারজেন তার লোকজনদের নিয়ে সেটাকে সেই জায়গায় বসাবার কাজ তদারক করছে। কংক্রিটের প্ল্যাটফর্মে ড্রিলিং যন্ত্রের সাহায্যে গর্ত করা হচ্ছে, সেখানে অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান বসাবার পর গান-ক্যারেজের গোড়াটাকে শক্ত ভিতের ওপর আটকাবার জন্যে স্লেজ-হ্যামার দিয়ে স্টীল-স্পাইক পোঁতা হচ্ছে চারদিকে। গানগুলো রিকয়েল-লেস হবার কথা, কিন্তু কমান্ডার লিল হাম্মাম আর জিউসেপ বারজেন কোন রকম ঝুঁকি নিতে রাজী নয়।

এরপর এল ডেপথ-চার্জ। সেগুলো তিনভাগে ভাগ করে ত্রিভুজের তিনটে মঞ্চের প্রতিটির মাঝখানে জড়ো করে রাখা হলো। এতে বিরাট ঝুঁকি নেয়া হচ্ছে

জানে কমান্ডার হাম্মাম। দিকভ্রান্ত একটা বুলেট বা একটা শেল্ল এসে যে-কোন একটা ডেপথ-চার্জ স্তূপের ডিটোনেটিং মেকানিজমের ট্রিগার টেনে দিতে পারে। একটা বিস্ফোরণ সেই মুহূর্তে অন্য দুটো স্তূপকে বিস্ফোরিত হতে প্ররোচিত করবে। কিন্তু ঝুঁকিটা না নিয়ে কোন উপায় নেই। হঠাৎ ব্যবহার করার দরকার হতে পারে এগুলো, তখন হাতের কাছে পেতে হলে এই জায়গা ছাড়া আর কোথাও রাখা চলে না।

ড্রিলিং ক্রুরা সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত, নিজেদের ব্যাপার ছাড়া অন্য কোন দিকে খেয়াল দিতে অভ্যস্ত নয় তারা। তবে জিউসেপ বারজেন আর তার সহকারীদের তৎপরতা দেখার ইচ্ছে না থাকলেও দেখতে হচ্ছে তাদেরকে। দেখছে, কিন্তু তেমন কোন প্রতিক্রিয়া নেই কারও মধ্যে। কেউ কেউ মৃদু কৌতুক বোধ করছে, কারও কারও মনে কৌতূহল জাগছে, তবে নিজেদের কাজে ফাঁকি দিয়ে সারাক্ষণ এদিকে তাকিয়ে নেই কেউ। নিজেদের মধ্যে এসব বিষয়ে আলোচনাও করছে না। ওরা জানে, ফালতু সময় নষ্ট করা পছন্দ করেন না কমান্ডার লিল হাম্মাম।

নির্ঝঞ্ঝাট সাবলীল ভাবে চলছে সবকিছু। হামলা প্রতিরোধের ব্যবস্থা পাকাপোক্তভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। সাগর-তলা থেকে তুলে আগেই ভরে রাখা রিজারভয়েরের তেলের স্রোত কন্ট্রোল করে একটা ভালভ, অদ্ভুত নাম দেয়া হয়েছে সেটার—ক্রিস্টমাস ট্রী। পুরো খোলা রয়েছে ক্রিস্টমাস ট্রীর মুখ, অবিরাম পাম্প করা তেলের স্রোত ছুটে গিয়ে জমা হচ্ছে বিশাল ভাসমান স্টোরেজ ট্যাঙ্কে। ওদিকে, ড্রিলিং ডেরিক তার নাগালের শেষপ্রান্তে পৌঁছে সাগর-তলার গভীর দেশে গর্ত খুঁড়ে এখনও হাত পড়েনি এমন নতুন তেলের ভাণ্ডার খুঁজছে। আবহাওয়াটা আজ খুবই ভাল। আর সবকিছুও চমৎকার ভাবে চলছে। শত্রুপক্ষের নাম-নিশানা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না কোথাও। সাগর বা আকাশ পথে হামলা আসারও কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু এসব লক্ষ করে যতটা স্বস্তিবোধ করার কথা ততটা স্বস্তিবোধ করছে না কমান্ডার হাম্মাম। ট্যাঙ্কার রকেট সম্পর্কে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই তার, আধঘন্টা পর পর 'অন কোর্স অন টাইম' রিপোর্ট নিয়মিত আসছে।

কমান্ডার হাম্মামের আংশিক দুশ্চিন্তা সানলাইটকে নিয়ে। খানিক আগে গলভেস্টন থেকে খবর পেয়েছে সে, ন্যাভাল বা কোস্টগার্ড রেজিস্টারে সানলাইট নামে কোন জাহাজের অস্তিত্ব নেই। এ-কথা জানার পর সিভিলিয়ান রেজিস্ট্রেশন তালিকা চেক করে দেখতে বলে সে। উত্তরে জানানো হয়েছে এ-ধরনের তদন্ত শেষ করতে কয়েকদিন সময় লাগবে। তাছাড়া, প্রাইভেট জাহাজ পুরোপুরি বীমা করা না থাকলে সরকারী রেজিস্টার বা মেরিন ইন্সুরেন্স কোম্পানীগুলোর রেজিস্টারে সেটার নাম ওঠে না। বীমা করতেই হবে, এমন কোন আইন নেই, এবং পুরানো জাহাজের মালিকদের বীমা করার ব্যাপারে তেমন গরজ নেই।

এত খোঁজাখুঁজি নিরর্থক, কমান্ডার হাম্মামের তা জানার কথা নয়। ময়নিহান যখন জাহাজটার দায়িত্ব নেয় তখন ওটার নাম ছিল ড্যান্সার, গলভেস্টনের পথে রওনা হয়ে নামটা সে মুছে ফেলে, তার বদলে নাম লেখায় সানলাইট। এরপর সানলাইট নামটা বাতিল করে দিয়ে কোস্টগার্ড কাটারের নতুন নামকরণ করে

হেকটর—সী-উইচ। তার মানে ড্যাসার এবং সানলাইট নামে কোন জাহাজের অস্তিত্ব এখন আর কোথাও নেই।

অবশ্য কমান্ডার হাম্মামের মনটা উদ্বেগে ছটফট করছে সম্পূর্ণ অন্য এক কারণে। কারণটা যে কি তা সে বুঝতে পারছে না. শুধু মনে হচ্ছে কোথায় কি যেন একটা মস্ত অঘটন ঘটে যাচ্ছে। সাংঘাতিক খুঁত খুঁত করছে তার মন, মুহূর্তের জন্যেও স্থির হতে পারছে না। এ বড় মারাত্মক লক্ষণ, অভিজ্ঞতা থেকে জানে সে। অকারণে তার মন খুঁত খুঁত করে না কখনও, যখন করে তখন কোথাও না কোথাও কিছু একটা ঘটবেই। উচ্চশিক্ষিত, বুদ্ধিমান, সাত ঘাটের পানি খাওয়া লোক সে, অলৌকিক ব্যাপারস্যাপার বিশ্বাস করে না—কিন্তু মন থেকে যখন বিপদের নোটিশ আসে, রীতিমত ভয় পেয়ে যায় সে, বুঝতে পারে এবার তাকে যে-কোন অঘটনের জন্যে তৈরি থাকতে হবে। তাই লাউডস্পীকার থেকে জরুরী ডাক পেয়ে একটুও আশ্চর্য হলো না সে, বুঝতে পারছে এবার তাকে একটা দুঃসংবাদ শুনতে হবে।

'কমান্ডার হাম্মাম টু দি রেডিও কেবিন, কমান্ডার হাম্মাম টু দি রেডিও কেবিন।'

মনের ভেতরে যত বড় তুফানই বয়ে যাক, বাইরে থেকে কেউ কখনও বিচলিত হতে দেখেনি কমান্ডার হাম্মামকে। ধীর পায়ে এগোচ্ছে সে। দুঃসংবাদ যত দেরিতে শোনা যায় ততই ভাল। রেডিও অপারেটরকে বলল, মেসেজ শোনার সময় কেবিনে কাউকে দেখতে চায় না সে। অপারেটর বেরিয়ে যাবার পর দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল। তারপর তুলে নিল রিসিভারটা।

'কমান্ডার হাম্মাম,' ভারী গলায় বলল সে।

'আনিস আহমেদ। কথা দিয়েছিলাম যোগাযোগ করব।'

'ধন্যবাদ। মি. নাফাজের কাছ থেকে কোন খবর পেয়েছেন? আমাকে বলে গেছেন যোগাযোগ রাখবেন, কিন্তু কোন সাড়া নেই।'

'শিরি ফারহানা কিডন্যাপ হয়েছে,' এক কথায় সব প্রশ্নের উত্তর জানিয়ে দিল আনিস।

সাথে সাথে কোন কথা বলল না কমান্ডার হাম্মাম। টেলিফোনের রিসিভারটা হাতির দাঁতের তৈরি, কিন্তু সেটা তার হাতের চাপে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে। খবরটা প্রচণ্ড একটা আঘাত হয়ে বাজল কমান্ডারের বুকে। সাগর কন্যার সম্ভাব্য বিপদও শিরি ফারহানার কিডন্যাপিঙের কাছে তাৎপর্যহীন বলে মনে হচ্ছে তার কাছে। শিরিকে মেয়ের মত ভালবাসে সে, তার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে শিউরে উঠল অন্তরাত্মা।

কিন্তু কথা বলার সময় একটুও কাঁপল না তার গলা। 'কখন?'

'আজ ভোরে। এখন পর্যন্ত কোন খোঁজ নেই। রাজ্যের দক্ষিণ অংশের সমস্ত এস্কেপ রুট ব্লক করা হয়েছে, অথচ কোন বন্দর, এয়ারপোর্ট বা হেলিপোর্ট থেকে সন্দেহ করার মত কোন খবর আসছে না।'

'রাজ্যের ভেতর থাকলে নিশ্চয়ই সন্ধান পাওয়া যাবে। একটা মেয়েকে নিয়ে ওরা তো আর বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে না।'

'না, বাতাসে মিলিয়ে যায়নি,' বলল আনিস। 'মাটির ওপরই কোথাও আছে, অথবা মাটির নিচে কোথাও।' একটু থেমে আবার বলল, 'আমাদের ধারণা,

আশপাশেই কোথাও লুকিয়ে আছে ওরা।'

'কোন যোগাযোগ করছে না কিডন্যাপাররা? কোন দাবি নেই ওদের?'

'না,' বলল আনিস। 'সেটাই অবাক লাগছে।'

'টাকা আদায়ের পাঁয়তারা নয় এটা, বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'সাগর কন্যা?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি জানেন মি. নাফাজ ওয়াশিংটনে কেন গেছেন?'

'না,' বলল আনিস। 'জিজ্ঞেস করিনি।'

'ন্যাভাল প্রটেকশন দাবি করতে গেছেন তিনি,' বলল কমান্ডার লিল হাম্মাম। 'আজ খুব ভোরে একটা রাশিয়ান ডেস্ট্রয়ার আর একটা কিউবান সাবমেরিন হাভানা ত্যাগ করেছে। ওদিকে, ভেনিজুয়েলা থেকে আরেকটা ডেস্ট্রয়ার রওনা হয়েছে। তিনটেই দ্রুত ছুটে আসছে সাগর কন্যার দিকে।'

অপরপ্রান্তে কোন সাড়া নেই আনিসের। একটু পর বলল, 'আপনি নিঃসন্দেহ হয়ে এ-খবর দিচ্ছেন, কমান্ডার?'

'অবশ্যই। তবে, আমরাও পরোয়া করি না,' দৃঢ় গলায় বলল কমান্ডার। 'মি. নাফাজ অবশ্যই ওয়াশিংটন থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ফিরবেন। যা ঘটার ঘটে গেছে, আমাদের আর কোন ক্ষতি ওরা করতে পারবে না। দুশ্চিন্তা এখন একটাই, শিরি ফারহানাকে নিয়ে।'

'হ্যাঁ,' ম্লান গলায় বলল আনিস।

'নতুন কোন খবর পেলেই আমাকে জানাবেন, প্লীজ, মি. আনিস।'

নাফাজ ম্যানসন। রেডিওরুম। একই সাথে যার যার ফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখল আনিস আর রানা। 'গড! ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি আমি ওঁর শত্রুরা এতটা বাড়াবাড়ি করবে,' বলল আনিস।

'আঙ্কেল স্যাম তার এলাকায় কোন বিদেশী নৌ-শক্তিকে পানি ঘোলা করতে দেবে বলে মনে করি না,' বলল রানা। 'কনফ্রন্টেশনের ঝুঁকি সোভিয়েতরাও নেবে না। অন্তত এত ছোটখাট ব্যাপারে তো নয়ই। ব্লাফ দিচ্ছে ওরা, দেখছে তাতে যদি কিছু সুবিধে আদায় করা যায়। আমার বিশ্বাস, হামলা ডেস্ট্রয়ার বা সাবমেরিনের তরফ থেকে আসছে না। আসল হামলা আসছে অন্য কোন দিক থেকে।'

'আমারও তাই বিশ্বাস,' বলল আনিস। 'ডাবল ব্লাফ হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়।'

একটা চুরুট ধরিয়ে আনমনে ধোঁয়া ছাড়ছে রানা। আনিসের কথা শুনতে পায়নি। কি যেন ভাবছে।

কিছু বলতে যাচ্ছিল আনিস, কিন্তু রানার চিন্তান্বিত মুখের দিকে চোখ পড়তে সামলে নিল নিজেকে।

'তোমার একটা কথার মধ্যে চিন্তার খোরাক রয়েছে, আনিস,' নিজেই মুখ খুলল রানা। 'কমান্ডার হাম্মামকে তুমি বললে, কিডন্যাপাররা মাটির ওপর বা মাটির নিচে কোথাও লুকিয়ে আছে, তাই না?'

সসম্ভ্রমে চুপ করে অপেক্ষা করছে আনিস।

'এই ফ্লোরিডায় সত্যি কোথাও যদি হারিয়ে যাবার ইচ্ছে থাকে তোমার, কোথায় গা ঢাকা দেবে তুমি?' জানতে চাইল রানা।

চিন্তা করার জন্যে মাত্র এক সেকেন্ড সময় নিল আনিস। বলল, 'নিশ্চয়ই বিল এলাকায়। বিশাল জলাভূমি রয়েছে ফ্লোরিডায়।'

'হ্যাঁ। ওখানে লুকালে এক ব্যাটালিয়ন সিপাই এক মাস খুঁজেও বের করতে পারবে না তোমাকে। এখন বোঝা যাচ্ছে স্টেশন ওয়াগনটা কেন খুঁজে পায়নি পুলিস। হাইওয়ে, গলি আর তস্য গলিতে হন্যে হয়ে ঘুরছে ওরা। জলার মাঝখান দিয়ে যে-রাস্তাগুলো চলে গেছে ভুলেও সেখানে একবার ঢুঁ মারার কথা মনে পড়েনি ওদের।'

'কথাটা তাহলে মনে করিয়ে দিতে হয় ওদেরকে।'

'কয়েক ডজন রাস্তা আছে ওদিকে,' বলল রানা, 'সবগুলো লম্বায় খাটো—খানিক দূর যাবার পর দেখবে গাড়ি না থামিয়ে উপায় নেই। সবচেয়ে কাছের জলাটা সার্চ করতে কয়েক গাড়ি পুলিসের এক ঘন্টার বেশি লাগবে না।' একরাম লোয়াঙ্গোর দিকে তাকাল রানা, বলল, 'চীফ সালজের সাথে যোগাযোগ করো।'

আধখোলা দরজায় নক করে রেডিওরুমে ঢুকল যুবতী হাউজমেইড লুসি। হাতে একটা কার্ড রয়েছে তার। বলল, 'মিস শিরির বিছানা ঠিক করতে গিয়ে চাদরের নিচে থেকে পেলাম এটা, স্যার।'

হাত বাড়িয়ে কার্ডটা নিল রানা। সাধারণ একটা কার্ড, শিরির নাম আর বাড়ির ঠিকানা ছাড়া আর কিছু ছাপা নেই।

'উল্টো পিঠে, স্যার,' বলল লুসি।

কার্ডটা উল্টো করে ধরল রানা। বল-পয়েন্ট দিয়ে কে যেন লিখেছে, 'ছুটিতে। রোদ-ঝলমলে ছোট্ট দ্বীপ। সুইম-স্যুট কাজে আসবে না।' কার্ডটা আনিসকে দিল রানা। 'বলতে পারো, এটা শিরির হাতের লেখা কিনা?'

কার্ডের লেখার ওপর চোখ বুলিয়েই দ্রুত মাথা ঝাঁকাল আনিস।

'ধন্যবাদ, লুসি,' বলল রানা। 'এটা খুব কাজ দিতে পারে।'

লুসি রেডিও রুম থেকে বেরিয়ে যেতেই আনিসের দিকে তাকাল রানা। 'এটা কি ধরনের গাফলতি তোমার, আনিস?' রেগে গেছে ও। 'বেডরুমটা খুঁজে দেখোনি কেন?'

'হ্যাঁ,' ভুল স্বীকার করে বলল আনিস, 'পোশাক পাল্টাবার সময় শিরি যে সবাইকে কামরা থেকে বেরিয়ে যেতে বলবে তা আমার কল্পনায় আসা উচিত ছিল।'

'হাতের লেখাটা স্পষ্ট, বোঝা যাচ্ছে সাহস কম নয় মেয়ের।' একটু থেমে আবার বলল রানা, 'রোদ-ঝলমলে ছোট্ট একটা দ্বীপ, যেখানে সাঁতার কাটার উপায় নেই। অতি চালাক একজন কিডন্যাপার একটু বেশি কথা বলে ফেলেছে আর কি।' সকৌতুকে তাকাল আনিসের দিকে রানা। 'কিছু বুঝতে পারছ নাকি হে?'

দ্বিধান্বিত দেখাচ্ছে আনিসকে। পরমুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ। 'পারছি,

মাসুদ ভাই।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'সাগর কন্যা।'

এগারো

মাটি থেকে তেত্রিশ হাজার ফিট ওপরে এখন বোয়িংটা। ফ্রেঞ্চ রাঁধুনির তৈরি অত্যন্ত সুস্বাদু, হালকা লাঞ্চ এই মাত্র শেষ করেছেন নাফাজ মোহাম্মদ। দুঃসংবাদের প্রথম ধাক্কা সামলে নিয়ে এখন তিনি সম্পূর্ণ শান্ত, সুস্থ হয়ে উঠেছেন। দুর্ঘটনা তো মানুষের জীবনে ঘটেই থাকে, এই ধরনের হালকা দর্শনের সাহায্যে প্রবোধ দিচ্ছেন নিজেকে তিনি। কমান্ডার হাম্মাম আর আনিসের মত তাঁরও ধারণা, যা ঘটার ঘটে গেছে, এর বেশি আর কিছু ঘটতে পারে না। কিন্তু ওদের তিনজনই মারাত্মক ভুল করছে। এই তো সবে শুরু, এখন একের পর এক দুর্ভোগের শিকার হতে যাচ্ছেন তিনি।

ঠিক এই মুহূর্তে তারই প্রস্তুতি চলছে।

নিট্‌লে রোয়ান আর্মারী।

আউটার রিসেপশন ডেস্কের সামনে তিনজন সামরিক অফিসার দাঁড়িয়ে রয়েছে। গম্ভীর, রাশভারী চেহারা সবার। প্রত্যেকের পরনে বিজনেস স্যুট। ডেস্কে বসে রয়েছে একজন করপোরাল। অফিসারদের আই. ডি. কার্ড পরীক্ষা করছে সে।

বিরাট একটা সেনাবাহিনী রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, অফিসাররা ক'জনেরই বা নাম জানে, ক'জনকেই বা চেনে। আই. ডি. কার্ডগুলো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে মুখ তুলে তাকাল করপোরাল। অফিসারদের পরিচয় সম্পর্কে সন্দেহ করার মত কিছু দেখছে না সে। তবে, এদেরকে এর আগে কখনও দেখেছে বলেও মনে পড়ছে না তার। অফিসারদের মধ্যে রয়েছে কর্নেল ফারগুসন, লেফটেন্যান্ট-কর্নেল সুয়িংস্ আর মেজর ডুরান্ড।

''কর্নেল ফারগুসন,' নিজের পরিচয় দিয়ে বলল কর্নেল, 'কর্নেল প্রাইজের সাথে দেখা করতে চাই।'

'দুঃখিত, স্যার,' বলল করপোরাল, 'তিনি এখন এখানে নেই।'

গম্ভীর ধমকের সাথে বলল কর্নেল ফারগুসন। 'তাহলে অফিসার ইনচার্জকে ডাকছ না কেন? কুইক ম্যান!'

'ইয়েস, স্যার!'

এক মিনিট পর। তটস্থ ক্যাপ্টেন নরডিকের সামনে বসে আছে অফিসাররা। এই মাত্র অফিসারদের আই. ডি. কার্ড পরীক্ষা করেছে ক্যাপ্টেন নরডিক। কোন খুঁত সে আশা করেনি, পায়ওনি।

'হুঁ,' ভারী গলায় বলল কর্নেল ফারগুসন, 'কর্নেল প্রাইজকে তাহলে ওয়াশিংটনে ডেকে পাঠানো হয়েছে।' সবজান্তার ভঙ্গিতে ওপর-নিচে মাথা দোলাল

সে। 'কারণটা যে কি, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না আমার।'
'কারণ···' জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল নরডিক, বাধা পড়ল।
'তার সেকেন্ড-ইন কমান্ড? সে কোথায়?' জানতে চাইল কর্নেল ফারগুসন।
'তাঁর ফ্লু হয়েছে, স্যার,' প্রায় মাফ চাওয়ার সুরে বলল ক্যাপ্টেন নরডিক।
'বছরের এই সময়ে?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল কর্নেল ফারগুসন, কণ্ঠে তীব্র ব্যঙ্গ। 'আর ঠিক আজকের দিনেই?' আবার ওপর-নিচে মাথা দোলাল কর্নেল ফারগুসন। 'বুঝতে পারছ কেন আমরা এসেছি এখানে?'
'ইয়েস, স্যার,' ম্লান গলায় বলল ক্যাপ্টেন নরডিক। 'সিকিউরিটি চেক। ফ্লোরিডা আর লুইসিয়ানা আর্মারী লুট হবার খবর ফোন করে জানানো হয়েছে আমাকে। আপনারা স্যার নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, এখানে সব ঠিক আছে।'
'কোন সন্দেহই নেই,' বলল কর্নেল ফারগুসন। তারপর চোখ গরম করে আবার বলল, 'এরই মধ্যে ত্রুটি ধরা পড়েছে আমার চোখে।'
'স্যার?' মুখের চেহারা পাংশু হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের।
'সিকিউরিটি-কনশাসনেসের ভয়ঙ্কর অভাব রয়েছে তোমাদের মধ্যে,' বলল কর্নেল। 'তুমি জানো, অন্তত এক ডজন দোকান থেকে একজন জেনারেলের কমপ্লিট ইউনিফর্ম কিনতে পারি আমি? যে-কেউ পারে। থিয়েটার আর সিনেমা কোম্পানীগুলো এদের কাছ থেকে এই সব পোশাক দরকার পড়লেই কিনছে। কেনা একটা ইউনিফর্ম পরে আমি যদি এখানে আসি, আমাকে তুমি জেনারেল বলে মেনে নেবে?'
একটু ইতস্তত করে বলল ক্যাপ্টেন, 'ইউনিফর্ম, এবং তার সাথে যদি জেনুইন একটা আই. ডি.কার্ড থাকে, হ্যাঁ, মেনে নেব, স্যার।'
'নিলে নিজের পায়ে কুড়ুল মারবে,' বলল কর্নেল। 'আজ যা করার করেছ, আর যেন এই ভুল না হয়।' ডেস্কের ওপর পড়ে থাকা নিজের আই.ডি. কার্ডের দিকে তাকাল সে। 'এ-ধরনের কার্ড জাল করা পানির মত সহজ কাজ। আজ থেকে মনে রাখবে, এই রকম নিষিদ্ধ এলাকায় কেউ যখন আসবে, তার ইউনিফর্ম আর আই. ডি. কার্ড যাই বলুক, তোমার প্রথম কাজ হবে তার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্যে এরিয়া কমান্ডের সাথে যোগাযোগ করা।'
'ইয়েস, স্যার। স্যার, আপনি এরিয়া কমান্ডের নাম জানেন? এখানে আমি নতুন কিনা···'
'মেজর জেনারেল অ্যাটকিনসন।'
রিসেপশন ডেস্কের করপোরালকে দিয়ে ফোন করাল ক্যাপ্টেন। লাইন পাওয়া গেল সাথে সাথেই। রিসিভারে ক্যাপ্টেন বলল, 'নিটলে রোয়ান আর্মারী। ক্যাপ্টেন নরডিক। জেনারেল অ্যাটকিনসনের সাথে কথা বলতে চাই।'
'এক সেকেন্ড,' অপরপ্রান্ত থেকে একাধিক ক্লিক ক্লিক শব্দ আসছে। তারপর সেই একই কণ্ঠ বলল, 'মেজর জেনারেলের সাথে কথা বলুন।'
'জেনারেল অ্যাটকিনসন?' জানতে চাইল ক্যাপ্টেন নরডিক।
'স্পিকিং,' আগের চেয়ে অনেক ভারী আর কর্কশ গলাটা। 'সমস্যা, ক্যাপ্টেন?'

'আমার সাথে কর্নেল ফারগুসন রয়েছেন স্যার। তাঁর পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্যে...'

'কর্নেল নিশ্চয়ই সিকিউরিটি সম্পর্কে লেকচার ছাড়ছে ওখানে?'

'না...মানে, হ্যাঁ, স্যার।'

'সিকিউরিটি সম্পর্কে সাংঘাতিক কড়া, এই কর্নেল ফারগুসন। সাথে নিশ্চিয়ই লেফটেন্যান্ট কর্নেল সুয়িংস আর মেজর ডুরান্ড আছে?' জানতে চাইল জেনারেল।

'জী, স্যার।'

'কড়া লোক, সন্দেহ নেই,' জেনারেল বলল, 'কিন্তু ভয় পেয়ো না, কোন ত্রুটি ধরা পড়লেও তোমার চাকরি খাবে না। গরম, টক আর ঝাল কিছু গালি শুনতে হবে, এই আর কি। কর্নেল ফারগুসন তাঁর দায়িত্ব পালন করে নিখুঁতভাবে, সেজন্যে তাকে আমরা বিশেষ সুনজরে দেখি।'

গাড়ির ড্রাইভিং সীটে কর্নেল ফারগুসন নিজেই বসেছে। তার পাশে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে আছে ক্যাপ্টেন নরডিক। তিন মাইল পেরিয়ে আর্মারী গেটের সামনে এসে থামল গাড়ি। গম্ভীর, থমথমে চেহারার চারকোনা একটা দালান—পনেরো ফিট উঁচু কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। ছোট্ট একটা সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে কাঁটাতারের বেড়াটা ইলেকট্রিফায়েড। স্পর্শ করা মাত্র মৃত্যু। দালানটায় কোন জানালা নেই, প্রায় আধ একর জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে, নিরেট।

খোলা গেটের ভেতর একটা মেশিন-কারবাইন হাতে নিয়ে টহল দিচ্ছে একজন সেন্ট্রি। ক্যাপ্টেন নরডিককে চিনতে পেরে ঠকাস করে স্যালুট ঠুকল সে।

গাড়ি নিয়ে সোজা আর্মারীর একমাত্র দরজার সামনে চলে এল কর্নেল ফারগুসন। চারজন নামল ওরা। ফারগুসন বলল, 'মেজর ডুরান্ড এর আগে কখনও কোন টি.এন.ডব্লিউ. আর্মারীর ভেতর ঢোকেনি। এখানকার ব্যাপার স্যাপার সম্পর্কে ওকে কিছু জানাতে পারো তুমি, ক্যাপ্টেন?'

সাথে সাথে বুঝে নিল ক্যাপ্টেন, তাকে পরীক্ষা করছেন কর্নেল। 'ইয়েস, স্যার,' দ্রুত বলল সে, 'টি.এন.ডব্লিউ—ট্যাকটিক্যাল নিউক্লিয়ার ওয়ারফেয়ার। তেত্রিশ ইঞ্চি মোটা দেয়াল, স্টীল আর ফেরো-কংক্রিটের তৈরি। দরজা—দশ ইঞ্চি পুরু স্টীল। চোদ্দ ইঞ্চি ইস্পাত ভেদ করে যেতে পারে এমন যে-কোন ন্যাভাল শেলকে ঠেকাতে পারে এই দেয়াল আর দরজা। এই যে গ্লাস প্যানেলটা দেখছেন, ওটা টিভি ভিডিও টেপে রেকর্ড করছে আমাদেরকে। আর এই জালের গ্রিলটা আসলে দু'মুখো একটা স্পীকার, আমাদের সবার কণ্ঠস্বর রেকর্ড করছে।' কংক্রিটের গায়ে একটা বোতাম রয়েছে, সেটায় আঙুলের চাপ দিতেই গ্রিলের ওপার থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'আইডেনটিফিকেশন, প্লীজ?'

'ক্যাপ্টেন নরডিক, সাথে ইন্সপেকশন টীম নিয়ে কর্নেল ফারগুসন।'

'কোড?'

'জেরোনিমো।'

প্রকাণ্ড, ভারী দরজাটা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে এক পাশে, শক্তিশালী ইলেকট্রিক্যাল মোটরের গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছে ওরা। পুরোটা খুলতে দশ সেকেন্ড সময় লাগল। ক্যাপ্টেন নরডিক পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে এল ওদেরকে।

দরজার ভেতর দাঁড়িয়ে আছে একজন করপোরাল. ওদেরকে স্যালুট করল সে। 'সিকিউরিটি ইন্সপেকশন ট্যুর,' বলল নরডিক।

'ইয়েস, স্যার।' করপোরালকে অপ্রতিভ, উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে।

'এত কিসের দুশ্চিন্তা তোমার, করপোরাল?' হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল কর্নেল ফারগুসন।

থতমত খেয়ে গেল করপোরাল। বলল, 'কই, না তো, স্যার।'

'উদ্বিগ্ন নও তুমি?' আবার জানতে চাইল কর্নেল।

'না…না, স্যার।'

'হওয়া উচিত,' বলল কর্নেল।

'আপনি কিছু গোলমাল লক্ষ করেছেন, স্যার?' নার্ভাস হয়ে পড়েছে ক্যাপ্টেন নরডিকও।

'একটা নয়, চার চারটে ত্রুটি দেখতে পাচ্ছি আমি।'

মাথাটা নিচু করে ঢোক গিলল ক্যাপ্টেন, যাতে দেখতে না পায় কর্নেল। চাকরি যাবে না বলে জেনারেল অ্যাটকিনসন আশ্বাস দিলেও, তাঁর কথার ওপর এখন আর ভরসা করতে পারছে না ক্যাপ্টেন।

'এক এক করে বলছি,' বলল কর্নেল, 'প্রথমে গেটের কথা। ওটা তালা মেরে বন্ধ করে রাখা উচিত। গেট খোলার আগে তোমাদের হেডকোয়ার্টারে ফোন করে জানানো দরকার যে তোমরা গেট খুলছ। খুলবে কিভাবে? তোমাদের অফিসে একটা বোতাম থাকবে, সেটা টিপে। তার মানে ইলেকট্রিক সিস্টেম। তা না হলে, যে কেউ একটা সাইলেন্সার লাগানো অটোমেটিক দিয়ে সেন্ট্রিকে খতম করে সোজা এখানে চলে আসতে পারবে। তারপর, ধরো, এই মুহূর্তে সে যদি একটা সাব-মেশিনগান নিয়ে এই দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকে? আমাদেরকে ব্রাশ ফায়ার করে ঝাঁঝরা করে দেয়? তার মানে, আমি বলতে চাইছি, আমরা ভেতরে ঢোকা মাত্র দরজাটা বন্ধ করে দেয়া উচিত ছিল।' করপোরাল শশব্যস্ত হয়ে দরজার দিকে এগোতে যাচ্ছে দেখে হাত নেড়ে তাকে বাধা দিল কর্নেল।

'তিন নম্বর কথা। এই বেসের লোক নয় যারা, এই যেমন আমরা, বেসে ঢোকা মাত্র তাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেয়া দরকার—এ বিষয়ে ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা করব আমি তোমাদের গার্ডদেরকে। চার নম্বর। এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ওই দরজার কন্ট্রোল দেখাও আমাকে।'

'এই যে, স্যার, এদিকে,' পথ দেখিয়ে ওদেরকে নিয়ে এল করপোরাল ছোট একটা কনসোলের কাছে। 'লাল বোতামটা টিপলে খুলবে, সবুজটা টিপলে বন্ধ হয়ে যাবে।'

সবুজ বোতামটায় চাপ দিল কর্নেল। হিস হিস আওয়াজের সাথে প্রকাণ্ড, ভারী দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। 'জঘন্য। বাজে। এর কোন মূল্যই নেই। দরজাটা অপারেট করার জন্যে এটাই কি একমাত্র কন্ট্রোল?'

'জ্বী, স্যার।' ঘামছে নরডিক।

'তাহলে তোমাদের হেডকোয়ার্টারের সাথে আরেকটা ইলেকট্রিক লিংক্ দরকার, সেটার মাধ্যমে সঠিক সিগন্যাল না আসা পর্যন্ত ওই বোতামগুলো কাজ

করবে না,' কর্নেল ফারগুসনকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। 'আমি তো ভেবেছিলাম এ-ধরনের সাধারণ সতর্কতা অবশ্যই অবলম্বন করা হয় এখানে।'

'এখন থেকে হবে, স্যার,' দুর্বল একটু হেসে বলল ক্যাপ্টেন।

'কনভেনশনাল এক্সপ্লোসিভ, বম্ব, আর শেলের পার্সেন্টেজ কি?'

'প্রায় নাইনটি-ফাইভ পারসেন্ট, স্যার।'

'নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্রগুলো আগে দেখব আমি।'

'নিশ্চয়ই, স্যার,' মন্ত্রমুগ্ধের মত পথ দেখিয়ে ওদেরকে নিয়ে চলল নরডিক।

টি.এন.ডব্লিউ, সেকশনের জন্যে আলাদা কমপার্টমেন্ট, কিন্তু সীল করা নয় সেটা। একদিকে লাইন করা র‍্যাকের ওপর সাজানো রয়েছে ন্যাভাল শেল। আরেক দিকে গম্বুজ আকৃতির ধাতব ট্রে দেখা যাচ্ছে, ত্রিশ ইঞ্চি উঁচু, একটা বোতাম আর ঘড়ির ডায়াল রয়েছে, মাথার ওপর প্যাঁচ লাগানো একটা স্ক্রু। এগুলোর পেছনে সাজানো রয়েছে অদ্ভুত আকৃতির ফাইবার গ্লাসের সুটকেস, প্রতিটির সাথে দুটো লেদার হ্যান্ডেল।

মেজর ডুরান্ড গম্বুজ আকৃতির ট্রেগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল। 'ওগুলো কি? বোমা?'

'বোমা এবং ল্যান্ডমাইন, দুটোই,' কথা বলার সুযোগ পেয়ে খুব খুশি নরডিক, সব উদ্বেগ মন থেকে উবে গেছে তার। 'ওপরের ওই কন্ট্রোল, তুলনামূলক বিচারে পানির মত সহজ। ওই লাল সুইচ দুটোর দিকে হাত বাড়াবার আগে আপনাকে স্ক্রু খুলে সরাতে হবে ট্রান্সপারেন্ট প্লাস্টিক কাভারগুলো, তারপর সুইচগুলো ডান দিকে নাইনটি ডিগ্রী ঘোরাতে হবে। তখনও ওগুলো সম্পূর্ণ নিরাপদ। এরপর সুইচগুলোকে বাম দিকে নাইনটি ডিগ্রী ঘুরিয়ে আনতে হবে। এইবার রেডি-টু-অ্যাকটিভেট পজিশনে চলে এসেছে।

'কিন্তু তা করার আগে ঘড়িতে টাইম সেট করে নিতে হবে আপনাকে। এই প্যাঁচ লাগানো স্ক্রুটার সাহায্য নিন। পুরো একটা প্যাঁচ ঘুরিয়ে আনার মানে এক মিনিট পর বিস্ফোরণ ঘটবে। ঘড়ির ডায়ালে মিনিট, সেকেন্ডের কাঁটা দেখতে পাচ্ছেন, কতক্ষণ পর বিস্ফোরণ ঘটাবেন তা ঠিক করে নিয়ে সেই মত স্ক্রুর প্যাঁচ ঘোরান, ঘড়ির ডায়াল দেখে কনফার্ম হয়ে নিন। মোট ত্রিশ মিনিট দেরি করতে পারবেন আপনি, সেক্ষেত্রে ত্রিশ বার ঘোরাতে হবে স্ক্রুর প্যাঁচ।'

'আর এই কালো বোতামটা?'

'ওটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিছু ঘোরাতেও হবে না, কোন কাভার সরাবারও দরকার নেই। মাইনটা আপনি হয়তো অকেজো করে দিতে চান, মানে বিস্ফোরণ না ঘটাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তখন ছুটে এসে এই কালো বোতামটা চেপে দিলেই বন্ধ হয়ে যাবে ঘড়ি, বিস্ফোরণ ঘটবে না আর।'

'কতটা এলাকা জুড়ে ক্ষতি হবে?'

'কনভেনশনাল অ্যাটম বোমার তুলনায় নগণ্য। সিকি মাইল এলাকার যাবতীয় সমস্ত কিছু বাষ্প হয়ে যাবে। অন্যান্য ক্ষতি আরও অনেক বড় এলাকা জুড়ে হবে।—ব্লাস্ট, শক, র‍্যাডিয়েশন।'

'তুমি বলছ, বোমা, আবার মাইন হিসেবেও ব্যবহার করা যায় এগুলোকে।'

'মাইন-এর প্রসঙ্গে আমার সম্ভবত বলা উচিত ছিল মাটিতে ব্যবহার করার জন্যে এটা একটা এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস। বোমা হিসেবে ব্যবহার করার সময় বিস্ফোরণের জন্যে এটাকে সেট করতে মাত্র ছয় সেকেন্ড সময় লাগে—ট্যাকটিক্যাল ওয়ারফেয়ারে এগুলোকে লো-ফ্লাইং সুপারসনিক প্লেনে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বোমা যখন ফাটবে তখন দু'মাইল দূরে সরে গেছে প্লেনটা, আর শক ওয়েভের চেয়ে দ্রুত গতিতে আরও দূরে সরে যাচ্ছে। মাটিতে রেখে ব্যবহার করার জন্যে—ধরুন, আপনি একটা অ্যামিউনিশন ডিপোতে অনুপ্রবেশ করতে চান। ভেতরে ঢুকতে, ভেতর থেকে বেরিয়ে ব্লাস্ট জোনের বাইরে সরে আসতে কতটা সময় লাগবে তা হিসেব করে নিয়ে টাইম সেট করুন, তাহলেই হবে।

'আচ্ছা, ওখানে ওই মিসাইলগুলো…'

'যথেষ্ট শোনা আর দেখা হয়েছে আমাদের,' আশ্চর্য শান্ত গলায় বলল কর্নেল ফারগুসন। 'এবার, ভাল মানুষের মত মাথার ওপর হাত তোলো।' কর্নেলের হাতে পিস্তল।

পাঁচ মিনিট পর। প্রচণ্ড অনিচ্ছুক ক্যাপ্টেন নরডিকের সাহায্য নিয়ে দুটো বোমা নিজেদের গাড়িতে তুলল ওরা। বোমাগুলো ক্যারিইং-কেসে লুকানো রয়েছে, তোলা হয়েছে গাড়ির ট্রাঙ্কে। বয়ে আনার সময় বোঝা গেল লেদার হ্যান্ডেল দুটোর দরকারটা কি। নিদেনপক্ষে নব্বুই পাউন্ড ওজন প্রতিটি বোমার।

আবার ভেতরে ঢুকে হাত-পা বাঁধা দু'জন করপোরালের দিকে তাকাল ফারগুসন, হাসল একটু, তারপর সবুজ বোতামে চাপ দিয়ে দ্রুত এগিয়ে এল দরজার দিকে। সেটা বন্ধ হয়ে যেতে শুরু করেছে। বাইরে বেরিয়ে এসে দরজাটা পুরো বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে, তারপর গাড়ির সামনের সীটে ক্যাপ্টেন নরডিকের পাশে উঠে বসল। ফেরার পথে এবার গাড়ি চালাচ্ছে ক্যাপ্টেন। 'ভুলো না, একটু চালাকি করার চেষ্টা করলেই মারা যাবে তুমি,' বলল ফারগুসন। 'সেক্ষেত্রে তুমি একা নও, সেন্ট্রিকেও মরতে হবে।'

কোন ভুল বা চালাকি করল না ক্যাপ্টেন। আর্মারী থেকে এক মাইল দূরে একটা জঙ্গলের পাশে গাড়ি দাঁড় করাতে বলা হলো নরডিককে। গাড়ি থেকে নামিয়ে গভীর জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। প্রথমে হাত আর পা নাইলনের রশি দিয়ে বাঁধা হলো তার, মুখে গুঁজে দেয়া হলো খানিকটা তুলো, তারপর তাকে একটা গাছের সাথে শক্ত করে আবার বাঁধা হলো, যাতে সে গড়িয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতে না পারে। ফারগুসন সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বলল, 'তোমাদের সিকিউরিটি এক্কেবারে বাজে। জঘন্য। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফোন করব তোমাদের হেডকোয়ার্টারে, বলে দেব কোথায় তোমাকে খুঁজে পাবে ওরা।' একটু থেমে চারদিকে তাকাল সে। আশা করি খুব বেশি সাপ বা বিছে নেই এদিকে।'

আরও এক মাইল দূরে এসে একটা টেলিগ্রাফ পোলের পাশে গাড়ি দাঁড় করাল ফারগুসন। পোলের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন লোক, হাতে একটা ব্যাটারি চালিত ট্র্যান্সিভার। টেলিগ্রাফ লাইনের একটা ক্লিপের সাথে ট্র্যান্সিভারটা সংযুক্ত করে খানিক আগে ক্যাপ্টেন নরডিকের সাথে কথা বলেছে সে। লোকটার

অদ্ভুত একটা গুণ হলো, নিজের গলার স্বর অনেকভাবে বদলাতে পারে। ক্যাপ্টেন নরডিক তার গলা শুনে একবারও সন্দেহ করেনি যে সেটা জেনারেল অ্যাটকিনসনের কণ্ঠস্বর নয়।

ভুয়া টেলিফোন কল করে কর্নেল প্রাইজকে আর্মারী থেকে সরিয়ে দেবার কৃতিত্বও এই লোকেরই।

গাড়িতে উঠে বসল লোকটা। 'সব ঠিকঠাক মত শেষ হয়েছে?'

'না হবার কি আছে,' বলল ফারগুসন। হাসছে সে। তারপর আবার বলল, 'যতটা আশা করি তার চেয়ে বেশি পারিশ্রমিক দেয় জন হেকটর। ওর কাজ করে আরাম পাই।'

'এবার ওকে অ্যাটম বোমা যোগান দিচ্ছি,' বলল ডুরান্ড। 'রীতিমত বড়লোক হয়ে যাব আমরা।'

সাগর কন্যা-২

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর, ১৯৮০

এক

নাফাজ ম্যানসন। রেডিও রুম। আনিসকে নিয়ে অপেক্ষা করছে মাসুদ রানা।

শিরি ফারহানাকে নিয়ে কিডন্যাপাররা ফ্লোরিডার বিশাল বিল আর জলাভূমি এলাকায় আত্মগোপন করে থাকতে পারে, কথাটা কাউন্টি পুলিস চীফ উইলিয়াম সালজকে ঘণ্টাখানেক আগে জানানো হয়েছে। যে-কোন মুহূর্তে একটা খবর পাবে বলে আশা করছে ওরা। একটা ওয়ায়ারলেস মেসেজ আসতে শুরু করেছে, রেডিও অপারেটর একরাম লোয়াঙ্গোর দিকে তাকিয়ে আছে আনিস। মলিন চেহারায় হঠাৎ উত্তেজনার ছাপ পড়েছে তার। একটা সিগার ধরাচ্ছে রানা।

রেডিও কনসোল থেকে মুখ তুলে তাকাল একরাম লোয়াঙ্গো। 'পুলিস চীফ উইলিয়াম সালজ।'

কাছাকাছি রয়েছে আনিস, প্রায় ছোঁ মেরে একরামের বাড়ানো হাত থেকে রিসিভারটা নিল সে।

'মি. আনিস?' অপরপ্রান্তে আনন্দে অধীর পুলিস চীফ সালজের কণ্ঠস্বর। 'কিডন্যাপারদের স্টেশন ওয়াগন পেয়েছি আমরা। ওয়েনি জলার ধারে। ট্র্যাকার ডগ নিয়ে আমি নিজে যাচ্ছি ওখানে। আপনাদের জন্যে ওয়ালনাট ট্রি ক্রসিঙের মোড়ে অপেক্ষা করব।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে উজ্জ্বল মুখ তুলে তাকাল আনিস রানার দিকে। 'স্টেশন ওয়াগনটা খুঁজে পেয়েছে ওরা,' বলল সে। 'সালজকে খুব আশাবাদী মনে হলো।'

'নিশ্চয়ই খালি, তাই না?' বলল রানা। 'বোকাটা কি বুঝতে পারছে না, সমস্যা আরও জট পাকাল, সরল হলো না? এতক্ষণ আমরা অন্তত জানতাম কিডন্যাপাররা কি ধরনের গাড়ি ব্যবহার করছে। এখন জানি না। নিশ্চয়ই সাংবাদিক আর ক্যামেরাম্যানকে খবর দিয়েছে?'

'তা কিছু বলেনি। শুধু বলল, সাথে কুকুর নিয়ে রওনা হচ্ছে।'

'শিরির কোন কাপড়চোপড় সাথে নিতে বলেছে?' জানতে চাইল রানা। 'কুকুরগুলোকে কিছু শুঁকতে দিতে হবে না?'

এদিক ওদিক মাথা দোলাল আনিস। ঘণ্টা বাজিয়ে হেড বাটলার আয়েদ আবদালীকে ডাকল রানা। বলল, 'মিস্টার আবদালী, লুসিকে এখানে একবার পাঠিয়ে দাও।'

একটু পরই রেডিও রুমে ঢুকল হাউজমেইড লুসি। আনিস তাকে বলল, 'শিরির যে-কোন একটা কাপড় দরকার আমাদের, প্রায়ই পরত সে এমন একটা কিছু হলে

ভাল হয়।'

একটু বোকা বোকা লাগছে লুসিকে। 'স্যার, মানে, আমি ঠিক...'

'শিরির গায়ের গন্ধ দরকার আমাদের,' ব্যাখ্যা করল আনিস, 'ব্লাডহাউন্ডকে শুঁকতে দিতে হবে।'

মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবার লুসির। 'বুঝেছি, স্যার। ম্যাডামের ড্রেসিং গাউন হলে চলবে?'

মাথা ঝাঁকাল আনিস। 'হাত দিয়ে না ধরে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে নিয়ে এসো।'

ওয়ালনাট ট্রী ক্রসিং। একটা পুলিস কার আর একটা চারদিক ঢাকা ছোট পুলিস ভ্যান অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে। কারের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুলিস চীফ সালজ। ছোটখাট শরীর, চেহারাটা ভোঁতা, একবার চোখ বুলালেই বোঝা যায় লোকটা অযোগ্য পুলিস অফিসারদের প্রতীক। হাসিটা সব সময় লেগেই আছে মুখে, তাতে চেহারাটা আরও চ্যাপ্টা লাগে দেখতে।

ওরা গাড়ি থেকে নামতেই সিধে হয়ে দাঁড়াল চীফ সালজ। এগিয়ে এসে করমর্দনের জন্যে বাড়িয়ে দিল হাতটা। তার হাতটা ধরে ঝাঁকি দিয়ে আনিস পাশে দাঁড়ানো রানাকে দেখাল ইঙ্গিতে, বলল, 'আমার সহকারী।' এটুকু বলেই ক্ষান্ত হলো সে, নামটা পর্যন্ত জানাল না। চীফ সালজও সহকারীর নাম জানতে চাইল না। ভাল করে তাকালই না সে রানার দিকে।

পুলিস কারের ভেতরে ক্যামেরা নিয়ে বসে রয়েছে একজন লোক। তার দিকে ইঙ্গিত করে চীফ সালজ বলল, 'ডেলি হেরাল্ডের সাংবাদিক, আসার পথে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল, পিছু নিয়ে চলে এসেছে।' ডাহা মিথ্যে কথা বলছে চীফ। নিজের কৃতিত্ব জাহির করার জন্যে সাংবাদিককে খবর দিয়ে আনিয়েছে সে।

'আমার ড্রাইভাররাই ডগ-হ্যান্ডলার,' বলল চীফ। 'আমাদেরকে ফলো করুন, প্লীজ।'

যে যার গাড়িতে আবার উঠে বসল সবাই। পাঁচ মাইল এগিয়ে একটা বাঁক নিল গাড়িগুলো। ওয়েনি জলাভূমি এখান থেকেই শুরু হয়েছে। গাছপালার নিচু ডালপালা গাড়ির মাথা ছুঁই ছুঁই করছে, দিনের বেলাই প্রায় অন্ধকার এদিকটা। রাস্তাটা ভাঙাচোরা, কোথাও টলমল করছে গর্ত ভরা পানি, কোথাও থকথকে কাদা। আগাছাগুলো পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। মোটেও স্বাস্থ্যকর নয় পরিবেশটা, কিন্তু জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বহু লোকজন বসবাস করছে এখানে, সম্ভবত দুর্গন্ধ নিবারক নাক নিয়েই জন্মগ্রহণ করে তারা। আবার একটা বাঁক নিল ওরা। এরপর আর রাস্তা নেই সামনে। পানিতে ডোবা কাদায় আগাছার ঘন বিস্তার ছাড়া দেখার কিছু নেই অনেকদূর পর্যন্ত। স্টেশন ওয়াগনটা রাস্তার শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, সামনের চাকা দুটো ডুবে রয়েছে কাদা-পানিতে।

চীফ সালজ-এর প্রথম কাজ ক্যামেরাম্যানকে দিয়ে ছবি তোলানো। নানা দিক থেকে ছবি তোলা হলো স্টেশন ওয়াগনটার, প্রতিটি ছবিতে চীফ সালজ থাকল। এরপর ক্যামেরাম্যা·. ·ার ক্যামেরায় একটা ফ্ল্যাশলাইট ফিট করে নিয়ে স্টেশন

ওয়াগনের পেছনের দরজার হাতলের দিকে হাত বাড়াল, উদ্দেশ্য গাড়িটার ভেতরের ছবি তোলা। কিন্তু হাতলে হাত দেবার আগেই রানা তার কাঁধ খামচে ধরে টেনে আনল নিজের দিকে। 'অ্যাই, তুমি ছাগল নাকি?'

প্রায় রুখে উঠে রানার মুখোমুখি হলো সাংবাদিক। 'কেন?'

'এর আগে কোন ক্রিমিনাল কেসে আসোনি বুঝি?' শান্তভাবে বলল রানা, 'ফিঙ্গারপ্রিন্ট নষ্ট করতে যাচ্ছিলে তুমি।' চীফ সালজের দিকে তাকাল ও। 'এক্সপার্টরা কোথায়?'

'এই এসে পড়ল বলে। আরেকটা কেসে গেছে। ডন, খবর নাও ওদের।' ডন একটা গাড়ির ড্রাইভার, সাথে সাথে রেডিও নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। তাকে একটা হাসি দমন করতে দেখল রানা, বুঝল, সাথে করে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট নিয়ে আসার কথা মাথায় ঢোকেইনি চীফ সালজের।

ভ্যান থেকে নামানো হলো এক জোড়া কুকুর। প্লাস্টিকের ব্যাগ খুলে শিরির ড্রেসিং গাউনটা শুঁকতে দিল আনিস কুকুর দুটোকে।

'কি ওটা?' চীফ সালজ ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল।

'আপনার অযোগ্যতা যাতে ধরা না পড়ে তার জন্যে কোন ত্রুটি করছি না আমরা,' বলল রানা। 'ওটা একটা ড্রেসিং গাউন, শিরি ফারহানা পরত। কুকুরগুলোকে গন্ধ চেনাবার জন্যে নিয়ে এসেছি। জানতাম, কথাটা আপনার মনে থাকবে না।'

রাগে লাল হয়ে উঠল চীফ সালজের মুখ। কিন্তু সে মুখ খোলার আগেই সহাস্যে বলল আনিস, 'আপনাকে তো আমরা কথা দিয়েছি, চীফ, সব রকম সহযোগিতা পাবেন আপনি আমাদের কাছ থেকে।'

রাগটা প্রকাশ করা উচিত হবে কিনা বুঝতে না পেরে চুপ করে থাকল পুলিস চীফ।

নাকে ঘ্রাণ পেয়েই চঞ্চল হয়ে উঠল কুকুর দুটো, ড্রাইভারদের হাতে ধরা চেইনে টান পড়ল। পায়ে হাঁটা একটা পথ ধরে দ্রুত কুকুর দুটোর পিছু পিছু এগোচ্ছে তারা। নাক দিয়ে ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ছাড়ছে ব্লাডহাউন্ড দুটো, মাটি শুঁকতে শুঁকতে এগোচ্ছে। একশো গজ এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই। সামনে পানি। ঠিক জলা নয়, পানি ভর্তি একটা খাল। এদিকের পাড়ে মাটির তৈরি কয়েকটা ধাপ, খালের ওদিকের পাড়েও তাই দেখা যাচ্ছে। মাটিতে পোঁতা একটা খুঁটির সাথে বাঁধা রয়েছে ভাঙাচোরা একটা ডিঙি নৌকা। হাঁটু সমান পানি ভেঙে ডিঙিটাকে এপারে নিয়ে এল একজন ড্রাইভার। খুব সাবধানে তাতে উঠে বসল কুকুর দুটো।

নৌকা থেকে খালের ওপারে নেমে প্রথমে খুব চাঞ্চল্য প্রকাশ করল কুকুর দুটো, কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সমস্ত উৎসাহ উবে গেল তাদের। মাটির ধাপে বসে পড়ল তারা, নিরাশ ভঙ্গিতে খালের এপারে তাকিয়ে আছে।

'আফসোস,' অপরিচিত একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'মনে হচ্ছে, গন্ধ খুঁজে পাচ্ছে না ওরা।'

খালের এপারের ওরা চারজন এক যোগে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। পায়ে চলার পথটা ধরে ওদের ঠিক পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে একজন লোক। লম্বা-চওড়া শরীর,

মাথায় পানামা হ্যাট। পায়ে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা মোটা চামড়ার গামবুট। 'কাউকে পাকড়াও করার জন্যে এসেছেন আপনারা, ধরে নিতে পারি?' আবার বলল লোকটা।

'হ্যাঁ, খুঁজছি,' সতর্ক হয়ে উঠে বলল আনিস।

'আপনারা আইনের লোক, ঠিক?'

'চীফ অভ পুলিস, সালজ।' নিজেকে জাহির করল অফিসার।

'কী সৌভাগ্য!' সরল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল লোকটার মুখ। 'ভাল কথা, চীফ, আসলে আপনি সময় নষ্ট করছেন। খালের এপারে গন্ধ পাচ্ছে কুকুর দুটো, ওপারে পাচ্ছে না—কি বোঝা যায় এ থেকে? বোঝা যায়, খালের মাঝখান পর্যন্ত গেছে আপনাদের শিকার, তারপর নৌকা থেকে নেমে...'

'ওদেরকে দেখেছেন আপনি?' সন্দেহের সুরে জানতে চাইল চীফ সালজ।

'আচ্ছা! শিকার তাহলে একজন নয়, কয়েকজন? না, স্যার। এই তো মাত্র এলাম। কিন্তু কথা হলো পুলিসের চোখে ধুলো দিতে হলে আমিও ওই কাজ করতাম। সবাই তাই করে। খালের মাঝখানে নেমে উজান বা ভাটির যেদিকে ইচ্ছে এক আধ মাইল অনায়াসে পায়ে হেঁটে চলে যেতে পারেন, শুকনো মাটিতে একবারও পা ফেলতে হবে না। এই খালের সাথে এসে মিশেছে কয়েক ডজন নালা, সেগুলোর যে-কোন একটা ধরে আরও বহু দূরে চলে যেতে পারেন আপনি।'

'কতটুকু গভীর খালটা?'

'পনেরো ইঞ্চি। কোথাও একটু বেশি, কোথাও একটু কম।'

'তাহলে ওপারে যেতে নৌকার কি দরকার?' চীফ সালজ জানতে চাইল। 'মানে, আপনি যে ধরনের বুট পরে আছেন, পা না ভিজিয়েই তো খাল পেরোতে পারেন।'

আগন্তুককে সলজ্জ ভঙ্গিতে হাসতে দেখছে ওরা। বলল, 'তা পারি। কিন্তু এই বুটটা খুব প্রিয় কিনা আমার, রোজ কাদা-পানি লাগিয়ে নষ্ট করতে চাই না। তাছাড়া এদিকে সাপের বড় ভয়, তাই এটা পায়ে না দিয়েও পারি না।' একটু থেমে আবার বলল সে, 'নৌকা? বৃষ্টি হলে এই এতটা গভীর হয়ে ওঠে খালের পানি।' নিজের বুক স্পর্শ করে দেখাল সে।

ড্রাইভারদেরকে কুকুর নিয়ে এপারে চলে আসতে বলল চীফ সালজ।

'জলায় এমন কোন জায়গা আছে যেখানে হেলিকপ্টার নামতে পারে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'প্রচুর জায়গা আছে। কখনও কোন 'কপ্টার দেখিনি বটে। হ্যাঁ, শক্ত ফাঁকা মাটি প্রচুর আছে।'

কুকুরগুলোকে নিয়ে ড্রাইভারটা নৌকা থেকে নামল। ঝুঁকে পড়ে বুট থেকে মিহি ধুলো ঝাড়ছে আগন্তুক, সেই অবস্থায় তাকে রেখে পেছন ফিরল ওরা। হেঁটে ফিরে আসছে স্টেশন ওয়াগনের কাছে। 'এক মিনিট,' বলল রানা। 'একটা কথা ভাবছি আমি।' আনিসের হাত থেকে প্লাস্টিক ব্যাগটা নিয়ে শিরি ফারহানার ড্রেসিং গাউনটা বের করে কুকুর দুটোকে শুঁকতে দিল ও। তারপর ইঙ্গিত করল

ড্রাইভারদের।

প্রথমে তেমন উৎসাহ দেখাল না কুকুর দুটো। পায়ে চলা পথটা পেরিয়ে, স্টেশন ওয়াগন আর ওদের গাড়িগুলো ছাড়িয়ে, চলে এল রাস্তায়। আরও বিশ গজ এগোবার পর অনিচ্ছা-ভাবটা হঠাৎ দূর হয়ে গেল, রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠল কুকুর দুটো। ঘেউ ঘেউ করছে; চেইনে টান পড়ায় প্রায় ছুটতে হচ্ছে এখন ড্রাইভারদেরকে। আরও বিশ গজ এগিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। তারপর ছোট্ট একটা জায়গাকে ঘিরে কয়েকবার চক্কর মেরে ক্লান্ত, নিরাশ ভঙ্গিতে বসে পড়ল আবার। হাঁটু মুড়ে ওদের পাশেই বসল রানা, মাটি পরীক্ষা করছে। বাকি সবাই পৌঁছুল এতক্ষণে।

'কি লাভটা হলো?' জানতে চাইল চীফ সালজ, গলায় বেশ একটু ঝাঁঝ আর ব্যঙ্গ।

'এইটুকু,' মাটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল রানা। 'যার চোখ আছে সেই এখন দেখতে পাবে। আরেকটা গাড়ি ছিল এখানে। পিছু হটার সময় গাড়িটার পেছনের চাকা পিছলে গিয়েছিল, দাগটা অন্তত তাই প্রমাণ করে। কিডন্যাপাররা জানত আমরা কুকুর ব্যবহার করব—এটা অনুমান করা এমন কোন কঠিন ব্যাপার নয়। সেজন্যে বিশ গজের মত দূরত্ব পেরিয়েছে ওরা শিরি ফারহানাকে মাটি থেকে কাঁধে তুলে নিয়ে, যাতে ওর গায়ের গন্ধটা মাটিতে না থাকে। তারপর ওকে নিয়ে আরেকটা গাড়িতে উঠেছে তারা।'

'মাথাটা ভাল আপনার,' বলল চীফ সালজ। 'স্বীকার না করে উপায় দেখছি না।' কিন্তু মুখের চেহারা দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে মোটেই খুশি হতে পারেনি সে। 'তার মানে, চিড়িয়া ভেগেছে। এখন আমরা জানিও না কি ধরনের গাড়ি...'

বাধা দিয়ে বলল রানা, 'কেউ ভেগেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। হয়তো একজন বা দু'জন। তারা হয়তো একটা হেলিকপ্টার নিয়ে আসতে গেছে।'

'হেলিকপ্টার?' জীবনে যেন এই প্রথম শব্দটা শুনছে চীফ সালজ। 'হেলিকপ্টার কেন?'

ধৈর্য ধরে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করল রানা, 'ব্যাপারটা ডাবল ব্লাফও হতে পারে। শিরিকে মাটি থেকে তুলে নেবার পদ্ধতিটা দু'বার কাজে লাগিয়ে থাকতে পারে ওরা, আবার হয়তো স্টেশন ওয়াগনেই ফিরে গেছে। হয়তো এখনও ওরা জলার মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে আছে। অপেক্ষা করছে একটা হেলিকপ্টার এসে ওদেরকে তুলে নিয়ে যাবে বলে। ওই স্থানীয় লোকটার কথা তো শুনলেন, 'কপ্টার নামার মত প্রচুর ফাঁকা জায়গা আছে এদিকে।'

'ঠিক,' রানাকে সমর্থন করে প্রায় বিদ্যুৎ গতিতে মাথা ঝাঁকাল চীফ সালজ। 'মিস্টার সহকারী, আপনার মাথাটা আমার চেয়ে খারাপ নয় কোন অংশে, প্রায় আমার মতই ভাল। যাক, সমস্যার সমাধান তাহলে তো হয়েই গেল।'

অবাক হয়ে জানতে চাইল রানা, 'সমাধান হয়ে গেল মানে? কিভাবে?'

'হেলিকপ্টার ওদেরকে তুলে নিতে আসবে, সে-ব্যাপারে এখন আর আমার মনে কোন সন্দেহ নেই,' বলল চীফ সালজ। 'লক্ষ্য ভেদে অব্যর্থ লোক মোতায়েন করছি আমি চারদিকে, একটা 'কপ্টারকে গুলি করে নামানো—এ আর তেমন কি

কঠিন কাজ?'

'না, কঠিন নয়,' বলল আনিস, 'তবে, বোকামির কাজ হবে সেটা।'

'কেননা,' বলল রানা, 'ওটাকে যদি আপনি গুলি করে নামান, আপনার বিরুদ্ধে, চীফ সালজ, খুনের অভিযোগ আনা হতে পারে। আইনে খুন করা গুরুতর অপরাধ, এ-কথা আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে?'

'খুনের কথা উঠছে কেন?' সদা হাস্যময় চীফ সালজ বিশুদ্ধ বিস্ময়ে এই মুহূর্তে হাসতে ভুলে গেছে।

'আমরা তুলছি, তাই উঠছে,' বলল রানা। 'রাইফেল বা মেশিনগানের গুলি খেয়ে কেউ মারা যেতে পারে। আর যদি 'কপ্টারটাই পড়ে যায়, সম্ভবত ওরা সবাই মারা যাবে। 'কপ্টারে যারা থাকবে তারা হয়তো ক্রিমিনাল, কিন্তু আইনে আছে তাদেরকে মেরে ফেলার আগে নিরপেক্ষ বিচার হওয়া চাই। তাছাড়া, ভেবে দেখেছেন, হাইজ্যাক করা 'কপ্টার হতে পারে ওটা, নিরীহ পাইলটকে হয়তো পিস্তল দেখিয়ে নিয়ে আসবে ওরা।'

'তাহলে আমার এখন করণীয় কি?' জানতে চাইছে পুলিস চীফ।

আনিস বলল, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনাকে ধার দেবার মত বুদ্ধি নেই আমাদের। লোকজন রাখতে পারেন এদিকে। একটা হেলিকপ্টারও আনিয়ে রাখতে পারেন। ওদেরটা যদি আসে, সেটাকে ধাওয়া করতে পারবে।'

'এখানে আমাদের আর কিছু করার নেই,' বলল রানা। 'এমনিতেই অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। যোগাযোগ রাখব আমরা।'

নিজেদের গাড়িতে উঠে হাইওয়ে ধরে ফিরে আসছে ওরা। 'মানুষ ধরা তো দূরের কথা, লোকটা একটা কুকুর ধরারও উপযুক্ত নয়,' বলল আনিস। 'মাসুদ ভাই, হেলিকপ্টার ব্যবহার করার সম্ভাবনা কতটুকু ওদের?'

'প্রচুর। শুধু গাড়ি বদল করার ইচ্ছে থাকলে এত সতর্কতা অবলম্বন করত না ওরা। ইচ্ছে করলেই চোখের আড়ালে রাখতে পারত স্টেশন ওয়াগনটা, এত সহজে খুঁজে বের করা যেত না। আমরা যাতে সহজে খুঁজে পাই সেজন্যেই ওখানে রেখে গেছে ওটা। তাতে আমরা ভাবব, জলার কোথাও বেশ কিছু সময় থাকার ইচ্ছে রয়েছে ওদের। ওরা তো আর ভাবেনি রাস্তায় ফিরে এসে ওদের কৌশলটা আবিষ্কার করার চেষ্টা করব আমরা।'

ম্লান মুখে চুপ করে বসে আছে আনিস পাশের সীটে। শিরির জন্যে দুশ্চিন্তায় ভারী হয়ে রয়েছে মনটা।

'ওরা যে শিরিকে নিয়ে সাগর কন্যায় যাবে, তাতে আমাদের কোন সন্দেহ নেই,' বলল রানা। 'হেলিকপ্টার ব্যবহার করবে, তাও জানি। কিন্তু কার হেলিকপ্টার, বলো তো দেখি?'

চট করে জবাব দিল আনিস, 'নাফাজ মোহাম্মদের।'

'কেন, তা জানো?' বলল রানা। 'দুটো কারণে। একমাত্র মি. নাফাজের পাইলটরাই জানে সাগর কন্যায় কিভাবে নামতে হয়, নতুন কোন পাইলটের পক্ষে কাজটা খুবই কঠিন। আরেকটা কারণ, একমাত্র মি. নাফাজের হেলিকপ্টারকে আসতে দেখলে সাগর কন্যার কমান্ডার আর ভাড়া করা যোদ্ধারা কিছু বলবে না।

অন্য কোন 'কপ্টার দেখা মাত্র গুলি করবে ওরা।'

রেডিও-ফোনের দিকে দ্রুত হাত বাড়াল আনিস, ওয়েভব্যান্ড ঠিকঠাক করে নিয়ে যোগাযোগ করল নাফাজ ম্যানসনের সাথে। 'একরাম?'

'অ্যাট মাই পোস্ট, মি. আনিস।'

'ফিরছি আমরা। মি. নাফাজের অ্যাড্রেস বুকটার ওপর চোখ বুলাও। রেডিও রুমেই কোথাও আছে ওটা। তাড়াতাড়ি হেলিকপ্টার পাইলটদের নাম আর ঠিকানার একটা তালিকা তৈরি করে ফেলো। হেলিপোর্টের গেটকীপারের সাথে রেডিও যোগাযোগ আছে কি?'

'আছে, স্যার।'

'ওর নাম-ঠিকানাও তালিকায় রাখো। তারপর সবার খোঁজ নাও। দেখো কে কোথায় আছে।'

'ইয়েস, স্যার।'

কানেকশন কেটে দিয়ে রানাকে জিজ্ঞেস করল আনিস, 'মাসুদ ভাই, আপনি কি এখনও মনে করেন, আমাদের সন্দেহের কথা কমান্ডার লিল হাম্মামকে জানানো উচিত হবে না?'

'হেকটর বা হেকটরের লোকজন সাগর কন্যায় আসছে শুনলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে কমান্ডারের,' বলল রানা। 'শুনেছি, সাগর কন্যাকে নাকি সে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসে। 'কপ্টারে শিরি আছে, সে-কথা খেয়ালই থাকবে না তার। খেয়াল থাকলেও, ঝোঁকটা সামলাতে পারবে না। হেকটরকে বাধা দেবার জন্যে সম্ভাব্য সব চেষ্টা করবে সে। আর বাধা দেবার একমাত্র উপায়, গুলি ছোঁড়া। শুধু শিরির কথা ভেবে নয়, হেকটরকে আমি জীবিত ধরতে চাই বলেও ঝুঁকিটা নিতে চাইছি না।'

'অবশ্য, আমাদের সন্দেহ সত্যি নাও হতে পারে,' বলল আনিস।

'মিথ্যে হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল রানা।

পরে রানার ধারণাই সত্যি বলে প্রমাণিত হলো। কিন্তু তখন অনেক দেরি করে ফেলেছে ওরা।

অবসর সময়ে দুটো নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে কার্ল সেগান। মাছ ধরা, আর বই পড়া। ব্যাপারটা অদ্ভুত এবং হাস্যকর বলে মনে হলেও একই সাথে দুটো নেশা চর্চা করার একটা অভ্যাস গড়ে নিয়েছে সে। বাড়ির পেছনেই ছোট একটা নদী, তাতে মাছ আদৌ আছে কিনা জিজ্ঞেস করলে ঠিক জবাব দিতে পারবে না সে। কেননা এই নদী থেকে মাছ সে ধরেছে, কিন্তু শেষবার কবে ধরেছে তা আজ আর তার মনে নেই। এই মুহূর্তে পানিতে টোপ ফেলে চেয়ারে বসে আছে সে। গভীর মনোযোগ দিয়ে ফাৎনার দিকে নয়, কোলের ওপর খোলা বইটার দিকে তাকিয়ে আছে। তার দু'পাশে দু'জন লোক এসে দাঁড়াল। কন্ডি আর তার এক সহকারী—টমসন। দু'জনই কালো মুখোশ পরে আছে। খুক্ করে কাশল কন্ডি। একটুও চমকাল না কার্ল সেগান। নিজের দু'দিকে তাকাল একবার করে। দেখল ওদেরকে। তারপর নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। পায়ের ধাক্কায় পড়ে গেল ক্যানভাসের চেয়ারটা। বইটা

এখনও ধরে রয়েছে হাতে। 'তোমরা কারা? কি চাও? মাছ?'
'মাছ নয়। তোমাকে চাই। তুমি কার্ল সেগান, তাই না?'
'বলব না। আগে বলো কার্ল সেগানকে কি দরকার তোমাদের।'
'তার কোন ক্ষতি করতে আসিনি আমরা,' বলল কন্ডি। 'তাকে দিয়ে সামান্য একটা কাজ করিয়ে নিতে চাই।'
'কি কাজ?'
'আমাদেরকে হেলিকপ্টারে তুলে এক জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে।'
'অসম্ভব!' দৃঢ় গলায় বলল কার্ল সেগান। 'আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন কাজ আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে দিয়ে করাতে পারেনি।'
'তার মানে, তুমিই সেগান।' হাসছে কন্ডি, মুখোশের ভেতর থেকে উৎফুল্ল আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। পকেট থেকে হাত বের করল সে। চকচকে নীলচে পিস্তলটা ধরল সেগানের বুকের দিকে। 'এসো।'
একবার টমসন, তারপর কন্ডির দিকে তাকাল কার্ল সেগান। নিঃশব্দে পা বাড়াল সে। তাকে মাঝখানে নিয়ে এগোচ্ছে ওরা। কন্ডি আর টমসন প্রায় ছয় ফিট উঁচু, তাদের মাথাকে ইঞ্চিখানেক ছাড়িয়ে গেছে সেগান। 'তোমাদেরকে চিনি নাকি, যে মুখোশ পরে আছ?' জানতে চাইল সে।
উত্তরে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কন্ডি, অকস্মাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল সেগানের শরীরে। কন্ডির পিস্তল ধরা হাতের কব্জিতে ডান হাত দিয়ে প্রচণ্ড একটা বাড়ি মারল সে। ব্যথায় ককিয়ে উঠল কন্ডি, ছিটকে পড়ে গেছে হাত থেকে পিস্তলটা। পরমুহূর্তে একজন আরেক জনকে দুই জোড়া হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। কেউ কাউকে ছাড়ছে না, কনুই চালাচ্ছে, হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারছে, খামচে ধরছে মাথার চুল। তফাতে সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে টমসন, কন্ডির পিস্তলটা এখন তার হাতে। কিন্তু গুলি করার কোন ইচ্ছে নেই তার, যদি না একান্তই কন্ডির প্রাণ বিপন্ন হয়ে পড়ে। সে-সম্ভাবনা একেবারে যে নেই, তা নয়। দেখেশুনে তার মনে হচ্ছে, কন্ডির চেয়ে সেগানের গায়ের জোর বেশি। ওদের সাথে টমসনও লাফ দিয়ে ঘন ঘন জায়গা বদল করছে, উদ্দেশ্য এক সুযোগে সেগানকে আহত করা। কিন্তু কোন সুযোগ পাচ্ছে না সে।
মুহূর্তের জন্যে কন্ডিকে ছেড়ে দিল সেগান। ভাঁজ হয়ে উঠে আসছে তার একটা হাঁটু, কন্ডির তলপেটে প্রচণ্ড একটা গুঁতো মারল সে। তীব্র ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখছে কন্ডি, বাঁকা হয়ে গেছে তার শরীরটা, পড়ে যাচ্ছে পেছন দিকে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে অন্ধের মত হাত বাড়িয়ে খামচে ধরল সে সেগানের শার্ট। পড়ে গেল কন্ডি, তার ওপর পড়ল সেগান। ঠিক সেই মুহূর্তে তার মাথার খুলির ওপর পিস্তলের বাঁট দিয়ে ঘা মারল টমসন।
কন্ডির ওপর থেকে টেনে-হিঁচড়ে সেগানকে নামাল টমসন। ৫-এর মত কুণ্ডলি পাকিয়ে আছে কন্ডির শরীর। দম ফেলতে কষ্ট হচ্ছে তার। মুখোশটা খুলতে তাকে সাহায্য করল টমসন। ব্যথায় চোখ-মুখ বিকৃত হয়ে আছে কন্ডির, কিন্তু অশ্রাব্য গালাগালির সাথে সেগানকে খুন করে ফেলবে বলে শাসাচ্ছে।
'এখন নয়,' টমসন শান্ত গলায় বলল, 'ওকে খুন করলে কাজটা করে দেবে

কে?'

হুঁশ ফিরল কন্ডির। সাথে সাথে সেগানের সুস্থতা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল সে। জানতে চাইল, 'খুব জোরে মারোনি তো?'

'স্রেফ একটা টোকা।'

'বাঁধো ওকে,' কোন রকমে উঠে বসল কন্ডি। দু'হাত দিয়ে তলপেট চেপে রেখেছে সে, দম ফেলতে এখনও কষ্ট হচ্ছে তার। 'মুখে টেপ লাগাও। চোখে পট্টি।'

চলে গেল টমসন। গাড়ি থেকে নাইলনের রশি, টেপ আর এক টুকরো সিল্কের কাপড় নিয়ে ফিরে এল আবার। তিন মিনিটের মধ্যে রওনা হয়ে গেল ওরা। গাড়ির পেছনের মেঝেতে কম্বল মোড়া কার্ল সেগানের জ্ঞান ফিরে আসতে দেরি আছে এখনও। তার বুকের ওপর একটা পা রেখে হাত দিয়ে এখনও নিজের তলপেট ধরে আছে কন্ডি। গাড়ি চালাচ্ছে টমসন। দু'জনের কারও মুখেই এখন মুখোশ নেই।

নাফাজ ম্যানসন। রেডিও রুম।

আনিসের বাড়িয়ে দেয়া হাত থেকে হেলিকপ্টার পাইলটদের নাম-ঠিকানার তালিকাটা নিল রানা। দেখল, পাঁচটা নামের পাশে একটা করে টিক্ চিহ্ন দেয়া রয়েছে। মুখ তুলে রেডিও অপারেটর একরাম লোয়াঙ্গোর দিকে তাকাল ও।

একরাম বলল, 'ছয়জন পাইলটের মধ্যে পাঁচজনের সাথেই কথা বলেছি। একজন হেলিপোর্টে রয়েছে। বাকি চার জন যার যার বাড়িতে। কার্ল সেগানের নামের পাশে টিক্ চিহ্ন দিইনি, কারণ, ফোন করে বাড়িতে পাইনি তাকে। রিসিভার তোলেইনি কেউ। সেগান বিয়ে করেনি, নির্জন এলাকার ওই বাড়িটায় একাই থাকে। ওর ব্যাপারে আর সব পাইলটকে প্রশ্ন করেছি, কেউ কিছু বলতে পারল না। শুধু জানতে পারলাম, বাড়ির পেছনে নদী আছে, অবসর সময়ে সেখানে মাছ ধরে সেগান, আর বই পড়ে। ফোনে ওকে পাওয়া যায়নি শুনে অবাকই হয়েছে ওরা।'

'ঠিকই আছে,' বলল আনিস, 'নির্জন এলাকায় একটা বাড়িতে একা থাকে সেগান, কিডন্যাপাররা ওকেই তো বেছে নেবে।'

'রেডিও-ফোন ছাড়া লিস্টেড ফোন আছে হেলিপোর্ট গেট-কীপারের?' জানতে চাইল রানা।

'আছে,' বলল একরাম। 'তালিকায় শুধু ওই নাম্বারটা দিতেই ভুলে গেছি আমি। বলছি, লিখে নিন, স্যার।'

কার্ল সেগানের বাড়ি।

পেছনের লনে দাঁড়িয়ে আছে আনিসকে নিয়ে রানা। ক্যানভাসের চেয়ারটা উল্টে পড়ে রয়েছে, খানিক দূরে ঘাসের ওপর পড়ে রয়েছে একটা বই। ফিশিং রডটা প্রায় হাতল পর্যন্ত ডুবে রয়েছে পানিতে। একটু পিছিয়ে এসে ঘাসের ওপর দাঁড়াল ওরা। ঘাসগুলোর ডগা ভাঙা আর মাথার নত অবস্থা দেখে বোঝা যায়, রীতিমত একটা ধস্তাধস্তি হয়ে গেছে এখানে। কথা না বলে বাড়ির দিকে এগোল

রানা। ওকে অনুসরণ করছে আনিস।

বাড়ির সামনের দরজার মত পেছনের দরজাটাও খোলা। ফোনটা বেডরুমে পেল ওরা। একটা নাম্বারে ডায়াল করছে আনিস।

অপরপ্রান্তে রিসিভার তুলল কেউ, বলল, 'মি. নাফাজ মোহাম্মদের হেলিপোর্ট। গরগান বলছি।'

'আমার নাম আনিস আহমেদ। তোমার ওখানে পুলিস গার্ড আছে?'

'মি. আনিস? আপনিই মি. নাফাজ মোহাম্মদের···মানে···'

'হ্যাঁ।'

'খুশি হলাম, স্যার, আপনার সাথে পরিচিত···'

'খুশি পরে হলেও চলবে,' বলল আনিস। 'পুলিস আছে কিনা?'

'আছে, স্যার। একজন সার্জেন্ট। সার্জেন্ট রুমার।'

'আর কেউ নেই? রিসিভার দাও ওকে।'

এক সেকেন্ড পরই সার্জেন্ট রুমারের গলা পেল আনিস, 'ইয়েস, মি. আনিস। আমি সার্জেন্ট রুমার বলছি।'

'মন দিয়ে শোনো, রুমার,' একটু কঠিন সুরে বলল আনিস, তার কারণ, এর আগে কয়েকটা কেসে তার সাথে ইচ্ছে করে অসহযোগিতা করেছে এই সার্জেন্ট। 'অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার। মি. নাফাজ মোহাম্মদের পাইলট কার্ল সেগানের বাড়ি থেকে ফোন করছি তোমাকে। সেগানকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মি. নাফাজের মেয়েকে যারা কিডন্যাপ করেছে, এ তাদেরই কাজ। ব্যাখ্যা করার সময় নেই এই মুহূর্তে, যা বলছি শুনে যাও শুধু। সেগানকে নিয়ে ওরা তোমাদের দিকেই যাচ্ছে। উদ্দেশ্য একটা হেলিকপ্টার হাইজ্যাক করা। সেজন্যেই পাইলট সেগানকে ধরে নিয়ে গেছে ওরা। সংখ্যায় দুই থেকে চারজন থাকবে ওরা। সশস্ত্র। বিপজ্জনক। আমার পরামর্শ, এখুনি ফোন করে আর্মড পুলিসের একটা গ্রুপকে আনিয়ে নাও। ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারছ তো? ওদেরকে ধরতে পারলে মি. নাফাজের মেয়েকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে।'

'বুঝেছি, মি. আনিস।'

'আসছি আমরা।'

এবারও ওদের অনুমান ভুল হয়নি। কিন্তু আবার ওরা দেরি করে ফেলেছে।

মার্সিডিজটা চালাচ্ছে আনিস। পাশে বসে আছে রানা। নাফাজ মোহাম্মদের হেলিপোর্টের দিকে যাচ্ছে ওরা। ট্রাফিক জ্যাম আর স্পীড রেগুলেশন-এর জন্যে দেরি হয়ে যাচ্ছে ওদের। নিঃশব্দে গাড়ি চালাচ্ছে আনিস। শান্ত হয়ে বসে সিগারে টান দিচ্ছে রানা। কিন্তু মনে মনে দু'জনেই অস্থিরতা অনুভব করছে। ফাঁকা রাস্তায় এসে ট্রাফিক আইন ভাঙল আনিস। কিন্তু তাতে লাভ হলো না কিছুই, দেরি যা হবার এরই মধ্যে হয়ে গেছে।

হেলিপোর্টের গেটের সামনে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে পাঁচজন। আনিসকে দেখে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে স্যালুট করল গেট-কীপার গরগান। তারপর নিজের হাতের কব্জি ম্যাসেজ করতে শুরু করল সে। রানা লক্ষ করল, সার্জেন্ট রুমারও তার

হাতের কব্জি ম্যাসেজ করছে। বাকি তিনজন সশস্ত্র পুলিস কাঁচুমাচু চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিঃশব্দে।

ওরা কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই একসাথে কথা বলতে শুরু করল গরগন আর সার্জেন্ট রুমার।

'একজন কথা বলো,' আনিসের ধমক খেয়ে দু'জনেই চুপ করে গেল। কেউ আর কিছু বলছে না দেখে আনিসই প্রশ্ন করল, 'তোমরা কি বলতে চাইছ, সাহায্য এসে পৌঁছুবার আগেই কিডন্যাপাররা...'

'হ্যাঁ, মি. আনিস,' অপমানে, ব্যর্থতার গ্লানিতে, রাগে লাল হয়ে আছে সার্জেন্ট রুমারের মুখ। 'আপনি আগের মত এবারও আমার অযোগ্যতাকে দায়ী করবেন, জানি, কিন্তু, বিশ্বাস করুন—ওদেরকে বাধা দেবার কোন সুযোগই পাইনি আমরা। গাড়িটা আসছে, দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম। একজন মাত্র লোক ছিল ভেতরে, ড্রাইভার। গাড়িটা গেটের বাইরে ঠিক এখানে এসে দাঁড়ায়। তার হাঁচির শব্দে কান পাতা দায়। মুখের কাছে একটা তোয়ালে তুলে রেখেছিল, আর হ্যাচ্চো হ্যাচ্চো করছিল...'

'মুখের সামনে তোয়ালে?' বলল আনিস। 'তার মানে আবার দেখলে চিনতে পারবে না তাকে?'

মুখ ভার করে বলল সার্জেন্ট, 'কি করে পারব?'

'তারপর কি হলো?'

'গাড়িটার জানালার সামনে দাঁড়িয়ে, ঝুঁকে পড়ে লোকটাকে দেখছিলাম আমরা। অপেক্ষা করছিলাম কখন হাঁচি থামবে, এই সময় আমাদের পেছন থেকে বলা হলো...'

'নড়েচ কি মরেচ,' গিলটি মিয়ার স্বর নকল করে বলল রানা।

আনিস ছাড়া সবাই বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকাল রানার দিকে। কিন্তু ধমক খেয়ে আবার সবাই ফিরল আনিসের দিকে। 'তারপর কি হলো বলো, সার্জেন্ট রুমার। তোমার অযোগ্যতা সম্পর্কে রিপোর্ট করার এই সুযোগ আমি ছেড়ে দেব তা ভেব না।'

চোখ গরম করে তাকিয়ে রইল সার্জেন্ট রুমার আনিসের দিকে। কথা বলল না।

গেট-কীপারের দিকে ফিরল আনিস। 'তারপর কি হলো?'

'গাড়িটার পেছনের জানালা খোলা ছিল, স্যার,' বলল গরগন। 'ঘাড় ফিরিয়ে দেখি মুখোশ পরা একটা মুখ বেরিয়ে আছে বাইরে, আমাদের দিকে একটা পিস্তল ধরে আছে। লোকটা সার্জেন্টকে বলল হাতের রিভলভার ফেলে দিতে। সার্জেন্ট ফেলে দিলেন। তার হুকুমে আমরা ঘুরে দাঁড়ালাম। এরপর ড্রাইভার নিচে নেমে এসে আমাদের দু'জনের হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল। আবার আমরা যখন ঘুরে দাঁড়ালাম, দেখলাম ড্রাইভারও একটা মুখোশ পরে ফেলেছে। এরপর ওরা আমাদের পা বাঁধল। তারপর দু'জনকে একসাথে নাইলনের রশি দিয়ে...'

'বুঝলাম। যাতে তোমরা কোথাও ফোন করতে না পারো...'

'ফোনগুলো ওরা ভেঙে রেখে গেছে,' বলল সার্জেন্ট রুমার।

'তোমাদেরকে বেঁধে রেখেই হেলিকপ্টার নিয়ে চলে গেল ওরা?'

'না,' বলল গরগন। 'পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করল ওরা। টেক-অফ করার আগে পাইলটরা সব সময় একটা ফ্লাইট প্ল্যান রেডিও-ফাইল করে নেয়। আমার মনে হয়, কাজটা করতে ওরা বাধ্য করেছে কার্ল সেগানকে।'

কাঁধ ঝাঁকাল আনিস। বলল, 'এর কোন তাৎপর্য নেই। এক জায়গার ফ্লাইট প্ল্যান পাস করিয়ে নিয়ে আরেক জায়গায় যাওয়া যায়, সারাক্ষণ কে লক্ষ্য করছে কার হেলিকপ্টার কোথায় যাচ্ছে না যাচ্ছে। 'কপ্টারে ফুয়েলের কি অবস্থা ছিল জানো?'

'ফুয়েল সব সময় ভরে রাখা হয়। মি. নাফাজের হুকুম। কাজটা আমার।'

'কোন্ দিকে গেছে?'

হাত তুলে উত্তর-পশ্চিম দিকের আকাশ দেখাল গরগন, 'ওদিকে।'

'কিছু একটা করা দরকার আমাদের,' বলল সার্জেন্ট রুমার।

'মুঠোয় পেয়ে ছেড়ে দিয়ে এখন এই কথা বলছ?' বলল আনিস। 'কি করার কথা ভাবছ তুমি?'

'এয়ারফোর্সকে খবর দিতে পারি আমরা।'

'লাভ?'

'নামতে বাধ্য করবে ওরা...'

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে সিগার টানছে রানা। ভাবলেশহীন চেহারা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল আনিস, 'কোন প্লেন বা 'কপ্টারকে নামতে বাধ্য করা খুব সহজ বলে মনে করা হয়। তারা যদি নামতে অস্বীকার করে?'

'তাহলে গুলি করে নামানো হবে।'

'এ-ধরনের কোন ঘটনার কথা জানা আছে?' বলল আনিস। 'তাছাড়া, এতক্ষণে মি. নাফাজের মেয়েকে তুলে নিয়েছে ওরা। গুলি করে নামালে তার পরিণতি কি হবে বলে তোমার ধারণা?'

'মি. নাফাজের মেয়ে?' চোখ কপালে উঠে গেল সার্জেন্ট রুমারের।

'হ্যাঁ,' বলল আনিস। 'তাকে তুলে নেবার জন্যেই ওদিকে গেছে 'কপ্টার।'

মার্সিডিজে চড়ে শহরে ফিরে আসছে ওরা। 'উত্তর-পশ্চিম, তার মানে, ওয়েলি জলার দিকেই গেছে ওরা,' বলল রানা। 'চীফ অভ পুলিসের গলা নকল করতে পারবে তুমি?'

'পারব,' সামনে যে টেলিফোন বুদ দেখল সেখানেই গাড়ি থামিয়ে নেমে গেল আনিস। চীফ সালজের গলা নকল করে কাকে কি বলতে হবে তা জিজ্ঞেস পর্যন্ত করল না সে। রানার ইচ্ছেটা এমনিতেই জানতে পেরেছে। দু'মিনিট পর ফিরে এল গাড়িতে। 'কার্ল সেগান একটা ফ্লাইট প্ল্যান ফাইল করেছে। জানিয়েছে, সাগর কন্যায় যাচ্ছে সে।' কথাটা বলে আবার স্টার্ট দিল গাড়িতে সে, কিন্তু ফোনের বেল বেজে উঠতে স্টার্ট বন্ধ করল আবার। ক্রাডল থেকে তুলে নিল রিসিভারটা।

'রেডিও অপারেটর একরাম বলছি, স্যার। এর আগে দু'বার যোগাযোগ করার চেষ্টা করে সাড়া পাইনি আপনার। পনেরো মিনিট আগে, পাঁচ মিনিট আগে।'

'ঠিক আছে। দু'বারই গাড়ির বাইরে ছিলাম। আবার কোন খারাপ খবর,

একরাম?'

'ভাল খবর, স্যার। মি. নাফাজ পনেরো মিনিটের মধ্যে ল্যান্ড করছেন।'

'গাড়ি পাঠিয়েছ?'

'না, স্যার,' বলল একরাম লোয়াঙ্গো। 'সম্ভবত আপনার সাথে একান্তে আলাপ করতে চান। বললেন, গাড়ি নিয়ে আপনি যেন উপস্থিত থাকেন তাঁর এয়ারপোর্টে। তারপর বললেন, তাঁর জন্যে একটা ব্যাগ যেন গুছিয়ে রাখা হয়। সাতটা স্যুট।'

'তার মানে,' বলল আনিস, 'অন্তত সাতদিন বাইরে কোথাও থাকবেন বলে ভাবছেন তিনি।' রিসিভারটা রেখে দিল আনিস।

সব কথা শুনে বলল রানা, 'মনে হচ্ছে, আমাদেরও ব্যাগ গুছাবার সময় হয়েছে।'

ওপর নিচে মাথা নেড়ে গাড়িতে স্টার্ট দিল আনিস।

দুই

ঝকঝকে একটা মার্সিডিজ আর তার পাশে ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়ানো স্মার্ট, সুদর্শন এক অপরিচিত যুবককে দেখে মনে মনে একটু অবাক এবং বিরক্ত হলেন নাফাজ মোহাম্মদ। আনিসের সাথে একান্তে আলাপ করার ইচ্ছে ছিল তাঁর। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি।

মৃদু কণ্ঠে পরিচয় করিয়ে দিল আনিস, 'আমার বস্, মি. মাসুদ রানা। মাসুদ ভাই, ইনি মি. নাফাজ মোহাম্মদ।'

'গ্লাড টু মিট ইউ,' হাত বাড়িয়ে দিলেন নাফাজ মোহাম্মদ। করমর্দন করার সময় রানার অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলেন তিনি। আনিসের বস্ কোন প্রশংসা, শুভেচ্ছা বা ভদ্রতাসূচক মন্তব্য করল না দেখে তাঁর অস্বস্তি আরও বেড়ে গেল। মৃদু একটু হাসল শুধু রানা, মাথাটা একটু নেড়ে সৌজন্য দেখাবার দায়টুকু সারল।

'তুমি আমার সাথে বসো,' মার্সিডিজের ব্যাক সীটে উঠে বসার সময় আনিসকে বললেন নাফাজ মোহাম্মদ।

ইতস্তত করছে আনিস। কিন্তু রানার নিঃশব্দ ইঙ্গিত পেয়ে নাফাজ মোহাম্মদের অনুরোধ রক্ষা করল সে।

ড্রাইভিং সীটে উঠে বসে স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল রানা।

পেছনে হেলান দিয়ে শরীরটা ঢিল করে দিলেন নাফাজ মোহাম্মদ। সুযোগ দেখা মাত্র সেটাকে কাজে লাগাবার অদ্ভুত একটা প্রবণতা আছে তাঁর মধ্যে, রানাকে দেখে অস্বস্তি বোধ করলেও ওকে দিয়ে কাজ আদায় করা যায় কিভাবে এরই মধ্যে তা ভেবেচিন্তে দেখতে শুরু করেছেন তিনি। মনে মনে ঠিক করলেন, প্রস্তাবটা দেবার আগে লোকটা সম্পর্কে যতটা পারা যায় জেনে নিতে হবে তাঁকে।

তাতে সময় লাগবে। মাথা থেকে আপাতত মাসুদ রানাকে বের করে দিয়ে আনিসের সাথে কথা বলতে শুরু করলেন তিনি। ওয়াশিংটন সফর কতটুকু সফল হয়েছে তার বিশদ বর্ণনা দিলেন। তিনি থামলে, তাঁর অনুপস্থিতিতে যা কিছু ঘটেছে, সংক্ষেপে সব বলল আনিস।

'তোমার সন্দেহের কথা কমান্ডার হাম্মামকে জানিয়েছ নিশ্চয়ই?' উদ্বেগের সাথে জানতে চাইলেন নাফাজ মোহাম্মদ।

'সন্দেহ নয়, মি. নাফাজ,' বলল আনিস। 'নিশ্চিতভাবে জানি, কিডন্যাপাররা সাগর কন্যায় যাচ্ছে। না, কমান্ডার হাম্মামকে সতর্ক করিনি।'

আঁতকে উঠলেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'কেন?' কড়া সুরে জানতে চাইলেন তিনি। 'সাগর কন্যার এত বড় বিপদ তুমি চেপে রাখলে কি মনে করে?' রাগে প্রায় অন্ধ হয়ে গেছেন তিনি। 'তুমি আমার সর্বনাশ দেখতে চাও? নাকি নিজের হাতে আইন তুলে নেবার ঝোঁকটা আমার বেলাতেও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে?'

'কমান্ডার হাম্মামকে আপনি আমার চেয়ে ভাল চেনেন। আপনার মেয়ের কাছ থেকে জেনেছি, এমনিতে শান্ত স্বভাবের লোক হলেও সাগর কন্যার কোন বিপদ হতে যাচ্ছে শুনলে এমন হিংস্র হয়ে ওঠে সে, ভয়ে ক্রুরা নাকি আত্মহত্যা করার জন্যে তৈরি হয়ে যায়। এই ধরনের একজন লোককে কি করে জানাই কিডন্যাপাররা সাগর কন্যায় যাচ্ছে? জানলে কি করবে সে, অনুমান করতে পারছেন না? 'কপ্টারে আপনার মেয়ে আছে জানার পরও গুলি করবে সে। আপনি কি চান আপনার মেয়ে চিরকালের জন্যে ল্যাংড়া হয়ে যাক? আমি তা চাইনি। আমি চেয়েছি কোন রক্তারক্তি কাণ্ড ছাড়াই সাগর কন্যায় নামুক 'কপ্টারটা। এতে আমি কোন অপরাধ করেছি বলে মনে করি না, মি. নাফাজ।'

'ঠিক আছে,' নিজেকে অতি কষ্টে সামলে নিয়ে বললেন নাফাজ মোহাম্মদ, 'যা হবার হয়েছে। কিন্তু এখন থেকে তোমার ইচ্ছে আর সিদ্ধান্তগুলো আমার ব্যাপারে খাটাতে যেয়ো না। তার আগে আমার সাথে কথা বলে নিলে ভাল করবে।' একটু থেমে আবার বললেন তিনি, 'নিজের হাতে আইন তুলে নেবার বদনাম আছে তোমার, দয়া করে সেটা আমার ব্যাপারে কাজে লাগাতে যেয়ো না।'

ঘ্যাচ্ করে ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফেলল রানা, বন্ধ করে দিল স্টার্ট।

'কি হলো?' চরম বিরক্তির সাথে জানতে চাইলেন নাফাজ মোহাম্মদ।

'মি. নাফাজ,' সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে রানা, শান্ত কিন্তু দৃঢ় গলায় বলল, 'কথাটা আপনি ফিরিয়ে নিন, প্লীজ।'

'কি বলছেন আপনি?' অবাক হয়ে নাফাজ মোহাম্মদ তাকালেন তাঁর পাশে বসা আনিসের দিকে। 'কি ব্যাপার আনিস?'

উত্তর দিল রানা, 'আপনি বললেন, আনিসের নাকি আইন হাতে তুলে নেবার বদনাম আছে। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে। এ-ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করে আপনি রানা এজেন্সীর সুনাম নষ্ট করছেন। এতে প্রত্যক্ষভাবে আমাকেও অপমান করা হচ্ছে।'

'হ্যাঁ,' গম্ভীরভাবে বলল আনিস, 'মি. নাফাজ, কথাটা আপনার ফিরিয়ে নেয়া উচিত।'

'আমি নাফাজ মোহাম্মদ,' রাগে, অপমানে মুখের রঙ কালচে হয়ে গেছে তাঁর, 'দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য কখনও করি না। আর, একবার যা বলি তা কখনও ফিরিয়ে নিতেও অভ্যস্ত নই। ঠিকই বলেছি আমি। আবার বলছি, নিজের হাতে আইন তুলে নেবার বদনাম আছে আনিসের। স্থানীয় পুলিস বিভাগের তাই-ই ধারণা।'

'রানা এজেন্সী মাঝে মধ্যে নিজের হাতে আইন তুলে নেয়, এ-কথা সত্যি,' শান্ত, অবিচলিত গলায় বলল রানা। 'কিন্তু সেজন্যে আজ পর্যন্ত এজেন্সীকে কোন বদনাম কিনতে হয়নি। যতবার একান্ত প্রয়োজনে নিজেদের হাতে আইন তুলে নিয়েছি আমরা ততবার এক ধাপ করে গুডউইল বেড়েছে আমাদের—মানে, বদনাম নয়, প্রতিবার সুনাম কিনেছি আমরা। আর সব ইনভেস্টিগেশন ফার্মের সাথে এখানেই রানা এজেন্সীর মৌলিক পার্থক্য। সেজন্যেই রানা এজেন্সী আজ দুনিয়া-জোড়া সুনাম কিনেছে। আমার এজেন্সীর কোন কর্মী নিজের স্বার্থে আইন হাতে তুলে নিয়েছে, এ-অভিযোগ আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না। কিন্তু আমরা প্রমাণ করতে পারব, আপনি নিজের স্বার্থে আইন লঙ্ঘন করেছেন।'

'কি? কি বললেন?' নিজের অজান্তে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন নাফাজ মোহাম্মদ। ঝট্ করে তাকালেন তিনি আনিসের দিকে। 'এসব কথার মানে কি, আনিস? কি বলতে চান এই ভদ্রলোক? তোমাদের উদ্দেশ্যটা কি?'

'উদ্দেশ্য তো একটা আছেই,' উত্তর দিল রানা। 'কিন্তু সে-কথা পরে। আগে আপনি আপত্তিকর মন্তব্যটা ফিরিয়ে নিন।'

'নো, স্যার।' দৃঢ় জেদের সুরে জানিয়ে দিলেন নাফাজ মোহাম্মদ। স্যার শব্দটা উচ্চারণ করে প্রত্যাখ্যান করার নিজস্ব অভিজাত ভঙ্গিটা ব্যবহার করলেন তিনি। 'আপনি আমাকে চিনতে ভুল করেছেন।'

ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে এতক্ষণে পেছন দিকে তাকাল রানা। নাফাজ মোহাম্মদের চোখে চোখ রেখে বলল, 'আপনাকে চিনতে ভুল করিনি আমি, মি. নাফাজ। আপনি একজন বিলিওনিয়র। দুনিয়ার পাঁচজন সবচেয়ে ধনী লোকের একজন। আপনি একজন ক্রিমিনালও বটে। তাই বলছি, আইন হাতে তুলে নেবার অভিযোগ এবং এত বড় বড় কথা আপনার মুখে শোভা পায় না।'

'আমি ক্রিমিনাল?' চোখ কপালে উঠে গেল নাফাজ মোহাম্মদের।

'শুধু ক্রিমিনাল নন, পাকা একজন অভিনেতাও বটে,' বলল রানা। 'গতরাতে সরকারী আর্মারী লুট করেছেন আপনি। অথচ এমন ভাব দেখাচ্ছেন, আপনার মত সাধু লোক যেন দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি নেই। নিজেদের হাতে আইন তুলে নিয়েছিলাম বলেই এখনও আপনি স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তা না হলে এই মুহূর্তে আপনাকে হাজতে থাকতে হত। সরকারী অস্ত্রাগার লুট করলে, আইনে আছে, একজন কোটিপতিরও জামিন হয় না। শুধু অস্ত্রাগার লুট করেননি, মারধর করে গার্ডদেরকে একটা কামরায় বন্ধ করে রেখে আসার ব্যবস্থা করেছেন আপনি। আমি আর আনিস ওখানে ছিলাম।'

'আপনারা ওখানে ছিলেন?' আঁতকে উঠলেন নাফাজ মোহাম্মদ। জীবনে এই প্রথম নিজেকে বোকার হদ্দ বলে মনে হচ্ছে তাঁর। কয়েক সেকেন্ড স্তম্ভিত বিস্ময়ে বোবা হয়ে থাকলেন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে দ্রুত বললেন, 'কিন্তু আমি

ওখানে ছিলাম না।' আমি শব্দটা প্রায় চিৎকার করে উচ্চারণ করলেন তিনি।

'তাও জানি আমরা,' বলল আনিস। 'এও জানি, আর্মারী লুট করার হুকুমটা আপনিই দিয়েছিলেন। মানে, আপনার হুকুমেই কাজটা করে আপনার গুণ্ডা পার্টি।'

'এর মাথামুণ্ডু কিছুই পরিষ্কার হচ্ছে না আমার কাছে। সত্যি যদি দেখে থাকো তোমরা, বাধা দাওনি কেন?'

'ঝুঁকিটা নিতে চাইনি আমরা,' বলল রানা। 'আপনার লোকেরা সংখ্যায় নয়জন ছিল, প্রত্যেকের হাতে ছিল একটা করে সাব-মেশিনগান। বাধা দিতে গেলে আমরা মারা যেতাম।'

হতভম্ব হয়ে পড়লেন নাফাজ মোহাম্মদ। বুঝতে পারছেন, মিথ্যে কথা বলছে না ওরা, সত্যি ওরা উপস্থিত ছিল আর্মারীতে! তা না হলে লোকজনের সঠিক সংখ্যা জানল কিভাবে। একবার আনিস, তারপর রানার দিকে তাকালেন তিনি। চ্যালেঞ্জের সুরে বললেন, 'তোমাদের অভিযোগ যদি সত্যি হয়ও, এর সাথে আমাকে তোমরা জড়াতে পারবে না। তোমরা নিজেরাই বলছ, ওখানে আমি ছিলাম না। আমার হুকুমে আর্মারী লুট হয়েছে তা আমি স্বীকার করব না।'

'বোকার মত কথা বলছেন,' বলল রানা। নাফাজ মোহাম্মদের মুখের রঙ দ্রুত বদলে যাচ্ছে দেখে বুঝতে পারছে ও, অপমানগুলো হজম করতে কি সাংঘাতিক কষ্ট হচ্ছে তাঁর। 'আমরা আপনার হেলিপোর্টেও ছিলাম। দেখলাম ট্রাকটা এল। সেই নয়জন ধরাধরি করে নামাল ভারী আর্মস আর অ্যামুনিশন, সেগুলো তোলা হলো আপনার একটা হেলিকপ্টারে। ট্রাকটা সামরিক বাহিনীর, আর্মারী থেকে চুরি করা, সেখানে আবার রেখে আসার জন্যে একজন লোক সেটাকে নিয়ে চলে গেল। বাকি আটজন লোক আপনার আরেকটা হেলিকপ্টারে চড়ল। এরপর এল একটা মিনিবাস, সেটা থেকে নামল সশস্ত্র বারোজন গুণ্ডা। এরাও আগের আটজনের সাথে হেলিকপ্টারে চড়ল।'

'এদের মধ্যে পাঁচজনকে চিনি আমি,' বলল আনিস। 'আমি নিজে এদেরকে ধরে জেলে পুরেছিলাম। সেই মুহূর্তে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল আমার। ভাবছিলাম, এই কি দুনিয়ার সেরা একজন কোটিপতি, যিনি গুণ্ডা-বাহিনী পোষেন? আমি কি তাঁরই মেয়ের সাথে মেলামেশা করি? নিজের প্রতি ধিক্কারে...'

'জানেন,' রূঢ় গলায় বলল রানা, 'আপনার এই অপরাধের সাজা কি হতে পারে? অস্ত্রাগার লুট করা একটা ফেডারেল অফেন্স। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে আপনার, কমপক্ষে বারো বছরের জেল তো হবেই—বারোশো কোটি ডলার দিয়েও ঠেকাতে পারবেন না।'

'কিন্তু আমি...আমাকে এসবের সাথে...'

'আবার আপনি বোকার মত কথা বলতে চেষ্টা করছেন,' বলল আনিস। 'আপনাকে এসবের সাথে জড়াবার মত প্রমাণ আমাদের হাতে আছে, তা না হলে এভাবে কথা বলতাম না আমরা। হাজার হোক, আপনি একজন কোটিপতি, গুণ্ডা-বাহিনী পোষেন, প্রয়োজনে বস্তা বস্তা টাকা দিয়ে নিজের পক্ষে আইন পর্যন্ত কিনে ফেলতে পারবেন—আপনার সামনে মাথা তুলে কথা বলাই তো ধৃষ্টতার সামিল। তবু বলতে সাহস পাচ্ছি। কেন?'

'কেন?' হাবাগোবা চেহারা হয়েছে নাফাজ মোহাম্মদের।

'গতরাতে আপনার হেলিপোর্টে যা যা ঘটেছে,' বলল আনিস, 'সমস্ত কিছুর ছবি ইনফ্রা-রেড সিনে ক্যামেরা দিয়ে তুলে রেখেছি আমরা।'

বুকটা ধড়াস করে উঠল নাফাজ মোহাম্মদের। ঝাড়া তিন সেকেন্ড চোখে হলুদ সর্ষে ফুল ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলেন না। আনিসের প্রতিটি কথা বিশ্বাস করেছেন তিনি। গলা শুকিয়ে গেছে, ঘন ঘন ঢোক গিলছেন। 'কি চাও তোমরা?' ফিস ফিস করে জানতে চাইলেন তিনি। 'কত টাকা হলে রীলসহ ক্যামেরাটা দেবে আমাকে?' ভাবছেন শনিতে পেয়েছে তাঁকে। একটা বিপদ কাটেনি এখনও, তার ওপর একি ভয়ঙ্কর বিপদ! হেকটর তো শুধু সাগর কন্যা ধরে টান দিয়েছে, আর এই মাসুদ রানা টান দিয়েছে তাঁর সমস্ত কিছু ধরে···

হো-হো করে হেসে উঠল রানা। তারপর বলল, 'আপনার মত ধনী লোকদের এই এক দোষ, সবকিছু টাকা দিয়ে কিনতে চান,' হঠাৎ অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠল রানা। বলল, 'এবার কাজের কথায় আসা যাক। মি. নাফাজ, প্রথমে আপনি আপনার ভিত্তিহীন মন্তব্য ফিরিয়ে নিন। তারপর আমরা ভেবে দেখব আপনাকে নিয়ে কি করা যায়।'

চোখে অন্ধকার দেখছেন নাফাজ মোহাম্মদ। জীবনে কখনও কারও কাছে নতি স্বীকার করেননি তিনি। কিন্তু এও বুঝতে পারছেন, জীবনে এতবড় বিপদের সামনেও পড়েননি কখনও। তিনি যে একান্ত অসহায় অবস্থায় পড়ে অস্ত্রাগার লুট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা এদেরকে বোঝানো যাবে না। আনিস সম্পর্কে জানা ছিল, নীতির প্রশ্নে আপস করার পাত্র নয় সে। এখন দেখা যাচ্ছে তার বসটি তার চেয়েও এক কাঠি বাড়া। লোকটার চেহারায় লেখা রয়েছে ডেঞ্জার সিগন্যাল। হার্টবিট বেড়ে যাচ্ছে তাঁর, বুক ধড়ফড় করছে। ইচ্ছে করলেই এই লোক তাঁর সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারে, চাইলেই পারে তাঁর সব ধন-সম্পদ কেড়ে নিয়ে জীবনের বাকি কয়টা দিন তাঁকে দিয়ে জেলের ঘানি টানাতে। সাত রাজার ধন আছে তাঁর, কিন্তু নিজেকে রক্ষা করার জন্যে সে-সব এখন আর কোন কাজেই আসবে না। মাথাটা ঘুরছে। দিশেহারা বোধ করছেন। শেষ চেষ্টা করে দেখার জন্যে বললেন, 'ছবিগুলোর বিনিময়ে আমার সমস্ত সম্পদের অর্ধেক দান করে দিতেও রাজী আছি আমি···সে-ও কম নয়···কয়েকশো কোটি···'

'আবার ভুল করছেন আপনি। টাকা আদায় করার ইচ্ছে থাকলে প্রস্তাবটা আমরাই দিতাম।'

'কি চান তাহলে আপনি?'

'সে-কথা পরে।' বলে অপেক্ষা করে থাকল রানা।

'অপরাধ স্বীকার করছি আমি,' নিচু গলায় বললেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'অস্ত্রাগার লুট করার অনুমতি দিয়ে ভুল করেছি। স্বীকার করছি, রানা এজেন্সী আইন হাতে তুলে নিয়ে বদনাম কেনেনি কখনও, সুনামই কিনেছে।'

'আপনার স্বীকার করা না করায় কিছু এসে যায় না,' বলল রানা। 'তবু, কেউ যদি এ-ধরনের একটা বাজে কথা বলে তাকে দিয়ে কথাটা ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। সেজন্যেই এত কথার অবতারণা।'

'এবার বলবেন, আমাকে নিয়ে কি করতে চান আপনি?' ঢোক গিলে জানতে চাইলেন নাফাজ মোহাম্মদ। দর দর ঘামতে শুরু করেছেন তিনি।

'আপনি যখন গুণ্ডাপাণ্ডা, আর্মস আর অ্যামুনিশন নিয়ে 'কপ্টারে চড়ছিলেন তখনই আমরা বাধা দিতে পারতাম আপনাকে। সাত মাইল দূরের আর্মি হেডকোয়ার্টারে একটা রেডিও-মেসেজ দিলেই ওরা যা ব্যবস্থা করার করত। কিন্তু তা আমরা করিনি। কেন করিনি জানেন?'

বিমূঢ় নাফাজ মোহাম্মদের গলা থেকে অস্পষ্ট আওয়াজ বের হলো, 'কেন?'

'আনিস আপনার মেয়ের বন্ধু,' বলল রানা, 'সেটা একটা কারণ। আরেকটা কারণ, আপনার প্রতি কিছুটা সহানুভূতি আমার আছে। তার কারণ, আপনার সাথে যে লোকটা শত্রুতা করছে সে লোকটা আমারও শত্রু।'

ভুরু কুঁচকে উঠল নাফাজ মোহাম্মদের। 'কার কথা বলছেন আপনি?'

'হেক্টর।'

'হেক্টর আপনারও শত্রু?' বিস্ময় যেন বাধ মানছে না নাফাজ মোহাম্মদের।

'আপনার মনে আছে,' জানতে চাইল রানা, 'আপনার বিরুদ্ধে কেস করে হেরে গিয়েছিল সে?'

'নিশ্চয়ই মনে আছে...'

'তার কিছুদিন পর আপনার একটা ট্যাঙ্কার ডুবে যায়, মনে আছে?'

'আছে...'

'ওটা আপনার কোম্পানীর কেনা ট্যাঙ্কার ছিল না। সাউল শিপিং লাইনসের কাছ থেকে চার্টার করা...'

'আমার প্রায় সব ট্যাঙ্কারই সাউল শিপিং লাইনসের কাছ থেকে চার্টার করা।'

'যে ট্যাঙ্কারটা ডুবে যায় সেটাও আর. সিরিজের ট্যাঙ্কার ছিল,' বলল রানা। 'ওটা দুর্ঘটনায় পড়ে ডোবেনি। হেক্টর ওটাকে ডুবিয়ে দিয়েছিল, আপনার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে।'

বোকার মত তাকিয়ে আছেন নাফাজ মোহাম্মদ। কয়েক সেকেন্ড কথা বলতে পারলেন না তিনি। তারপর অবিশ্বাস ভরা গলায় জানতে চাইলেন, 'তবে...মাসুদ রানা, মানে, সাউল শিপিং লাইনসের বোর্ড অব ডিরেক্টরের চেয়ারম্যান...আপনিই কি সেই মি. মাসুদ রানা?'

নাফাজ মোহাম্মদের পাশ থেকে গম্ভীর আনিস জানাল, 'হ্যাঁ। মাসুদ ভাই সাউল শিপিং লাইনসের বোর্ড অব ডিরেক্টরের চেয়ারম্যান।'

'মাই গড!' বিশুদ্ধ বিস্ময়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন নাফাজ মোহাম্মদ। তারপর, হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেছে, তাড়াতাড়ি হাতটা বাড়িয়ে দিলেন রানার দিকে নতুন করে করমর্দনের জন্যে। একটা হাসি দমন করে হ্যান্ডশেক করল রানা। 'আপনার সাথে চিঠিপত্রের মাধ্যমে পরিচয় ছিল এতদিন, আজ আমার সৌভাগ্য যে...'

ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিল রানা, বলল, 'হেক্টর আপনাকে বোকা বানাতে পারলেও আমি ঠিকই জানতে পেরেছিলাম, ট্যাঙ্কারটাকে সে-ই ডুবিয়েছে।'

'কথাটা আমাকে আপনি জানাতে পারতেন,' সাবধানে কথা বলছেন নাফাজ মোহাম্মদ। মাসুদ রানা সম্পর্কে এখনও স্বস্তি বোধ করছেন না তিনি। ভদ্রলোক ধনী একজন ব্যবসায়ী হলেও, ভাবছেন তিনি, দুনিয়াখ্যাত একটা ইনভেস্টিগেশন ফার্মের প্রতিষ্ঠাতাও বটে। হোক আনিসের বস্, হেকটরের শত্রু—এর সম্পর্কে সাবধান থাকা দরকার তাঁর।

'জানলে কি করতে পারতেন আপনি?' প্রশ্ন করল রানা। 'বিপদে পড়লে আপনার মাথা কি রকম কাজ করে তা তো দেখতেই পাচ্ছি।' রাস্তার দিকে তাকিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে রানা। 'তবে, হেকটরকে আমি ছেড়ে দিইনি।'

'তার মানে? ওর বাড়িতে আগুন লেগেছিল, গাড়িটা পুড়ে গিয়েছিল, আরও কি কি যেন সব...আপনিই তাহলে...?'

'এ-ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করবেন না, প্লীজ,' বলল রানা। 'আরেকটা কথা জানানো দরকার আপনাকে। এবারও শুধু আপনার পেছনে লাগেনি হেকটর। আমার আপনার দু'জনের পেছনে, তার মানে এক ঢিলে দুই পাখি শিকার করতে চাইছে সে।'

বড় একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে নাফাজ মোহাম্মদ বললেন, 'আমার ব্যাপারে চিন্তা করবেন না, মি. রানা। আমি ওয়াশিংটন থেকে স্টেট ডিপার্টমেন্টের আশ্বাস নিয়ে এসেছি। হেকটর কেন, কোন ফরেন পাওয়ারও আমার সাগর কন্যাকে ছুঁতে পারবে না।'

'সেক্রেটারি স্টিফেন কাসলারের কথার দাম নেই, একথা আমি বলতে চাই না,' বলল রানা। 'কিন্তু হেকটরকে চিনি বলে বলছি, ওয়াশিংটনের যতবড় আশ্বাসই আপনি পেয়ে থাকেন, ওকে বাধা দেয়া অত সহজ হবে না। কোন্ দিক থেকে আঘাত আসবে তা না জানলে কিভাবে তাকে বাধা দেবেন আপনি?' একটু থেমে আবার বলল রানা, 'তাছাড়া আপনি ভুলে যাচ্ছেন, শিরি ফারহানা এখনও তার হাতে রয়েছে।'

মাথার ধবধবে সাদা চুলে আঙুল চালাচ্ছেন নাফাজ মোহাম্মদ। কপালে চিন্তার রেখা। কয়েক মুহূর্ত পর আবেদনের সুরে বললেন, 'এর আগে যাই বলে থাকি, বিশ্বাস করুন, রানা এজেন্সী সম্পর্কে সব সময় খুব উঁচু ধারণা পোষণ করে এসেছি আমি। সেক্রেটারি স্টিফেন কাসলার আমাকে আশ্বাস দিয়েছে, এ-খবরও পেয়ে গেছেন শুনে আপনাদের যোগ্যতা সম্পর্কে আমার আগের ধারণাই আরও দৃঢ় হয়েছে। স্টিফেন কাসলারকে আমি আনিস সম্পর্কে কি বলেছি তাও নিশ্চয়ই জানার কথা আপনার।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা, 'জানি। বলেছেন, পুলিস বা এফ.বি.আই আপনার মেয়েকে উদ্ধার করতে পারবে না, উদ্ধার করলে আনিসই করবে।'

ঘাড় একটু কাত করে পেছন থেকে রানার মুখটা চুপিসারে দেখতে চেষ্টা করছে আনিস। মাসুদ ভাই, ভাবছে সে, সত্যি এত খবর রাখেন!

'এ থেকেই কি প্রমাণ হয় না,' বললেন নাফাজ মোহাম্মদ, 'রানা এজেন্সীর ওপর আমার আস্থার কোন অভাব নেই? তাই, মি. রানা, আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি, দয়া করে আমাকে আপনাদের মক্কেল করে নিয়ে এ-যাত্রা বিপদটা

থেকে আমাকে উদ্ধার করুন। ফি সম্পর্কে আপনাদেরকে কিছু ভাবতে হবে না। যা চাইবেন তাই পাবেন...'

'আপনাকে অলরেডি আমরা আমাদের মক্কেল হিসেবে গ্রহণ করেছি,' বলল আনিস। 'কিন্তু ফি-এর কথা যদি আর একবার মুখে আনেন, আপনি আর আমাদের মক্কেল থাকবেন না। আমরা কাজটা ফাও করে দেব।'

'শুধু দুটো শর্ত থাকবে।'

'কি শর্ত?' জানতে চাইলেন নাফাজ মোহাম্মদ।

'আমাদেরকে না জানিয়ে এখন থেকে কোন কাজ করতে পারবেন না। আর আমরা যাই করি না কেন, আপনি তাতে বাধা দিতে পারবেন না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন নাফাজ মোহাম্মদ। রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছলেন। বললেন, 'ঠিক আছে। কিন্তু...' খানিক ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা করেই ফেললেন তিনি, 'ইনফ্রা-রেড সিনে ক্যামেরাটার কি হবে?'

'ওটা আমরা সময় মত উপহার হিসেবে দান করব আপনাকে,' বলল আনিস। 'কথা দিচ্ছি।'

নাফাজ ম্যানসন। স্টাডি রুম।

আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসে আছেন নাফাজ মোহাম্মদ। এবার নিয়ে দু'বার তাঁর ব্র্যান্ডির গ্লাসটা ভরে দিল আনিস। বাড়ি ফেরার পথে বিশেষ আর কোন কথা বলেননি তিনি। নিজের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। মেয়ের জন্যে দুশ্চিন্তা, সাগর কন্যা সম্পর্কে ভয়, হেক্টরকে নিয়ে আতঙ্ক...মাসুদ রানার মক্কেল হওয়া সত্ত্বেও এসব বিষয়ে মাথা না ঘামিয়ে পারছেন না।

গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে তিনি বললেন, 'আপনারা তাহলে সাগর কন্যায় যাবেনই, মি. রানা?'

'শুধু আপনার স্বার্থে যেতে হচ্ছে,' বলল রানা। 'আপনার মাথার ঠিক নেই, কখন কি করে বসেন।'

গম্ভীর মুখে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'তাহলে ছদ্মবেশ নেবার ব্যবস্থা করুন আপনারা।'

'কেন?'

একটু অধৈর্যের সাথে নাফাজ মোহাম্মদ বললেন, 'আনিস বলল কয়েকজন সাবেক কয়েদীকে হেলিকপ্টারে উঠতে দেখেছে সে। আপনারা তাদেরকে চেনেন। তারাও আপনাদেরকে চিনবে, তাই না?'

'আমরা জীবনে কখনও ওদের কাউকে দেখিনি,' বলল আনিস।

'কিন্তু তখন যে তুমি বললে...' চোখ কপালে তুলে জানতে চাইলেন নাফাজ মোহাম্মদ।

'একগাদা ডাহা মিথ্যে কথা বলতে পারেন আপনি, আর আমরা একটাও বলতে পারি না?' বলল আনিস।

'তবে ছদ্মবেশ নেবার দরকার আছে,' বলল রানা। 'আপনার টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভাইজার হিসেবে যেতে পারি আমরা—জিয়োলজিস্ট বা

সিসমোলজিস্ট, একটা কিছু হলেই চলবে।' একটু থেমে আবার বলল রানা, 'সুন্দর ফিট করে এমন একজোড়া বিজনেস স্যুট, পানামা হ্যাট, শিং দিয়ে তৈরি রিমের চশমা, প্লেন লেন্সের, যাতে দেখেই মনে হয় বইয়ের পোকা, আর ব্রীফকেস দরকার আমাদের।'

'বেশ। আর কিছু?'

'একজন ডাক্তার। সাথে ফুল মেডিকেল কিট আর প্রচুর পরিমাণে ব্যান্ডেজ।'

'ডাক্তার?'

'শরীর থেকে বুলেট বের করার জন্যে,' বলল রানা। 'নাকি আপনি ভাবছেন সাগর কন্যায় গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি হবেই না?'

'ভায়োলেন্স আমি পছন্দ করি না।'

'সেজন্যেই কি আপনি গত রাতে বিশজন যোদ্ধাকে 'সাগর কন্যায় পাঠিয়েছেন?'

নাফাজ মোহাম্মদ চুপ করে থাকলেন।

'ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে পারবে এমন একজন ডাক্তার যোগাড় করতে পারবেন আপনি?'

'ডজন ডজন। ড. কিপলিং ভিয়েৎনাম যুদ্ধে ছিল, খুব সাহসী, তাকে দিয়ে চলবে?'

'চলবে,' বলল রানা। 'বলবেন, সাথে করে যেন দুটো সাদা ল্যাব-কোট নিয়ে আসে।'

'কেন?'

'চেহারায় সায়েন্টিফিক ভাব থাকতে হবে তো।'

ফোন তুলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সারলেন নাফাজ মোহাম্মদ, রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন, তারপর আরাম কেদারা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কিছুক্ষণের জন্যে মাফ করতে হবে আমাকে। রেডিও রুম থেকে একটা প্রাইভেট কল করব।' এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি সাগর কন্যায় যাননি তিনি, তার কারণ, বাড়ি থেকে ইনফর্মার ঈগলটনের সাথে যোগাযোগ করতে চান। ঈগলটনকে তিনি পরামর্শ দেবেন, নিজেকে সন্দেহের ঊর্ধ্বে রেখে লেক তাহোর গোপন বৈঠকের প্রধান উদ্যোক্তা রুবার্ট অরবেনকে জানাতে হবে যে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সাগর কন্যার দিকে এগোতে দেখলে যে-কোন ফরেন ন্যাভাল শিপকে ডুবিয়ে দেয়া হবে। কথাটা একটু বাড়িয়ে বলা হয়ে যাবে, কিন্তু এটুকু বাড়িয়ে না বললে হেক্টরকে রোখার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করবে না শত্রুরা, ফরেন ন্যাভাল শিপগুলোও যথেষ্ট ভয় পাবে না। সব ব্যবস্থা স্টেট ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি করবেন বলে কথা দিলেও সরাসরি ওদেরকে সাবধান করে দিতে চান নাফাজ মোহাম্মদ।

আনিস জানতে চাইল, 'আমাদের মধ্যে থেকে কে আপনার সাথে রেডিও রুমে যাবে?'

'মানে? বললাম না, প্রাইভেট কল?' রাগ চেপে রাখতে কষ্ট হচ্ছে নাফাজ মোহাম্মদের। 'আমাকে নিজের বাড়িতে তোমাদের হুকুম মেনে চলতে হবে নাকি? আমি কি ছেলেমানুষ যে আমার সব কাজের ওপর নজর রাখতে হবে?'

'গত রাতে আপনি কি পরিণত মানুষের মত আচরণ করেছেন?' জানতে চাইল আনিস। 'দেখুন, মি. নাফাজ, আপনি যদি আমাদের কাউকে সামনে নিয়ে কোন কাজ করতে আপত্তি করেন তাহলে পরিষ্কার ধরে নিতে হয় আবার কোন আত্মঘাতী পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন আপনি। আমাদের মক্কেল হিসেবে তা আমরা হতে দিতে পারি না। আগেই তো বলেছি, আমাদেরকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে হবে আপনার। আমাদেরকে গোপন করে কোন কাজ আপনি করতে পারবেন না।'

'এটা আমার একটা অত্যন্ত জরুরী ব্যবসা সংক্রান্ত কল। আমি তো বুঝতে পারছি না তোমরা আমার ব্যবসায়ে নাক গলাতে চাইছ কেন।'

'আপনার ব্যবসায়ে আমাদের নাক গলানো উচিত নয়, এ-কথা মানি,' বলল আনিস। 'কিন্তু কলটা যে ব্যবসা সংক্রান্ত তা বিশ্বাস করি না। চারদিক থেকে যাঁর দিকে মৌমাছির মত বিপদ ছুটে আসছে তিনি এই মুহূর্তে ব্যবসা নিয়ে মাথা ঘামাতে পারেন না।' একটু থেমে আবার বলল আনিস, 'আপনি যদি আমাদের একজনকে সাথে নিতে আপত্তি করেন, এই আমরা চললাম।' বলে উঠে দাঁড়াল সে। 'আপনার ভাল মন্দের ব্যাপারে আমরা দায়ী থাকব না। শিরিকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন, অবশ্য কখনও যদি তার দেখা পান আপনি।'

'ব্ল্যাকমেইল! নিখাদ, নির্ভেজাল ব্ল্যাকমেইল!' দ্রুত চিন্তা করছেন নাফাজ মোহাম্মদ। ঈগলটনকে মেসেজটা দেয়া জরুরী, নাকি রানা এজেন্সীর এই দুই বান্দাকে কাছে রাখা জরুরী—কোন্‌টা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? একটা ব্যাপারে তিনি প্রায় নিঃসন্দেহ যে আনিস তাকে মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে, কিন্তু সেই সাথে এ-কথাও বুঝতে পারছেন, ওদেরকে চটিয়ে দিলে কি করবে ওরা তাও সঠিক বলা যায় না—সত্যিই হয়তো চলে যাবে।

মুখটা পাথরের মত করে বললেন, 'তোমাদের হুমকির কাছে নতি স্বীকার না করে তো কোন উপায় দেখছি না। ঠিক আছে, যাও, তোমাদের ব্যাগ-ব্যাগেজ গোছগাছ করোগে। তোমাদেরকে আমি রোলসে তুলে নেব।'

আনিস বলল, 'ব্যাগ গুছাতে আর ক'সেকেন্ড লাগবে? আপনি বরং তৈরি হয়ে নিন, এক সাথেই বেরুনো যাক।'

কটমট করে আনিসের দিকে তাকিয়ে নাফাজ মোহাম্মদ বললেন, 'তুমি ভাবছ তোমরা কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেই রেডিও রুমের দিকে ছুটব আমি?'

এতক্ষণ চুপ করে ছিল রানা। মুচকি হেসে বলল ও, 'তিনজনই আমরা একসাথে একই কথা ভাবছি। আশ্চর্য! তাই না?'

তিন

সাগর কন্যা।

দূর আকাশের গায়ে রঙিন একটা ফড়িঙের মত লাগছে হেলিকপ্টারটাকে। চোখ থেকে বিনোকিউলার নামিয়ে পাশে দাঁড়ানো হেড ড্রিলার বাবালের দিকে

তাকাল কমান্ডার লিল হাম্মাম। 'মি. নাফাজ আসছেন,' একটু অবাক হয়ে বলল সে।

এমনিতে আগাম খবর দিয়ে সাগর কন্যায় আসেন নাফাজ মোহাম্মদ, কিন্তু তাড়াহুড়োর দরুন মাঝে মধ্যে খবর পাঠাতে ভুলও করেন তিনি। তাছাড়া 'কপ্টারটা নাফাজ মোহাম্মদের বলে চেনা যাচ্ছে, যে-কোন মুহূর্তে এখানে তাঁর উপস্থিতি আশাও করা হচ্ছে, সুতরাং একটু অবাক হলেও উদ্বিগ্ন বোধ করার কোন কারণ দেখল না কমান্ডার। প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে উত্তর-পুব প্রান্তে হেলিপোর্টের দিকে দ্রুত এগোচ্ছে ওরা দু'জন। ওরাও পৌঁছুল, 'কপ্টারও নামল। কিন্তু সেটা থেকে কেউ নামছে না। পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে বাবাল আর কমান্ডার হাম্মাম। 'কপ্টার নামার পর এক সেকেন্ড দেরি করার মানুষ নন নাফাজ মোহাম্মদ। হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল দু'জনের বুক। দরজাটা একপাশে সরে যেতেই প্রথমে দেখা গেল একটা মেশিন-পিস্তল, তার পেছনে একজন প্রকাণ্ডদেহী লোক। কভি।

কভির পাশে আরেকজন লোক, তার হাতেও একটা মেশিন-পিস্তল। প্ল্যাটফর্মের আর কোথাও থেকে দেখা যায় না হেলিপোর্টটা, ক্রু বা টেকনিশিয়ানরা জানতেই পারছে না কিছু। 'কমান্ডার লিল হাম্মাম আর হেড ড্রিলার বাবাল?' মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল কভি। 'সাথে আর্মস থাকলে বের করার চেষ্টা কোরো না, প্লীজ।' সে থামতেই ঝপাৎ করে নিচের দিকে ঝুলে পড়ল ফাইবার গ্লাসের সিঁড়িটা। 'উঠে এসো।'

পরস্পরের দিকে তাকানো ছাড়া করার কিছু দেখল না কমান্ডার লিল হাম্মাম আর বাবাল। নিঃশব্দে এগোল ওরা। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল 'কপ্টারে। ওদের দিক থেকে চোখ না সরিয়ে বলল কভি, 'কোরাল, লিকন—সার্চ করো এদেরকে।'

কমান্ডার এবং হেড ড্রিলার, দু'জনের পকেট থেকেই একটা করে অটোমেটিক বের হলো। কিন্তু অস্ত্র কেড়ে নেয়া হচ্ছে বলে মন খারাপ বা রাগ করার সময় নেই ওদের, ওরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে নাফাজ মোহাম্মদের একমাত্র কন্যা শিরি ফারহানার দিকে।

শুকনো ফুলের মত ঠোঁটের কোণে একটু হাসি দেখা গেল শিরি ফারহানার। মৃদু গলায় বলল, 'দুঃসময়ে দেখা হলো, তাই না, কমান্ডার?'

টকটকে লাল হয়ে উঠেছে কমান্ডারের প্রকাণ্ড মুখ। ওপর নিচে একবার মাত্র মাথা নাড়ল সে। তারপর ঝট্ করে তাকাল কভির দিকে। 'তোমরাই তাহলে কিডন্যাপার? এর জন্যে মরতে হবে তোমাকে, সে-খবর রাখো? ঝট্ করে এবার সে পাইলট কার্ল সেগানের দিকে তাকাল। 'তোমার কি বলার আছে, সেগান? কোন্ সাহসে সাগর কন্যায় নিয়ে এসেছ তুমি এদেরকে?'

কার্ল সেগানের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে রাজ্যের গালমন্দ সবই তার প্রাপ্য। 'হ্যাঁ, আমি কাপুরুষের মত আচরণ করেছি। তবে, ওরা সারাটা পথ আপনার মাথার পেছনে পিস্তল ধরে রাখলে আপনিও তাই করতেন, কমান্ডার।'

শিরি ফারহানার দিকে তাকাল কমান্ডার। 'তোমাকে কোন ভাবে অপমান করা হয়েছে, শিরি, মা?'

'না।'

'তা করাও হবে না,' বলল কন্ডি। 'তুমি যদি আমাদের কথা মত কাজ না করো তাহলে অবশ্য আলাদা কথা।'

'কি বলতে চাও?' ঠাণ্ডা চোখে তাকাল কমান্ডার কন্ডির দিকে। কমান্ডারের চোখের দৃষ্টি দেখে সতর্ক হয়ে গেল কন্ডি। ভাবল, হেক্টর তাকে লোকটা সম্পর্কে অকারণে সাবধান করে দেয়নি। এ-লোক ঠাণ্ডা মেজাজের হলেও সাগর কন্যার বিপদ দেখলে ডিনামাইটের মত বিস্ফোরক হয়ে উঠতে পারে।

'ক্রিস্টমাস ট্রী বন্ধ করো,' বলল কন্ডি। সাগর-তলা থেকে তেল উত্তোলন বন্ধ রাখার নির্দেশ এটা।

তিন সিকেন্ড নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল কমান্ডার। লোকটা নিরস্ত্র হলেও, কন্ডি আর তার লোকেরা পরিষ্কার বুঝতে পারছে, যে-কোন মুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে যেতে পারে তার শরীরে। প্রচণ্ড রাগে এমন বিকৃত দেখাচ্ছে চেহারাটা, লক্ষ করে গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠল শিরির।

'আমি বেঁচে থাকতে নয়,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল কমান্ডার।

সহকারী লিকনের দিকে তাকাল কন্ডি, শুধু বাঁ চোখটা টিপল একবার। মৌন ইঙ্গিতটা পেয়েই লিকন তার হাতের মেশিন-পিস্তলের বাঁট দিয়ে কমান্ডারের মাথার পেছনে বাড়ি মারল একটা। হিসেব করে মারা, মাথা ঘুরে যাতে অসুস্থ হয়ে পড়ে, কিন্তু জ্ঞান যেন না হারায়। মাথাটা খানিক পরই পরিষ্কার হয়ে এল কমান্ডারের, দেখল, ইতিমধ্যে হাতের কব্জি আর পায়ের গোড়ালির ওপর লোহার গোল কড়া পরানো হয়ে গেছে। পরমুহূর্তে তার দৃষ্টি কেড়ে নিল স্টেইন-লেস স্টীলের তৈরি চকচকে একটা তীক্ষ্ণধার কাঁচি, এ-ধরনের কাঁচি অপারেশন থিয়েটারে ব্যবহার করে ডাক্তাররা, পাঁজরের হাড় কাটার জন্যে। কাঁচিটার হাতল শক্ত মুঠোয় ধরে রয়েছে কন্ডি। অপরপ্রান্তটা হাঁ করে আছে, দুই ধারাল পাতের মাঝখানে দেখা যাচ্ছে শিরি ফারহানার ডান হাতের একটা চাঁপা কলা রঙের আঙুল।

'এর জন্যে তোমাকে দায়ী করবেন মি. নাফাজ,' বলল কন্ডি। 'এখনও সময় আছে, ভেবে দেখো।'

ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, চোখেমুখে একরাশ কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছে কমান্ডারের দিকে শিরি ফারহানা। কি সে ভাবছে কে জানে, কৌতুকে চিকচিক করছে তার চোখের দৃষ্টি।

চিন্তা করে দেখার কিছু পেল না কমান্ডার। জানে, প্রাণপ্রিয় মেয়ের কোন ক্ষতি হলে তাকে আস্ত রাখবেন না মি. নাফাজ। রাগে কেঁপে উঠল সে একবার। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'কাঁচিটা সরাও। ক্রিস্টমাস ট্রী বন্ধ করে দিচ্ছি আমি।'

'বুদ্ধি আছে!' প্রশংসার সুরে, সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল কন্ডি। 'সত্যি বন্ধ করো কিনা দেখার জন্যে তোমার সাথে যাচ্ছি আমি। এসব জিনিস দেখলেই চিনতে পারব তা নয়, তবে ফ্লো গজ বলে একটা জিনিস আছে, সেটার সাথে পরিচয় আছে আমার। সাথে একটা ওয়াকি-টকি নিয়ে যাচ্ছি, আরেকটা এখানে আমার এই সহকারী টেসিওর কাছে থাকছে। ওর সাথে সারাক্ষণ যোগাযোগ রাখব আমি। আমার যদি কিছু ঘটে,' হাতের কাঁচিটার দিকে কয়েক সেকেন্ড

তাকিয়ে থাকল কন্ডি, তারপর সেটা তার আরেকজন সহকারী লারসেনের হাতে দিয়ে বলল, 'প্রথমে একটা একটা করে লেডী শিরির···আগেই তো বলে রেখেছি কি করতে হবে না হবে, সব মনে আছে তো?'

মাথা নেড়ে লারসেন জানাল সব মনে আছে তার।

'পাইলট সাহেব, তোমার হাত দুটো সীটের পেছন দিকে আনো,' বলল কন্ডি। 'লারসেন, হাতকড়া লাগাও।'

'কিছুই কি তোমার চোখ এড়িয়ে যায় না?' অবাক হয়ে বলল শিরি ফারহানা।

মৃদু হাসল কন্ডি। 'ভিলেন হবার সুযোগ পেলে আজকাল কেউ ছাড়ে না।'

কমান্ডারের হাত আর পায়ের বেড়ি খুলে দেয়া হয়েছে। তাকে সাথে নিয়ে 'কপ্টার থেকে নেমে এল কন্ডি। প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে ড্রিলিং রিগের দিকে এগোচ্ছে ওরা। মাত্র কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কন্ডি, চোখেমুখে প্রশংসার ভাব ফুটিয়ে তুলে চারদিকে তাকাচ্ছে। 'বাহ্, চমৎকার! ডুয়াল-পারপাস অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট গান। ডেপথ চার্জের পাহাড়। নাহ্, তোমাদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করব সে-উপায়ই রাখোনি। কিন্তু কাজটা ফেডারেল অফেন্স, এই যা। মি. নাফাজ, উকিলের পেছনে যত লাখ ডলারই খরচ করুন, দশ বছরের জেল এড়াতে পারবেন না।'

'ঠিক কি বলতে চাইছ?'

'বলতে চাইছি, এ-ধরনের মারাত্মক যুদ্ধাস্ত্র কোন রিগে থাকে না। চব্বিশ ঘন্টা আগে এখানে ছিলও না। মি. নাফাজ বোধহয় তোমাকে এ-ব্যাপারে অন্ধ রেখেছেন?'

কটমট করে তাকিয়ে আছে কন্ডির দিকে কমান্ডার লিল হাম্মাম, এছাড়া করার কিছু নেইও তার।

'কোত্থেকে এগুলো আনা হয়েছে, জানো? গতরাতে মিসিসিপির ন্যাভাল আর্মারী লুট করা হয়েছে। বুঝে নাও এবার। সামরিক অস্ত্রশস্ত্র কারা চুরি করে, এ-ব্যাপারে আবছা কোন ধারণাও নেই সরকারের। অস্বীকার কোরো না, এই সব মারণাস্ত্র চালাবার জন্যে যোগ্য লোকও এখানে আছে, ঠিক?'

নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে কমান্ডার। জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করছে না।

'জানি, আছে। শুধু ওরা নয়, আরেকটা দলও আছে এখানে।' হাসছে কন্ডি। 'কিভাবে জানলাম বলো তো? গতরাতে যে ফ্লোরিডারও একটা আর্মারী লুট হয়েছে। সেই লুট করা অস্ত্রগুলো যাবে কোথায়, মি. নাফাজের সাগর কন্যা থাকতে? অস্ত্র থাকলে সেগুলো ব্যবহার করার লোকও থাকবে, এ তো সাধারণ বুদ্ধির কথা, কি?' কমান্ডার কোন জবাব দিচ্ছে না দেখে আবার বলল কন্ডি, 'এর জন্যে মি. নাফাজের সাথে তোমাকেও সাজা দেয়া হবে। তুমিই যেহেতু তাঁর প্রধান সাহায্যকারী, বিশ বছরের কম জেল হবে না তোমার। মেয়াদ লাঘবেরও কোন সুযোগ তোমাকে দেয়া হবে না।' মুখের ভাব করুণ করে দুঃখের সুরে বলল, 'অথচ মানুষ আমাদেরকে ক্রিমিনাল বলে!'

'বড় বেশি কথা বলছ তুমি,' বলল কমান্ডার। 'দিন ঘনিয়ে এলে এই রকম হয় অনেকের, শুনেছি।'

'ঠিকই শুনেছ,' সহাস্যে বলল কভি। 'কিন্তু ওয়াশিংটনে গিয়ে আমার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি কথা বলে এসেছেন মি. নাফাজ।'

কভির সামনে ক্রিস্টমাস ট্রী নিউট্রাল করে দেয়া হলো। প্রেশার গজের কাঁটাটাকে শূন্যের ঘরে ফিরে এসে স্থির হয়ে যেতে দেখে সন্তুষ্ট হলো কভি। রোমিওর দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো তার। সাগর কন্যা আর বিশাল ভাসমান অয়েল ট্যাঙ্কের মাঝখানে টহল দিচ্ছে। 'ওটা আবার ওখানে কি করছে?'

'পাইপ লাইন পাহারা দিচ্ছে।'

'কেন? কি দরকার তার? লাইন যদি কোথাও কেটেও যায়, চব্বিশ ঘন্টার আগেই তা জোড়া লাগানো সম্ভব। পুরোটা বদল করতেও ওই একদিনের বেশি লাগবে না।'

'চব্বিশটা মিনিটও নষ্ট করতে রাজী নই আমরা।'

'আয় হায়!' কৃত্রিম বিস্ময়ে আঁতকে উঠল কভি। 'গোটা সাগর কন্যাকেই যেখানে আমরা নষ্ট করে দিতে যাচ্ছি, সেখানে…নাকি কেউ তোমাকে এখনও বলেইনি যে…'

'আমি শুধু জানি,' গম্ভীর গলায় বলল কমান্ডার হাম্মাম, 'মি. নাফাজের শত্রুরা নিজেদের মৃত্যু ডেকে আনছে।'

'ভাড়াটে যোদ্ধারা কোথায়?' জানতে চাইল কভি। 'কে তাদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছে?'

চুপ করে থেকে লাভ নেই জেনেও মুখ বুজে থাকল কমান্ডার।

'টেসিও,' ওয়াকি-টকিতে কথা বলছে কভি, 'কমান্ডারকে আর মাত্র একবার জিজ্ঞেস করব প্রশ্নটা। উত্তর দিতে না শুনলে লেডী শিরির কড়ে আঙুল।'

'যোদ্ধাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে কে, কমান্ডার হাম্মাম?' জানতে চাইল আবার কভি।

'জিউসেপ বারজেন।'

'শালা বানচোতটা তাহলে এখানে!' দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসছে কভি। 'চমৎকার! জেল ভেঙে পালানো খুনের আসামীকে মি. নাফাজ আশ্রয় দিয়েছেন। আমরা আর কি ক্ষতি করব তোমাদের, নিজেদের সর্বনাশ তো যা করার করেই রেখেছ তোমরা—এখন শুধু পুলিসকে একটা খবর দিলেই মনিব সহ চাকর-বাকর সবার কোমরে দড়ি পড়বে। জিউসেপ বারজেন, না?' হাসি চেপে রাখতে পারছে না সে। 'ওর সাথে কথা বলা দরকার আমার।'

জিউসেপ বারজেনকে ডেকে আনা হলো।

দ্রুত, একাই কথা বলে গেল কভি, 'মি. নাফাজ মোহাম্মদের মেয়ে আমাদের হাতে রয়েছে। তুমি, বারজেন, এবং তোমার দলবল, মি. নাফাজ মোহাম্মদের লোক—সুতরাং ধরে নিচ্ছি তোমাদের তরফ থেকে লেডী শিরির কোন ক্ষতি হবে না। এখানে, এই লিভিং কোয়ার্টারে ওকে আমরা নিয়ে আসছি, কিন্তু ওর কাছাকাছি আসার চেষ্টা কোরো না তোমরা। আমি চাই না সাত রাজার ধন মানিকটাকে তোমরা আমাদের হাত থেকে কেড়ে নাও। নিজেদের কোয়ার্টার থেকে ভুলেও কেউ বের হবে না। কাউকে যদি শুধু বেরুতে দেখি, লেডী শিরির

আর্তচিৎকার শুনতে পাবে তোমরা। সেই সাথে জানালা গলে একটা একটা করে আঙুল পড়বে তোমাদের কোলের ওপর, দেখেই চিনতে পারবে ওগুলো কার। আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে, বারজেন?'

কভির প্রতিটি কথা অন্ধের মত বিশ্বাস করছে জিউসেপ বারজেন। এক সাথে কাজ করেছে ওরা, কভির নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে সব কথা জানা আছে তার। মানুষ খুন তো অনেকেই করতে পারে, কিন্তু একটা মানুষকে খুন করার আগে তার উপর অমন অমানুষিক নির্যাতন চালাতে পারে ক'জন? যারা পারে তাদের অনেককেই চেনে বটে বারজেন, তারা আবার এ-ব্যাপারে ওস্তাদ মানে কভিকে, আর ভূতের মত ভয় করে। সমস্ত নির্দেশ মেনে নিয়ে এক নম্বর কোয়ার্টারে ফিরে গেল বারজেন।

ওয়াকি-টকিতে লিকনকে নির্দেশ দিল কভি, 'পাইলট-সহ সবাইকে নিয়ে 'কপ্টার থেকে নেমে এসো।'

পাইলট সেগানকে বিশেষ ভয় পাবার কারণ আছে কভির। লোকটা স্বাধীনচেতা, এবং বেপরোয়া। কোনভাবে একবার যদি সীটের পেছনে বাঁধা হাত দুটো মুক্ত করে নিতে পারে, সাথে সাথে 'কপ্টার নিয়ে আকাশে উঠে যাবে সে। ফ্লোরিডার দিকে না গিয়ে সোজা নিউ অরলিয়সের দিকে যাবে, মেইন ল্যান্ডের সবচেয়ে কাছের জায়গা ওটা।

জিম্মি এবং সশস্ত্র গার্ডরা নামছে 'কপ্টার থেকে, কভি কমান্ডারের দিকে ফিরে জানতে চাইল, 'থাকা-শোয়ার জায়গা?'

'কোন অভাব নেই। দু'নম্বর কোয়ার্টারে প্রচুর ঘর খালি পড়ে আছে। লেডী শিরির জন্যে মি. নাফাজের প্রাইভেট স্যুইট।'

'লক-আপ সিস্টেম?'

'কি বলতে চাও? এটা জেলখানা নাকি?'

'স্টোর রুম? বাইরে থেকে যেটা তালা মারা যায়?'

'আছে।'

কভি সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাল কমান্ডারের দিকে। 'আশাতীত সহযোগিতা পাচ্ছি তোমার কাছ থেকে। কিন্তু তোমার সম্পর্কে এর ঠিক উল্টো কথা শুনেছি আমি।'

'যা বলছি সব সত্যি। ঘুরে দেখে আসতে দু'মিনিটের বেশি লাগবে না তোমার।'

'আমাকে তুমি খুন করতে চাও, তাই না, কমান্ডার?' গম্ভীর হয়ে জানতে চাইল কভি।

'চাই,' ঠাণ্ডা গলায় বলল কমান্ডার, 'সময় হলে করবও। এখনও সময় হয়নি।'

'তবু,' পকেট থেকে একটা পিস্তল বের করে বলল কভি, 'সব সময় দশ ফিট দূরে থাকো আমার কাছ থেকে। আমাকে একবার কাবু করতে পারলেই বেরিয়ে পড়বে তোমার আসল চেহারা। কনুই আর হাঁটু থেকে হাত-পা আলাদা করার ভয় দেখিয়ে আমার লোকদেরকে বাধ্য করবে তুমি লেডী শিরিকে ছেড়ে দিতে। তাই না?'

হিম-শীতল বিতৃষ্ণার সাথে তাকিয়ে থাকল কমান্ডার, জবাব দেবার প্রয়োজন

বোধ করল না।

শিরি ফারহানা, হেড ড্রিলার আর পাইলটকে নিয়ে 'কপ্টার থেকে নেমে এল কভির চারজন লোক। কভির নির্দেশে কমান্ডার হাম্মাম সামনেই যে স্টোর রুমের সারিটা পড়ল সেখানে নিয়ে এল ওদেরকে। হেড ড্রিলার বাবালকে একজন গার্ডের পাহারায় পাঠানো হলো চাবির গোছা নিয়ে আসার জন্যে। এক মিনিটের মধ্যে ফিরে এল তারা। একটা স্টোর রুমের তালা খুলল কভি। সিলিং ছোঁয়া সাজানো খাবারের ক্যান ছাড়া আর কিছু নেই ভেতরে। পাইলট আর হেড ড্রিলার বাবালকে নাইলনের রশি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে, বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে তালা মেরে দেয়া হলো। তালার চাবিটা রিঙ থেকে খুলে নিয়ে নিজের পকেটে ফেলল কভি। পাশের স্টোর রুমে শুধু পাটের দড়ি কুণ্ডলী পাকানো রয়েছে, অপরিশোধিত তেলের উৎকট দুর্গন্ধ এসে লাগল ওদের নাকে। আরশোলা আর ইঁদুরগুলো সারা ঘরে ছুটোছুটি করছে গা ঢাকা দেবার জন্যে। কভি শিরির দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। 'দয়া করে ভেতরে ঢুকুন, মিস ফারহানা।'

রাগ নয়, বিরক্তির সাথে স্টোর রুমের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে কভির দিকে তাকাল শিরি। গলাটা যাতে কেঁপে না যায় তার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে বলল, 'অসম্ভব। ওই নোংরা জায়গায় থাকলে দশ মিনিটের বেশি বাঁচব না আমি।'

'এটা কি জানেন?' নিজের হাতের কোল্ট রিভলভারটা দেখিয়ে বলল কোরাল। 'ওখানে না ঢুকলে যে এক মিনিটও বাঁচবেন না।'

আড়চোখে তাকিয়ে শিরি দেখল লিকনের হাতেও আরেকটা কোল্ট রয়েছে, সেটাও ওর দিকে তাক করে ধরা। সবাইকে প্রায় হতভম্ব করে দিয়ে ঠোঁট বাঁকা করে একটু হাসল শিরি। হাত দুটো এমনভাবে নাড়ল, যেন ওকে এগিয়ে যাবার পথ করে দিতে বলছে। কমান্ডার হাম্মাম নিজের অজান্তেই এক পা পিছিয়ে গেল। দৃঢ় পায়ে এগোল শিরি। সোজা গিয়ে দাঁড়াল কোরাল আর লিকনের সামনে। দু'জনের মুখের কাছ থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে ওর মুখ। পালা করে এর ওর দু'জনের চোখের দিকে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে তাকাল ও। তারপর কোরালের হাতে ধরা রিভলভারের ট্রিগারে ডান হাতের তর্জনী ঢুকিয়ে দিয়ে নলটা নিজের কপালের পাশে ঠেকাল। বলল, 'ঝাপটা দিয়ে হাত সরিয়ে নেবার আগেই ট্রিগার টেনে দিতে পারি আমি। চেষ্টা করে দেখতে চাও?'

'জেসাস ক্রাইস্ট!' মুখের চেহারা রক্তশূন্য হয়ে গেছে কভির। জীবনে অনেক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে সে, কিন্তু এই মুহূর্তে যা ঘটছে তার জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। 'আ-আপনি আত্মহত্যা করতে চাইছেন?'

গলার কাঁপুনি গোপন করার জন্যে চেঁচিয়ে কথা বলছে শিরি, 'একশো বার! আমিই তোমাদের হাতের একমাত্র ঘুঁটি। তোমরা সবাই খুনে ডাকাত, আমার বাবার সর্বনাশ করতে চাও। আমি মারা গেলে বাবাকে তোমরা আর কোন ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবে না।'

'পাগল। স্রেফ পাগলামি...'

'বটেই তো,' বলল শিরি। কোরালের চোখ থেকে মুহূর্তের জন্যে চোখ সরাচ্ছে না। 'তোমাদেরকে পাগলামি করতে দেখে আমারও পাগল না সেজে

উপায় কি? আমি আত্মহত্যা করলেও বাবা বিশ্বাস করবেন তোমরা আমাকে খুন করেছ। শুধু বাবা নয়, দুনিয়ার সবাই তাই বিশ্বাস করবে। একমাত্র মেয়ের খুনের বদলা নেবার জন্যে আইনের দরজায় গিয়ে হাত পাততে হবে না তাঁকে। কয়েক বিলিয়ন ডলার খরচ করার সামর্থ্য আছে যাঁর তিনি তোমাদের মত কয়েক হাজার খুনে-গুণ্ডাকে বেমালুম গুম করে দিতে পারেন।' কোরালের চোখে চোখ রেখে মাথা ঝাঁকাল শিরি। 'হাতটা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করছ না কেন? ভয় লাগছে?' হাসল ও, ঠোঁট জোড়া কাঁপছে। 'আচ্ছা! তাহলে ফেলে দাও রিভলভারটা।'

জুলফি থেকে ঘাম গড়াচ্ছে কোরালের। বোকা বোকা লাগছে তাকে। বস্ কন্ডির দিকে তাকাল সে। এক সেকেন্ড ইতস্তত করে কন্ডি মাথা নাড়ল। হাত থেকে ছেড়ে দিল কোরাল রিভলভারটা। শিরিও তার ডান হাতটা শরীরের পাশে নামিয়ে আনল।

'যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াব আমি,' বলল শিরি, 'যতক্ষণ না নাফাজ মোহাম্মদের মেয়ের জন্যে উপযুক্ত কামরার ব্যবস্থা করতে পারছ তোমরা।'

বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে উঠে নিজেকে সামলে নিয়েছে কন্ডি। কর্তৃত্বের সুরে বলল, 'ঠিক আছে, এটুকু স্বাধীনতা দেয়া গেল আপনাকে। কোরাল, যাও ওর সাথে। কোন চালাকি করতে দেখলেই গুলি করবে—পায়ে।'

ঝুঁকে পড়ল শিরি, তুলে নিল কোরালের ফেলে দেয়া রিভলভারটা, তিন পা এগিয়ে কোরালের বাঁ চোখের ওপর চেপে ধরল নলটা। বাঁ চোখটা বুজে ফেলেছে কোরাল, আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে খোলা চোখটা। 'আমার পায়ে গুলি করবে, না? সারাটা জীবন ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটব আমি?' এদিক ওদিক মাথা দোলাল শিরি। 'সেটি হতে দিচ্ছি না। তার আগে, সুযোগ থাকতেই, তোমার মাথার মগজটুকু বের করে দিতে চাই আমি।'

খোলা মুখের ভেতর থেকে অস্ফুট একটা আতঙ্কের শব্দ বের হয়ে এল কোরালের।

'ফর গডস্ সেক!' হাত দুটো শক্ত মুঠো পাকিয়ে গেছে কন্ডির, দেখে মনে হচ্ছে শিরির কানের পাশে প্রচণ্ড একটা ঘুষি বসিয়ে দেবে সে। কিন্তু শুভ বুদ্ধির পরিচয় দেয়া দরকার এখন, বুঝতে পেরে অতি কষ্টে নিজেকে সামলে রাখছে সে। নরম স্বরে বলল, 'একজনকে অন্তত আপনার সাথে থাকতেই হবে। আপনি বিপদ মুক্ত দেখলেই বারজেনের লোকেরা আমাদেরকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে, সে-ঝুঁকি আমরা কোনভাবেই নিতে পারি না।'

কোরালের চোখ থেকে রিভলভারের নলটা সরিয়ে নিল শিরি। কিন্তু ইতিমধ্যে চোখের চারপাশে চামড়া ছড়ে গেছে, ব্যথায় সেটা ভালভাবে খুলতে পারছে না সে, একটা হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে। 'বারজেনের লোকেরা তোমাদের হাতে বন্দী, ঘরের ভেতর ভরে তালা মেরে রেখেছ। ওদের তরফ থেকে কোন বিপদ হতে পারে না তোমাদের।'

'তালা ভাঙতে কতক্ষণ? কিংবা কেউ যদি খুলেই দেয়? মোট কথা, কোন ঝুঁকি নিতে রাজী নই আমরা।'

'ঠিক আছে,' বলল শিরি। 'আমাকে পাহারা দিতে চাও, দাও, কিন্তু সাবধান!

কোন জানোয়ার আমার দশ ফিটের মধ্যে যেন না আসে। বুঝেছ?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি বলল কন্ডি। চেয়ে বসলে শিরিকে এখন সে আকশ থেকে এই সন্ধেবেলা চাঁদ পেড়ে দিতেও রাজী হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে।

গর্বিত, বিজয়িনীর ভঙ্গিতে এগোল শিরি। সবাই দ্রুত সরে গিয়ে পথ ছেড়ে দিল তাকে। একটা ট্রায়াঙ্গুলার পেরিমিটারের দিকে এগোচ্ছে ও। পুরো বিশ গজ এগিয়ে তারপর সাহস পেল পেছন ফিরে একবার তাকাতে। সেই মুহূর্তে থর থর করে কাঁপতে শুরু করল শরীরটা। কাঁপুনিটা শত চেষ্টা করেও থামাতে পারছে না সে। মনে মনে প্রার্থনা করছে, কেউ যেন দেখে না ফেলে। দশ ফিট নয়, বিশ ফিটের এদিকে আসছে না কোরাল, সেটাই রক্ষে, ভাবছে ও। সাংঘাতিক একটা ঝুঁকি নিয়েছিল সে, মৃত্যু বোধহয় আর মাত্র একচুল দূরে ছিল। ঘোরের মধ্যে যা করার করে ফেলেছে, এখন সে-কথা ভাবতে গেলেও ভয়ে হাত-পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে আসতে চাইছে ওর। আনিসের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। বাবার মুখে ওর সম্পর্কে যতটুকু শুনেছে তার যদি অর্ধেকটাও সত্যি হয়, এই বিপদ থেকে অনায়াসে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে আনিস। কিন্তু কোথায় সে? এখনও কি খবর পায়নি?

প্ল্যাটফর্ম পেরিমিটারের কাছ থেকে দশ ফিট দূরে এসে দাঁড়াল শিরি। কিসের শব্দ? ভাবছে সে। উত্তর-পূব দিকে তাকাল ও। এঞ্জিনের আওয়াজ।

আওয়াজটা কমান্ডার হাম্মাম আর কন্ডিও শুনতে পেয়েছে। কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না কিছু, কারণ এরই মধ্যে অন্ধকার হয়ে এসেছে আকাশ। কিন্তু শব্দটা চিনতে দু'জনের কারও ভুল হচ্ছে না। একটা হেলিকপ্টার। কে আসছে সে-ব্যাপারেও ওদের মনে কোন ভুল ধারণা নেই।

উৎফুল্ল সুরে বলল কন্ডি, 'মহান পুরুষ নাফাজ মোহাম্মদ। তাঁর সঙ্গ পাবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছি আমি। কোথায় নামবে হেলিকপ্টারটা, কমান্ডার?'

চার

থম থম করছে কমান্ডার লিল হাম্মামের চেহারা। সাগর কন্যা বেদখল হয়ে যাওয়ায় মি. নাফাজ তার উপর কতটুকু অসন্তুষ্ট হবেন ভাবতে গিয়ে মাথাটা ঘুরে উঠছে তার। যে যাই বলুক, সাগর কন্যাকে রক্ষা করার দায়িত্ব তার উপরই বর্তায়, সে-দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে সে। মনে মনে নিজেকে অভিশাপ দিয়ে দুর্ভোগের জন্যে তৈরি হয়ে গেল। কন্ডির দিকে তাকিয়ে বলল, 'দক্ষিণ-পুব দিকের হেলিপ্যাডে।'

প্ল্যাটফর্মের আরেক দিকে তাকাল কন্ডি। দূরে দেখা যাচ্ছে শিরি ফারহানাকে, বিশ ফিটের ভেতরে থেকে তাকে পাহারা দিচ্ছে কোরাল, নির্জীব হাতে ধরা কোল্ট অটোমেটিকটা ঝুলছে শরীরের পাশে। সন্তুষ্ট হয়ে মেশিন-পিস্তলটা বের করল কন্ডি, বলল, 'চলো যাই, মি. নাফাজকে অভ্যর্থনা জানাতে হবে। টেসিও,

আমাদের সাথে এসো।'

'মি. নাফাজ তোমার রক্তপান করবেন,' হঠাৎ মুচকি হেসে বলল কমান্ডার হাম্মাম।

'মানে, কি বলতে চাও?'

'তাঁর মেয়েটাকে দেখলে তো, সাক্ষাৎ বাঘিনী,' বলল কমান্ডার। 'এবার বুঝে নাও বাপ ভদ্রলোক কেমন হবেন।'

'হুঁহ,' শব্দটা উচ্চারণ করে পা বাড়াল কন্ডি। তাকে অনুসরণ করছে কমান্ডার। পেছনে টেসিও। 'কপ্টারটাও হেলিপ্যাডে নামল, ওরাও পৌঁছুল সেখানে। প্রথমে নামলেন নাফাজ মোহাম্মদ। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। দু'চোখ ভরা অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে আছেন অপরিচিত সশস্ত্র লোকগুলোর দিকে। ঝট্ করে ফিরলেন, কঠিন সুরে জানতে চাইলেন, 'এসব কি, কমান্ডার?'

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে কমান্ডার। সহাস্যে উত্তর দিল কন্ডি, 'সাগর কন্যায় আপনি আজ আমাদের মেহমান। স্বাগতম, মি. নাফাজ মোহাম্মদ। ব্যাপারটা কিছু না, আপনার সাগর কন্যার মালিকানা বদল হয়ে গেছে, এই আর কি।'

ব্যর্থতার গ্লানি ভরা মুখ তুলে কমান্ডার লিল হাম্মাম বলল, 'লোকটার পুরো নাম জানি না, স্যার। শুধু কন্ডি বলছে।' এক সেকেন্ড থেমে আবার বলল সে, 'আমার বিশ্বাস, হেকটরের লোক ও।'

'হেকটর!' মুখের চেহারা বিকৃত করে দ্রুত জানতে চাইল কন্ডি। 'কি জানো তুমি হেকটর সম্পর্কে?'

'কিছু এসে যায় না,' বললেন নাফাজ মোহাম্মদ, 'দুদিনের বাদশাহী বৈ তো নয়। করতে দাও। দু'দিন পর হেকটরকেই খুঁজে পাওয়া যাবে না।' লক্ষ করছেন, অস্বস্তির ছায়া পড়ছে কন্ডির চোখে।

মেয়ের চেয়ে কম নয় বাপটা, কমান্ডারের কথাটাই সত্যি, ভাবছে কন্ডি। সাগর কন্যা বেদখল হয়ে গেছে দেখেও এতটুকু বেসামাল দেখাচ্ছে না তাঁকে। নিজের শক্তি সম্পর্কে তাঁর মনে যেন একবিন্দু সংশয় নেই। বুকের ভেতর ছোট্ট একটা ভয় বাসা বাঁধছে কন্ডির।

'শয়তানটা নিশ্চয়ই লোকজন নিয়ে এসেছে?' জানতে চাইলেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'ক'জন ওরা?'

'চারজন।'

'চারজন!' অবিশ্বাসে ভুরু কুঁচকে উঠল নাফাজ মোহাম্মদের। 'কিন্তু জিউসেপ বারজেনের সাথে বিশজনের ওপর লোক রয়েছে। কিভাবে...'

অস্বস্তি বোধ কাটিয়ে উঠেছে কন্ডি। কৃত্রিম বিনয়ের সাথে বলল সে, 'সম্ভব হলো আপনার একমাত্র মেয়ে আমাদের হাতে আছে বলে।'

ভাল করে রিহার্সেল দেয়া অভিনয়টা আশ্চর্য নিখুঁত হলো নাফাজ মোহাম্মদের। শত্রুদের হাতে তাঁর মেয়ে আছে একথা শোনা মাত্র বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল তাঁর চেহারায়। ধীরে ধীরে উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল চোখে। মনে মনে ভাবছেন,

মাসুদ রানা যতক্ষণ মৌন থাকতে বলে দিয়েছেন তার চেয়ে বেশি সময় পেরিয়ে যাচ্ছে কিনা। গুনে গুনে আরও পাঁচ সেকেন্ড বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন তিনি, তারপর বললেন, 'গ্রেট গড অলমাইটি! আমার মেয়ে! আমার মেয়ে! আমার শিরি তাহলে...' তাঁর পেছনে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে আনিস, ভাবছে, মি. নাফাজ তেলের ব্যবসায় না এসে অভিনয় করতে নামলেও দুনিয়া-জোড়া নাম করতে পারতেন, দু'একটা অস্কারও যে তাঁর কপালে না জুটত এমন নয়। '...তোমরাই তাহলে আমার মেয়েকে কিডন্যাপ করেছ?'

'ভাগ্যের সদয় উদারতা, স্যার,' বলল কন্ডি। নাফাজ মোহাম্মদের চেহারায় ব্যক্তিত্ব আর আভিজাত্যের আশ্চর্য প্রকাশ দেখে তাঁর পরম শত্রুরাও তাঁকে সসম্ভ্রমে স্যার বলে সম্বোধন না করে পারে না। 'আপনার যদি আপত্তি না থাকে, স্যার, এবার আপনার সহযাত্রীদের সুরতগুলো দেখতে ইচ্ছে করি।'

'কপ্টার থেকে নামছে মাসুদ রানা আর আনিস আহমেদ। দু'জনের পরনেই বিজনেস স্যুট, মাথায় পানামা হ্যাট, শিং দিয়ে তৈরি রিমের প্লেন লেন্সের চশমা—নিখুঁত ছদ্মবেশ নিয়ে আছে ওরা, পরিচিত কেউ দেখলেও এখন ওদেরকে চিনতে পারবে না। 'সাদ্দাম,' রানাকে দেখিয়ে বললেন নাফাজ মোহাম্মদ, তারপর তাকালেন আনিসের দিকে। 'শমসের। সায়েন্টিস্ট—জিয়োলজিস্ট আর সিসমোলজিস্ট।' ওদের দু'জনের দিকে ফিরে তাকালেন তিনি, ম্লান গলায় বললেন, 'এরা আমার মেয়েকে সাগর কন্যায় নিয়ে এসে আটকে রেখেছে।'

'গুড গড!' আহত বিস্ময়ে আঁতকে উঠে বলল রানা। 'এত জায়গা থাকতে সাগর কন্যায়...চিন্তার অতীত!'

একটু গর্বের সাথে হাসল কন্ডি। 'তা বটে। অপ্রত্যাশিত কিছু করার বুদ্ধি আছে বলেই না আমরা বিরোধী পক্ষের চেয়ে দু'এক ধাপ এগিয়ে থেকে টেক্কা মারছি। সে যাক। এখানে আসার পেছনে উদ্দেশ্য কি আপনাদের?'

'তেলের নতুন উৎস খুঁজে বের করা,' বলল রানা। 'সমস্ত যন্ত্রপাতিসহ বিরাট ল্যাবরেটরি আছে এখানে আমাদের।'

'ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, তেল খুঁজতে এসে সাংঘাতিক বিপদে জড়িয়ে পড়েছেন,' বলল কন্ডি। 'আপনাদের ব্যাগগুলো পরীক্ষা করে দেখতে পারি?'

'আপত্তি করলে মানবেন?' নিরীহ, গোবেচারা ভঙ্গিতে জানতে চাইল আনিস।

'না।'

'আজেবাজে কথা বলে সময় নষ্ট করবেন না, প্লীজ,' বলল আনিস। 'যা করার করুন, তারপর আমাদেরকে ছেড়ে দিন। হাতে অনেক কাজ নিয়ে এসেছি আমরা।'

চোটপাট দেখিয়ে কি যেন বলতে গিয়ে ক্ষান্ত হলো কন্ডি। তাকাল টেসিওর দিকে, বলল, 'ওদের ব্যাগ সার্চ করো।'

দ্রুত সার্চ করা শেষ করে টেসিও বলল, 'পোশাক। বই। আর কিছু সায়েন্টিফিক ইকুইপমেন্ট।'

সিঁড়ি বেয়ে এতক্ষণে নেমে আসছেন ড. কিপলিং। নিচে নেমে ওপর দিকে হাত তুলে পাইলটের কাছ থেকে এক এক করে নিচ্ছেন নিজের ব্যাগ আর নানা রকম

বাক্স। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে কভি। জানতে চাইল, 'ইনি আবার কে?'

'ডা. কিপলিং,' বললেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'অত্যন্ত সম্মানী একজন ডাক্তার এবং সার্জেন। আমার ধারণা ছিল ব্যাপক রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটবে সাগর কন্যায়। তৈরি হয়েই এসেছি আমরা। আমাদের এখানে সিক-বে আর একটা ডিসপেনসারী আছে।'

'ধারণাটা যে ভুল তা তো দেখতেই পাচ্ছেন,' বলল কভি। 'রক্তপাত আমরা পছন্দ করি না, বিশেষ করে যুদ্ধে যখন আমরাই জিতছি। আপনার ব্যাগ আর বাক্সগুলো পরীক্ষা করতে পারি, ডাক্তার সাহেব?'

'সেটা আপনার ইচ্ছে। একজন ডাক্তার হিসেবে জীবনের সাথে সম্পর্ক আমার, মৃত্যুর সাথে নয়। কোন মারণাস্ত্র সাথে করে নিয়ে আসিনি আমি। ডাক্তারী আদর্শে সেটা নিষেধ।' একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন ডাক্তার কিপলিং। 'সার্চ করুন, কিন্তু দয়া করে কিছু নষ্ট করবেন না।'

কোটের পকেট থেকে ওয়াকি-টকিটা বের করল কভি, বলল, 'জিউসেপ বারজেনের একজন লোককে দিয়ে এখানে একটা ইলেকট্রিক ট্রাক পাঠাও। এখান থেকে একগাদা যন্ত্রপাতি নিয়ে যেতে হবে।' ওয়াকি-টকিটা রেখে দিল সে। তাকাল রানার দিকে। ভুরু কুঁচকে উঠল তার। বলল, 'কি ব্যাপার? আপনার হাত কাঁপছে কেন?'

'শান্তিকামী মানুষ আমি,' একটা ঢোক গিলে বলল রানা, হাত দুটো পেছন দিকে লুকিয়ে ফেলল, যাতে কাঁপুনিটা আর কেউ দেখতে না পায়। 'তাই খুন-জখমের কথা শুনলে একটু ভয় পাই।'

'ভীতুর ডিম!' চেহারাটা হঠাৎ রাগে বিকৃত হয়ে উঠল কভির। 'কাপুরুষদের ঘৃণা করি আমি।'

কভির রাগ দেখে ভয় পাবার ভঙ্গিতে পেছন থেকে হাত দুটো সামনে নিয়ে এল রানা। এখনও কাঁপছে সে-দুটো। সামনে বাড়ল কভি, তার ডান হাত স্যাৎ করে সরে গেল পেছন দিকে, প্রচণ্ড জোরে একটা চড় মারতে যাচ্ছে রানাকে। পর মুহূর্তে নিরাশ ভঙ্গিতে শরীরের পাশে নামিয়ে আনল হাতটাকে। বলল, 'হাত গন্ধ করতে চাই না।' কভির প্রবৃত্তির মধ্যে এত বেশি পাশবিকতা রয়েছে যে ওর অবচেতন মন কোনরকম বিপদ সঙ্কেত টের পেতে অভ্যস্ত নয়। সে ক্ষমতা যদি থাকত তার, টের পেত, আধ সেকেণ্ডের জন্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল রানার হাতের কাঁপুনি; বুঝে ফেলত, সেই মুহূর্তে ঠিক তার মাথার উপর কালো মৃত্যু-পাখি দ্রুত ডানা ঝাপটাচ্ছিল।

'আমার মেয়েকে দেখতে পারি আমি?' জানতে চাইলেন নাফাজ মোহাম্মদ।

প্রস্তাবটা একটু বিবেচনা করে দেখল কভি, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, সার্চ করো, টেসিও।'

নাফাজ মোহাম্মদের তীব্র দৃষ্টি এড়িয়ে দ্রুত তাঁকে সার্চ করা শেষ করল টেসিও। 'উনি নিরস্ত্র, মি. কভি।'

'ওদিকে,' হাত তুলে একদিকের অন্ধকার দেখিয়ে বলল কভি, 'প্ল্যাটফর্মের কাছাকাছি।'

কারও দিকে না তাকিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে গেলেন নাফাজ মোহাম্মদ। অন্যান্যরা অ্যাকোমোডেশন কোয়ার্টারের দিকে এগোল।

হঠাৎ অন্ধকার থেকে ভূতের মত সামনে এসে দাঁড়াল কোরাল। 'এই যে মিস্টার, যাওয়া হচ্ছে কোথায়?'

'নাফাজ মোহাম্মদের সাথে কথা বলছ তুমি।'

ওয়াকি-টকিতে কথা বলল কোরাল, 'মি. কভি? এক লোক বলছে…'

'উনি মি. নাফাজ,' গলা ভেসে এল কভির, 'ওঁকে সার্চ করা হয়েছে। মেয়ের সাথে দেখা করতে যাচ্ছেন…'

কোরালের হাত থেকে ওয়াকি-টকিটা কেড়ে নিলেন নাফাজ মোহাম্মদ, কভিকে বললেন, 'আর, তোমার এই গরুটাকে বলে দাও, কাছে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা যেন শুনতে চেষ্টা না করে।'

'দূরে সরে থাকো, কোরাল।' অফ হয়ে গেল ওয়াকি-টকি।

বাপ মেয়ের পুনর্মিলনটা দু'জনের মধ্যে দু'রকমের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। কেঁদেকেটে অস্থির হলো শিরি, কিন্তু নাফাজ মোহাম্মদের মধ্যে ভাবাবেগের বিশেষ কোন লক্ষণ দেখা গেল না। মেয়েকে বুকের মধ্যে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন তিনি। কিন্তু নিজেকে সংযত রেখেছেন।

'আমাকে দেখে তুমি খুশি হওনি, বাবা?' চোখ দুটো ছল ছল করছে শিরির।

মেয়ের কাঁধে বন্ধুর মত একটা হাত রেখে নাফাজ মোহাম্মদ বললেন, 'তুমিই তো আমার সব। এতদিনেও কি সে-কথা জানোনি?'

'কিন্তু এ-কথা আর কোনদিন তো আমাকে বলোনি তুমি।'

'বলার প্রয়োজন হয়নি, তাই। আমার ধারণা ছিল, প্রথম থেকেই জানো তুমি। কে জানে, আমি হয়তো তেমন আনুষ্ঠানিকতা পছন্দ করি না। কিন্তু এ-কথা জেনো, তোমার লাল চুলের একটা বেণীর কাছেও আমার সমস্ত বিলিয়নের কোন দাম নেই।'

'লালচে, ড্যাডি, লালচে। কতবার মনে করিয়ে দেব তোমাকে?' শিরি এখন প্রকাশ্যে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। 'আরেকটা কথা।' রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বলল সে, 'আমাকে দেখে মোটেও অবাক হওনি তুমি। আমি এখানে আছি, জানতে, না?'

'অবশ্যই জানতাম।'

'কিভাবে?'

'সে-কথা এখুনি তোমাকে জানানো উচিত বলে মনে করি না।'

'দেখলাম তোমার সাথে আরও তিনজন ভদ্রলোক এলেন,' বলল শিরি। 'ওরা কারা, বাবা? অন্ধকার হয়ে এসেছিল, ভাল করে দেখতে পেলাম না।'

'ওদের মধ্যে একজন হলেন ডা. কিপলিং। সার্জেন হিসেবে তাঁর তুলনা হয় না।'

শিরি অবাক হয়ে জানতে চাইল, 'সার্জেন? তাঁকে এখানে আমাদের কি দরকার?'

'বোকার মত কথা বোলো না। একজন সার্জেনের যা কাজ উনি সেই কাজ করার জন্যেই এখানে এসেছেন। তুমি কি ধরে নিয়েছ প্লেটে সাজিয়ে ওদের হাতে

তুলে দেব সাগর কন্যাকে?'

'অপর দুই ভদ্রলোক?'

'ওদেরকে তুমি চেনো না। ওদের কথা কখনও শোনোনি। যদি দেখা হয়ে যায়, এবং চিনতে পারো, এমন ভাব দেখাবে যে জীবনে যেন ওদেরকে কখনও...'

'একজনকে এখন চিনতে পারছি,' বাবাকে থামিয়ে দিয়ে বলল শিরি, 'আনিস। আরেকজন, ঠিক জানি না, সম্ভবত আনিসের সেই কিংবদন্তীর নায়ক—মাসুদ রানা। ঠিক?'

'হ্যাঁ। কিন্তু মনে রেখো, ওদেরকে তুমি চেনো না।'

'আচ্ছা, আচ্ছা!' আনন্দ চেপে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে শিরি।

'এতে তোমার খুশি হবার সঙ্গত কারণ অবশ্যই আছে,' একটা হাসি দমন করে বললেন নাফাজ মোহাম্মদ।

'এটা ঠাট্টার সময় নয়, ড্যাডি,' বলল শিরি। চেহারাটা হঠাৎ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে তার। 'ওরা এল কেন? যেচে পড়ে এত বড় বিপদে নিজেদেরকে না জড়ালেই কি চলত না? কিছু যে করতে পারবে না তা তো বোঝাই যাচ্ছে।'

'কিস্যু জানো না তুমি,' চাপা স্বরে বললেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'ওরা এখানে এসে কোন বিপদে পড়েনি, বিপদে পড়েছে আমাদের শত্রুপক্ষ। যতটুকু বুঝতে পারছি, ওরা তোমাকে কিডন্যাপারদের হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে এসেছে।'

'তা কিভাবে সম্ভব?' বলল শিরি। 'আমি তো বুঝতে পারছি না!'

খোলাখুলি স্বীকার করলেন নাফাজ মোহাম্মদ, 'কিভাবে সম্ভব তা আমিও জানি না। ওরা হয়তো জানে, কিন্তু জানলেও আমাকে বলবে না। আমার ওপর কর্তৃত্ব ফলাচ্ছে ওরা, নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে বললেও কম বলা হয়। একজোড়া শকুনের মত নজর রাখছে আমার ওপর। ওদের হাতে এক রকম বন্দী হয়ে আছি আমি। জানো, আমাকে একটা ফোন পর্যন্ত করতে দিচ্ছে না।' নিঃশব্দে হাসছে শিরি, তার কারণ বাবাকে মোটেও অসন্তুষ্ট বলে মনে হচ্ছে না তার। 'মাসুদ রানা, বিশেষ করে ওই মাসুদ রানা রীতিমত হুকুম চালাচ্ছে আমার ওপর। কিছু বলতেও পারছি না।'

'কেন?'

'বলছে, যা কিছু করছে ওরা সবই নাকি আমার মঙ্গলের জন্যে করছে।'

'ভদ্রলোককে তাহলে খুবই ভাল মানুষ বলতে হয়।'

'ভাল মানুষ?' একটু চিন্তা করে উত্তর দিলেন নাফাজ মোহাম্মদ, 'আমার তা মনে হয় না। ভালমানুষ বলতে সাধারণত আমরা বোকা লোক বুঝি। নিরীহ লোক বুঝি। কিন্তু সে তা নয়। সাগর কন্যায় পা ফেলেই আর একটু হলে খুন করে ফেলেছিল কন্ডিকে। কন্ডি কিছু টের পায়নি, সেটাই রক্ষে। সম্ভবত তুমি ওদের হাতে রয়েছ বলে ওর হাত থেকে এ-যাত্রা বেঁচে গেল কন্ডি। যাই হোক, চলো আমার স্যুইটে যাওয়া যাক। সেই ওয়াশিংটন থেকে এসেছি আমি, শরীরটা বড় ক্লান্ত। একটু জিরিয়ে না নিলেই নয়।'

সাগর কন্যার রেডিও রুম। ভেতরে ঢুকল কন্ডি। অপারেটরকে জানাল, আবার খবর দিয়ে ডেকে না পাঠানো পর্যন্ত তাকে এখানে দরকার নেই, সে যেন নিজের কোয়ার্টারে গিয়ে চুপচাপ একজায়গায় বসে থাকে। অপারেটর চলে গেল। কন্ডি নিজে একজন এক্সপার্ট রেডিও অপারেটর, এক মিনিটের মধ্যে সী-উইচের সাথে যোগাযোগ করল সে, আরও ত্রিশ সেকেন্ড পর কথা বলতে শুরু করল হেকটরের সাথে।

'সাগর কন্যা থেকে কন্ডি বলছি। সব ঠিক আছে এখানে। লেডী ফারহানা আর মি. নাফাজ মোহাম্মদ আমাদের হাতে বন্দী।'

'ভাল,' বলল হেকটর। রূঢ় শোনাল তার কণ্ঠস্বর। কিন্তু মনে মনে খুশি হয়েছে সে। আনন্দ প্রকাশ করা তার স্বভাবের বাইরে। 'নাফাজ মোহাম্মদ সাথে আর কাউকে নিয়ে আসেনি?'

'পাইলট ছাড়া আরও তিনজনকে। একজন ডাক্তার—সার্জেন, দেখে ভুয়া বলে মনে হচ্ছে না। মি. নাফাজ মনে করেছিলেন এখানে খানিকটা রক্তপাত হবে। ডাক্তারের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্যে একটু পরই ফ্লোরিডায় খবর নিচ্ছি আমি। বাকি দু'জন টেকনিশিয়ান—জিওলজিস্ট আর ওই ধরনের কি যেন। মিথ্যে পরিচয় দিচ্ছে না, চেহারাতেই লেখা রয়েছে কাপুরুষ। কাঁধে ঝোলানো মেশিন-পিস্তল দেখেই হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা যাচ্ছিল। কারও কাছে কোন অস্ত্র নেই।'

'কোন সমস্যাই নেই তাহলে?'

'আছে। তিনটে। প্রায় বিশ জন লোকের একটা সশস্ত্র যোদ্ধা বাহিনী রয়েছে মি. নাফাজের। বেশিরভাগ প্রাক্তন আর্মি। দ্বিতীয় সমস্যা, সাগর কন্যায় আটটা ডুয়াল-পারপাস অ্যান্টি এয়ারক্র্যাফট গান রয়েছে। প্ল্যাটফর্মে বসাবার কাজও সেরে রেখেছে ওরা।'

'আচ্ছা? তাই নাকি? বলো কি?'

'হ্যাঁ। শুধু তাই নয়, প্ল্যাটফর্মের কিনারা বরাবর লাইন দিয়ে সাজানো রয়েছে ডেপথ চার্জ। তার মানে এখন আমরা জানি গতরাতে কার হুকুমে মিসিসিপি ন্যাভাল আর্মারী লুট হয়েছে। তিন নম্বর সমস্যা হলো, সংখ্যায় আমরা আশঙ্কাজনকভাবে কম। আমি, সাথে মাত্র চারজন লোক—এতগুলোকে সামলাব কিভাবে? ঘুমুতে হবে না আমাদের? আরও লোক চাই আমার, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'কাল সকালে বিশ জনের একটা দল পৌঁছে যাবে তোমার কাছে,' বলল হেকটর। 'ওটা রিলিফ রিগ ক্রুদেরও পৌঁছুবার সময়। দলের নেতৃত্ব থাকবে বেলটন নামে একজন লোকের ওপর, তার মত লাল দাড়ি জীবনে কখনও আর কারও মুখে দেখোনি তুমি—দেখলেই চিনতে পারবে।'

'কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। এখুনি লোক লাগবে আমার। সী-উইচে আপনার হেলিকপ্টার রয়েছে...'

'তাতে কি? তুমি কি মনে করো সী-উইচে এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য রেখেছি আমি?' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে অনিচ্ছার সাথে আবার বলল হেকটর, 'খুব জোর আটজন লোক হাতছাড়া করতে পারি আমি, তার বেশি নয়।'

'আপাতত চলবে। একটা কথা, সাগর কন্যায় রাডার আছে।'

'অজানা কোন ব্যাপার নয়। কি এসে যায় থাকলে? সাগর কন্যা তো তোমার দখলেই।'

'তা ঠিক, মি. হেকটর। কিন্তু আপনার কাছ থেকে শেখা সেই নিয়মটার কথা ভাবছি—কোন রকম ঝুঁকি নিতে নেই।'

এক সেকেন্ড চুপ করে থেকে উত্তর দিল হেকটর, 'আমাদের হেলিকপ্টার টেক-অফ করছে, খবর পাওয়া মাত্র অচল করে দেবে রাডার।'

'বোমা মেরে একেবারে উড়িয়ে দেব রাডার কেবিন?'

'না। পরিস্থিতি যখন পুরোপুরি আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে তখন সম্ভবত ওটাকে কাজে লাগাবার দরকার হবে। স্ক্যানারটা বোধহয় ড্রিলিং ডেরিকের মগডালে রয়েছে, না?'

'হ্যাঁ।'

'ওটার চক্কর মারা বন্ধ করা ছোট্ট একটা সহজ মেকানিকাল কাজ, উঁচুতে উঠতে ভয় পায় না এমন যে-কোন লোকের পক্ষে সম্ভব, সাথে একটা স্প্যানার নিয়ে যেতে হবে। এবার আমাকে জানাও দেখি নাফাজ মোহাম্মদের যোদ্ধারা ঠিক কোথায় মুখ লুকিয়ে আছে? তথ্যটা জানাতে হবে বেলটনকে।'

তথ্যটা জানিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল কন্ডি।

পাশাপাশি দুটো হলরুম। একটা ডিসপেনসারী কাম সিক-বে, অপরটা ল্যাবরেটরি। ডাক্তার কিপলিংকে তাঁর বাক্স থেকে যন্ত্রপাতি নামাতে সাহায্য করছে রানা আর আনিস। ওদের উপর নজর রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাইরে দাঁড়িয়ে দুটো দরজা পাহারা দিচ্ছে টেসিও, হাতে মেশিনপিস্তল। তবে সতর্ক, সজাগ কোন ভাব দেখা যাচ্ছে না তার মধ্যে, দরজার দিকে পিছন ফিরে অলস ভঙ্গিতে শিস দিচ্ছে সে। ডাক্তার আর টেকনিশিয়ান দু'জন, বিশেষ করে টেকনিশিয়ান দু'জন, ভীতুর ডিম—'কপ্টার থেকে নেমে ওদেরকে কাঁপতে দেখেই বুঝে নিয়েছে সে। এদের পাহারা দেবার কোন মানেই হয় না, কিন্তু বসের নির্দেশ, অমান্য করাও যায় না। বাধ্য হয়ে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে তাকে।

সিক-বেতে ওরা তিনজন মারাত্মক একটা ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে এই মুহূর্তে। সরাসরি না তাকিয়ে খোলা দরজার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে রানা। ডাক্তার কিপলিং তাঁর একটা বাক্স খুলে ডাক্তারী সাজ-সরঞ্জামগুলো নামিয়ে ফেলেছেন। এখন তিনি বাক্সটার চোরা একটা ঢাকনি সরিয়ে ভেতরে হাত গলিয়ে একটা একটা করে দুটো থারটি-এইট স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন বের করছেন। সাথে দুটো ওয়েস্টব্যান্ড হোলস্টার, দুটো সাইলেন্সার, আর দুটো স্পেয়ার ম্যাগাজিন। দ্রুত, দক্ষতার সাথে ওগুলো নিজেদের শরীরে ফিট করে নিল রানা আর আনিস। মৃদু কণ্ঠে ডাক্তার কিপলিং বললেন, 'সাবধান, কেউ যেন বুঝতে না পারে আপনাদের কাছে অস্ত্র আছে।'

নিঃশব্দে হাসল রানা। বলল, 'ধন্যবাদ, ডাক্তার। আমাদের ব্যাপারে কিচ্ছু ভাবতে হবে না আপনাকে।'

'আপনাদের ব্যাপারে ভাবছিও না আমি,' গাম্ভীর্যের সাথে বলল ডাক্তার কিপলিং, 'একজন ধার্মিক লোক পাপীদের জন্যেও প্রার্থনা করতে পারে।'

পাঁচ

লেক তাহো। মার্কিন তেল ব্যবসায়ী রুবার্ট অরবেনের বাগান বাড়ি। দশজন তেল ব্যবসায়ীকে নিয়ে আজ আবার বৈঠকে বসেছে সে। কিন্তু আগের বারের বৈঠকের সাথে এই বৈঠকের পরিবেশ বা মেজাজের কোন মিলই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আগের বৈঠকটা ছিল উষ্ণ, সজীব, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। সেবার এদের কথাবার্তা থেকে বোঝা গিয়েছিল তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ রোধ আর মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে এক জায়গায় বসে দৃঢ়, অপরিহার্য সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছে ওরা।

কিন্তু আজকের এই সন্ধ্যার বৈঠকে পরিবেশ একশো আশি ডিগ্রী বদলে গেছে। হতাশায় ম্লান হয়ে আছে সবার চেহারা। কমবেশি সবাই উদ্বিগ্ন। অনিশ্চয়তায় ভুগছে।

আজকের বৈঠকেও সভাপতিত্ব করছে অরবেন। প্রধান বক্তার ভূমিকাটাও নিতে হয়েছে তাকে।

'...হ্যাঁ, জেন্টলমেন, সেই কথাই বলতে চাইছি আমি,' দ্রুত কথা বলছে অরবেন, তার প্রতিটি কথা উপস্থিত সবার কান বেয়ে মর্মে গিয়ে আঘাত হানছে, 'আমাদের সামনে এখন বিপদ। ছোট, সাধারণ বিপদ নয়, এমন একটা সর্বগ্রাসী বিপদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে যেটা আমাদের সবাইকে একেবারে ডুবিয়ে দিতে পারে। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির জন্যে আমাদের দুটো ভুল ধারণা দায়ী। এক, নাফাজ মোহাম্মদের অসাধারণ ক্ষমতাকে ছোট করে দেখেছিলাম আমরা। দুই, আমরা ভেবেছিলাম সূক্ষ্ম নৈপুণ্য আর চতুর কৌশল দিয়ে কাজ সারবে হেকটর—কিন্তু চাতুর্যের বা নিপুণতার কোন স্বাক্ষর রাখতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে সে। আমি স্বীকার যাচ্ছি হেকটরের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে অন্যায় করেছি আমি। হেকটরের নাম প্রস্তাব করার জন্যে আমার মত আরেকজনও দায়ী—কিন্তু সে কথা থাক। আপনারা সবাই হেকটরের প্রতি দৃঢ় আস্থা পোষণ করেছিলেন, এক বাক্যে সবাই বলেছিলেন একমাত্র হেকটরের পক্ষেই সুচারুভাবে কাজটা করা সম্ভব। তখন আমরা কেউ একবার ভেবেও দেখিনি যে হেকটর নাফাজ মোহাম্মদকে ব্যক্তিগতভাবে কতটা ঘৃণা করে। ভেবে দেখিনি, তার নিজের সর্বনাশের বিনিময়ে, আমাদের সবার সর্বনাশের বিনিময়ে হলেও নাফাজ মোহাম্মদকে শায়েস্তা করে ছাড়বে সে। তার বাড়াবাড়ি কল্পনার সীমা ছাড়িয়ে গেছে, কিন্তু ওদিকে নাফাজ মোহাম্মদও তার ক্ষমতার সবটুকু ব্যবহার করার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছেন।

'পেন্টাগনে দু'একজন বন্ধু আছে আমার, তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ পদে না থাকলেও প্রয়োজনে কাজ দেয়। সেই বন্ধুদের মধ্যে একজন স্টেনোগ্রাফার আছে,

এবার তাকে আমার নিজের গাঁটের বিশ হাজার ডলার দিয়ে যে তথ্যটা আদায় করেছি সেটা কোন অর্থেই সুখকর নয়।

'প্রথম তথ্য, আমাদের প্রথম গোপন বৈঠকের কথা, আলোচ্য বিষয় সহ, সমস্তটাই প্রকাশ হয়ে গেছে। আমরা কে কে উপস্থিত ছিলাম, কে কি বলেছি—কিছুই আর গোপন নেই।' থামল অরবেন, সবার মুখের দিকে একবার করে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে সে। কি যেন আবিষ্কার করার চেষ্টা করছে।

অন্যায় ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণের কথা ফাঁস হয়ে গেছে শুনে ভয়ে চুপসে গেছে সবার চেহারা। সচকিত, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে সবাই।

'কিন্তু আমরা ভেবেছিলাম আমাদের বৈঠকের গোপনীয়তা শতকরা একশো ভাগ বজায় থাকবে...' কথাটা বলল আরবের একজন আমীর। 'আমাদের উপস্থিতির কথা বাইরের কেউ জানল কিভাবে?'

'বাইরের কোন এজেন্সী এর মধ্যে নাক গলায়নি, এ-কথা আমি জোর গলায় বলতে পারি,' বলল অরবেন। 'ক্যালিফোর্নিয়া ইন্টেলিজেন্সে বিশ্বস্ত বন্ধু আছে আমার। আমাদের ব্যাপারে তাদের কোন আগ্রহই নেই। এফ-বি-আইও জড়িত নয়। কেননা, এখনও আমরা কোন অপরাধ করিনি, বা অপরাধ করে রাজ্য সীমানা পেরিয়ে কোথাও গা ঢাকা দিইনি। আরেকটা কথা। প্রথমবার এখানে বৈঠকে বসার আগে একজন ইলেকট্রনিক এক্সপার্টকে দিয়ে শুধু এই কামরাটা নয়, গোটা বাড়িটাই চেক করিয়ে নিয়েছিলাম আমি। সে কোন আড়িপাতা যন্ত্র খুঁজে পায়নি।'

'হয়তো সে-ই বেঈমানী করেছে...' বলল আরবের আমীর।

'অসম্ভব! সে যে শুধু আমার ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধু তাই নয়, চেক করার সময় মুহূর্তের জন্যেও তার কাছ থেকে নড়িনি আমি।'

ভেনিজুয়েলান তেল ব্যবসায়ী বেলোনি বলল, 'তাহলে একটা মাত্র সম্ভাবনা বাকি থাকছে। এখানে উপস্থিত আমাদের মধ্যে কেউ একজন বেঈমান।'

'হ্যাঁ।'

'কে?'

'কে তা আমি কি করে জানব?' বলল অরবেন। 'হয়তো কোন দিনই তার পরিচয় জানা সম্ভব হবে না।'

আরবের অপর এক লোক, একজন শেখ এবার বলল, 'মি. ঈগলটন নাফাজ মোহাম্মদের খুব কাছাকাছি থাকেন, তাই না?'

'থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ,' সহাস্যে বলল ঈগলটন।

'যার মাথায় একটু মগজ আছে সে এত স্পষ্ট ভাবে সন্দেহের কারণ তৈরি করে রাখে না,' বলল অরবেন। 'তাছাড়া, আমরা সবাই জানি নাফাজ মোহাম্মদের সাথে মি. ঈগলটনের সম্পর্ক সাপে নেউলে। আমাদের মধ্যে তিনিই তার সবচেয়ে রূঢ় সমালোচক।'

'একমাত্র আমারই এখানে উপস্থিত থাকার সঙ্গত কোন কারণ নেই,' বলল রাশিয়ার নিশ্চেভ। 'অন্তত, আমার স্বার্থটা কি তা আমি আপনাদের সবাইকে খোলাসা করে বলিনি।' হাসিখুশি ভাবটা আবার দেখা যাচ্ছে তার চেহারায়। 'আমি আপনাদের সেই বেঈমান হতে পারি।'

'এ-প্রসঙ্গে আমার কিছু কথা বলার আছে,' গম্ভীরভাবে বলল অরবেন। 'আপনি, মি. নিশ্চেভ, কে.জি.বি-র একজম খুব উঁচুদরের স্পাই, বলা উচিত স্পাইদের বস্। আপনার নামও নিশ্চেভ নয়। আপনার নাম, আমি জানি, গুস্তাফ তাতাভস্কি। সে যাই হোক, এখানে আপনার উপস্থিত থাকার দুটো কারণ আছে। এক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার যাতে কম দামে তেলের সরবরাহ না পায় সে-ব্যাপারে যতটুকু পারা যায় চেষ্টা করা। দুই, এবং এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এই বৈঠকে যোগ দেবার ব্যাপারে যতটা না আপনার সরকারের চাপ আছে তার চেয়ে বেশি আছে আপনার ব্যক্তিগত গরজ।'

বিশালদেহী নিশ্চেভ ওরফে গুস্তাফ তাতাভস্কির প্রকাণ্ড মুখটা লাল হয়ে উঠেছে, কিন্তু যেহেতু অরবেন একটাও মিথ্যে কথা বলছে না, সুতরাং মুখ বুজে থাকা ছাড়া আর কোন উপায়ও দেখতে পাচ্ছে না সে।

'আপনার ব্যক্তিগত গরজটা হলো মাসুদ রানা,' বলে চলেছে অরবেন। 'সঠিক কারণটা জানা নেই আমার, কিন্তু এই ভদ্রলোক আপনার মস্ত কোন ক্ষতি করেছে কোন এক সময়। যতদূর জানি মি. রানা আপনার শরীরিক কোন মারাত্মক ক্ষতি করেছে, যার দরুন আপনি নাকি নারী-সংসর্গ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। তার প্রতি আপনার প্রচণ্ড একটা ঘৃণা থাকা স্বাভাবিক। আপনি তার ধ্বংস দেখতে চান, প্রতিশোধ নিতে চান। এখানে উপস্থিত হবার পেছনে সেটাই আপনার আসল কারণ। যাই হোক, আপনার প্রধান দুটো উদ্দেশ্য জানার পর এ-কথা বিশ্বাস করতে আমি রাজী নই যে আমাদের বিপক্ষে গিয়ে নাফাজ মোহাম্মদকে আপনি সাহায্য করতে চাইবেন। নাফাজ মোহাম্মদকে সাহায্য করতে চাওয়া মানে মাসুদ রানাকে সাহায্য করতে চাওয়া, তা আপনার পক্ষে স্রেফ সম্ভবই নয়।'

বোবা বনে গেছে গুস্তাফ তাতাভস্কি। মার্কিন কোটিপতিরাও যে সি. আই. এ-র চেয়ে কম যায় না, ব্যাপারটা তার জানা ছিল না।

'যাই হোক,' আবার শুরু করল অরবেন, 'এই বৈঠকে যা বলা হবে তার প্রতিটি শব্দ নাফাজ মোহাম্মদের কানে পৌঁছাবে, এ-ব্যাপারে কারও মনে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। এখন আর কিছু এসে যায় না তাতে। আমরা এখানে আজ আবার মিলিত হয়েছি একটা মাত্র উদ্দেশ্যে। তা হলো, ভুল যা হবার হয়ে গেছে, এখন সেগুলো যতটা পারা যায় সংশোধনের চেষ্টা করা।

'আমরা জানি মিসাইলবাহী একটা রাশিয়ান ডেস্ট্রয়ার আর রাশিয়ায় তৈরি একটা কিউবান সাবমেরিন দ্রুত এগিয়ে আসছে সাগর কন্যার দিকে। আমরা আরও জানি, একটা ভেনিজুয়েলান ডেস্ট্রয়ারও এই মুহূর্তে ওই একই কাজ করছে। কিন্তু আমি ছাড়া আপনারা আর কেউ যে কথা জানেন না তা হলো, এই দুই রাষ্ট্রের নৌ-বাহিনীর সম্ভাব্য পাঁয়তাড়ার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেয়া হয়ে গেছে।'

হতাশা আর উদ্বেগ মেশানো একটা গুঞ্জন উঠল সভাঘরে।

'আমার পাওয়া তথ্য বলছে স্টেট ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি স্টিফেন কাসলারের সাথে আজ কিছু সময় কাটিয়েছে নাফাজ মোহাম্মদ,' বলে চলেছে অরবেন, 'নাফাজ মোহাম্মদ তাঁকে সাগর কন্যার বিপদ সম্পর্কে অবহিত করে।

তার হাতে তেমন কোন প্রমাণ না থাকায় সেক্রেটারি তার কথা সবটা বিশ্বাস করেননি। কিন্তু যেই মাত্র ওখানে খবর পৌঁছুল যে নাফাজ মোহাম্মদের মেয়ে শিরি ফারহানাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে, তখন আর অবিশ্বাস করার কিছু থাকল না সেক্রেটারির। এর পরিণতি কি দাঁড়িয়েছে জানেন?' একটু বিরতি নিয়ে টেবিল থেকে গ্লাসটা তুলে নিয়ে দু'ঢোক পানি খেল অরবেন। উপস্থিত সবাই উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। মার্কিন নৌ-বাহিনীর একটা ক্রুজার আর একটা ডেস্ট্রয়ার, দুটোই অত্যাধুনিক ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্র নিয়ে গালফ অব মেক্সিকোয় টহল দিতে শুরু করেছে। আরেকটা দুঃসংবাদ, একটা আমেরিকান নিউক্লিয়ার সাবমেরিনও ওই এলাকায় পানির নিচে মাথা ডুবিয়ে রেখে ঘুর ঘুর করছে।' ভেনিজুয়েলান বেলোনির দিকে তাকাল এবার অরবেন, বলল, 'মি. বেলোনি, শুধু আপনার জন্যে বিশেষ একটা দুঃসংবাদ দিচ্ছি। আপনাদের ডেস্ট্রয়ারকে ছায়ার মত অনুসরণ করছে আমেরিকান আরেকটা যুদ্ধ জাহাজ। আপনাদের ডেস্ট্রয়ারের ডিটেকটিং যন্ত্রপাতি এ যুগের তুলনায় হাস্যকর রকম দুর্বল, তাই ওটার অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই টের পাচ্ছে না। আমার পাওয়া সর্বশেষ তথ্যটা হলো, লুসিয়ানা এয়ারবেসে এক স্কোয়াড্রন সুপারসনিক ফাইটার বম্বারকে সদা-সতর্কাবস্থায় রাখা হয়েছে—যে-কোন মুহূর্তে, সিগন্যাল পাওয়া মাত্র, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে গালফ অব মেক্সিকোয় পৌঁছে, টন টন বোমা ফেলে আর রকেট ছুঁড়ে ডুবিয়ে দিতে পারে ওরা যে-কোন যুদ্ধ জাহাজকে।

'পানি ঘোলা করার সুযোগ কাউকে দিতে একেবারেই রাজী নয় আমেরিকানরা। আমার পাওয়া তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, মুখোমুখি সংঘর্ষের জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে আছে ওরা, কেউ যদি ইঁটটি ছোঁড়ে, নির্ঘাত পাটকেলটি খেতে হবে তাকে। ক্রুশ্চেভ আর জন কেনেডীর আমলে যেমনটি হয়েছিল, আংকেল স্যাম চোখের বদলে চোখ নিতে প্রস্তুত। অপরদিকে, সোভিয়েত রাশিয়া এই এলাকায় নিউক্লিয়ার কনফ্রন্টেশনে যাবার ঝুঁকি নিতে রাজী নয়, এটা পরিষ্কার ধরে নেয়া যায়, কেননা, এলাকাটা আমেরিকার একেবারে ঘরের পাশে। শেষ পর্যন্ত হয়তো তুলনামূলক বিচারে কয়েক পেনি মূল্যের কয়েক ব্যারেল তেলের জন্যে কোন পক্ষই বড় ধরনের কোন ঝুঁকি নেবে না, কিন্তু একবার যদি ওয়াশিংটন আর মস্কোর হটলাইন গরম হয়ে ওঠে, ব্যাপারটা জাতীয় মর্যাদা রক্ষার প্রশ্ন হয়ে উঠে বিরোধ মীমাংসার পথটাকে আরও জটিল করে তুলবে, তার ওপর দুনিয়াব্যাপী প্রচার প্রপাগান্ডার কোন সীমা-পরিসীমা তো থাকবেই না। এত কথা বলে আমি কি বোঝাতে চাইছি তা আশা করি আপনারা সবাই অনুধাবন করতে পারছেন। হ্যাঁ, ব্যাপারটা যখন অতদূর গড়াবে তখন না চাইলেও এর সাথে সবাই আমরা জড়িয়ে পড়ব। আমাদের কান ধরে টান দেবে স্টেট ডিপার্টমেন্ট, সি.আই.এ, কংগ্রেস, পেন্টাগন। পরিণতি? আমরা সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। কেউ আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে না। তাই, আপনাদেরকে আমি পরামর্শ দিচ্ছি, মি. গুস্তাফ তাতাভস্কি এবং মি. বেলোনি, ওই হটলাইনে আগুন ধরার আগেই যার যার যোদ্ধা মোরগাকে ঘরে ডেকে নিন। শুধু এই একটা উপায়েই আমরা আমাদের নিজেদের মান-সম্মান আর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারি। আমি আপনাদের দু'জনের

কাউকেই কোন দোষ দিচ্ছি না। এ-প্রসঙ্গে আরও একটা কথা আমি জানাতে চাই, তা হলো, মি. গুস্তাফ তাতাভস্কিই আমাকে নাফাজ মোহাম্মদের বিরুদ্ধে হেকটরকে লেলিয়ে দেবার প্ররোচনা দেন। অবশ্য, তাতে মি. গুস্তাফ তাতাভস্কিকে একতরফাভাবে দায়ী করতে পারি না আমরা। কেননা, হেকটরকে আমরা সবাই মিলেই নির্বাচন করেছিলাম। হেকটরকে নাফাজ মোহাম্মদের বিরুদ্ধে লাগাতে পারলে সে মাসুদ রানার বিরুদ্ধে লাগারও একটা সুযোগ পাবে, এই উদ্দেশ্যেই মি. গুস্তাফ আমার কাছে হেকটরের নামটা প্রস্তাব করেছিলেন, আমিও বোকার মত প্রস্তাবটা আপনাদের কাছে উত্থাপন করেছিলাম। তবে, এ-কথা ঠিক, আমরা কেউ ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করিনি, হেকটর তার সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে আমাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন করে তুলবে। যাই হোক, আপনারা দু'জন একটা ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ করবেন না—সাগর কন্যার দিকে আপনাদের যুদ্ধ-জাহাজগুলো যদি এগোতেই থাকে, মার্কিন সরকার সেগুলোকে সাগরের বুক থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেবে। কথাটা বিশ্বাস করুন।'

তেল ব্যবসায়ীরা বুনো, হিংস্র পশু—নাফাজ মোহাম্মদের সেই কথাটার মধ্যে কোন অতিরঞ্জন ছিল না, বোঝা গেল এই সমূহ বিপদের মধ্যেও ভেনিজুয়েলান বেলোনিকে হাসতে দেখে। বেশ উঁচু গলায় বলল সে, 'আমার দেশের কোন ক্ষতি হোক তা আমি চাইতে পারি না,' কে.জি.বি. অফিসার গুস্তাফ তাতাভস্কির দিকে তাকাল সে, 'আমরা কি আমাদের যোদ্ধা মোরগগুলোকে ঘরে ডেকে নেব, মি. গুস্তাফ?'

বিশালদেহী গুস্তাফ তাতাভস্কি তার প্রকাণ্ড মাথাটা নাড়ল। বলল, 'অবশ্যই। এতে লজ্জার কিছু নেই। এখান থেকে সোজা রাশিয়ায় ফিরে যাচ্ছি আমি, গোটা পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুখ রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'যাক,' স্বস্তির একটা হাঁফ ছেড়ে বলল আরবের আমীর, 'বিপদ তাহলে কাটিয়ে ওঠা গেল।'

'বিপদ কিছুটা কাটিয়ে ওঠা গেল,' বলল অরবেন, 'সবটা নয়। আজ বিকেলে সাংঘাতিক ভীতিকর আরেকটা ঘটনা ঘটেছে। মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে খবরটা কানে এসেছে আমার। বিষয়টা আজ রাতে সারা দেশ জুড়ে হৈ চৈ সৃষ্টি করতে যাচ্ছে। ঘটনাটার সাথে আমরা জড়িত নই বটে, কিন্তু জড়িয়ে পড়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। নিটলে রোয়ান আর্মারী লুট করা হয়েছে আজ বিকেলে। ওটা একটা টি.এন.ডব্লিউ. আর্মারী। টি.এন.ডব্লিউ.-মানে, ট্যাকটিক্যাল নিউক্লিয়ার উইপেন। সোজা কথায়, অ্যাটম বোমা। ছোট জিনিস, কিন্তু অ্যাটম বোমা। ওই জিনিস লুট করা হয়েছে ওখান থেকে। দুটো।'

'গড অ্যাবাভ!' হন্ডুরাসের ব্যবসায়ী আঁতকে উঠলেন। টেবিল ঘিরে বসে থাকা বাকি সবাই হতভম্ব হয়ে গেছে। 'হেকটর?'

'কোন প্রমাণ নেই,' বলল অরবেন, 'কিন্তু প্রাণ বাজি রেখে বলতে পারি এ কাজ তার না হয়ে যায় না। আর কে হতে পারে?'

'মি. গুস্তাফকে কোন রকম অসম্মান করতে চাই না, তবু কথাটা বলতে চাই, রাশিয়ানরা এই অ্যাটম বোমার প্রোটোটাইপ খুঁজছিল না তো?' বলল ঈগলটন।

গুরু গম্ভীর কণ্ঠে বিশালদেহী গুস্তাফ তাতাভস্কি বলল, 'ওই ধরনের জিনিস রাশিয়ার কত আছে তার লিস্ট দিতে গেলে একটা নিউজপ্রিন্ট মিল একমাসে যত কাগজ তৈরি করে তার সব লাগবে। ওয়ারস আর ন্যাটো চুক্তির অধীনে যত দেশ আছে সবগুলোর বর্ডারে হাজার হাজার মোতায়েন রয়েছে ওই জিনিস। অনেকের ধারণা, আপনাদের চেয়ে মান এবং গুণগত দিক থেকে অনেক বেশি উন্নত ওগুলো।'

'কথাটা আমি সমর্থন করি,' বলল অরবেন। 'মি. গুস্তাফ কিছু বাড়িয়ে বলছেন না।'

'তার মানে, হেকটরই? লোকটা উন্মাদ হয়ে গেছে?'

'কিন্তু এতটা উন্মাদ কি কারও পক্ষে হওয়া সম্ভব?' জানতে চাইল একজন আমেরিকান তেল ব্যবসায়ী। 'সাগর কন্যাকে ধ্বংস করার জন্যে নিউক্লিয়ার ডিভাইস? মাই গড!'

'কতটা শক্তিশালী এই বোমা?' জানতে চাইল বেলোনি।

'আমি জানি না,' বলল অরবেন। 'পেন্টাগনে ফোন করেছিলাম, একজন অফিসারের কাছে। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও এ ধরনের হাইলি ক্লাসিফাইড ইনফরমেশন বাইরে প্রকাশ করতে রাজী নয় সে। আমি শুধু জানি, জিনিসটা মাটিতে বা পানিতে মাইন হিসেবে ব্যবহার করা যায়, অথবা একটা বম্বারের বোমা হিসেবেও ব্যবহার করা সম্ভব। বম্বারের সাহায্য নিতে পারছে না হেকটর। কারণ, শুধুমাত্র অল্প কয়েক ধরনের বিশেষ সুপারসনিক ফাইটার-বম্বারই এই বোমা ব্যবহার করতে পারে। সেগুলো এখন সাংঘাতিক কড়া গার্ডের মধ্যে রাখা হয়েছে, হেকটরের সাধ্য নেই চুরি করে আনে। যদিও, আমার জানা মতে ওই ধরনের বিশেষ ফাইটার-বম্বার চালাতে পারে এমন লোকের সাথেও বন্ধুত্ব আছে হেকটরের।'

'এখন তাহলে কি ঘটতে যাচ্ছে?' জানতে চাইল বেলোনি। মুখ শুকিয়ে ছুঁচালো হয়ে গেছে তার। 'হেকটরকে বাধা দেবার উপায় কি?'

'হেকটর এখন সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে, আমাদের সবার আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। তাকে বাধা দেবার সাধ্য কারও নেই। কেউ যদি তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, সে যেই হোক, নির্দয়ভাবে তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে সে। তার হিংস্রতা এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা জানি আমি। হেকটর এখন অদম্য। তাকে থামানো খোদ শয়তানের পক্ষেও আর সম্ভব নয়।'

'তাহলে?'

'আমরা বরং একজন জ্যোতিষের কাছে গিয়ে ভবিষ্যৎ জানার চেষ্টা করতে পারি,' বলল রুবার্ট অরবেন। 'যত দূর বুঝতে পারছি, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ রোধ করে মানবজাতির কল্যাণ করতে গিয়ে আমরা বরং উল্টোটা করে বসেছি। সবকিছু ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেয়া ছাড়া আমাদের এখন আর করার কিছু নেই।'

সী-উইচ।

লেক তাহো বৈঠকের মূল বক্তব্য শোনেনি হেকটর, শুনলে একটা অট্টহাসি

বেরিয়ে আসত তার গলা থেকে। তারপর অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠত সে। একটা কাজ করতে দেয়া হয়েছে তাকে, সেই কাজটা নিখুঁতভাবে শেষ করাই তার দায়িত্ব, তাই করছেও সে—তারপরও তার বিরুদ্ধে এত অভিযোগ কিসের? সত্যিকার একজন কাজের মানুষ কি তার সমস্ত যোগ্যতা দিয়ে, সমস্ত শক্তি দিয়ে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে না?

কিউবা আর ভেনিজুয়েলা থেকে তাকে সাহায্য করার জন্যে যে যুদ্ধ জাহাজগুলো রওনা দিয়েছিল সেগুলোকে ফিরিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এ-খবর পায়নি হেকটর। পেলেও খুব একটা নিরাশ হত না সে। কারণ, এই যুদ্ধ জাহাজগুলোকে আসলে সে কোন কাজে লাগাবার কথা ভুলেও ঠাঁই দেয়নি মনে। প্রথম থেকেই তার ইচ্ছা ছিল এই যুদ্ধ জাহাজগুলোকে স্মোকস্ক্রিন হিসেবে ব্যবহার করবে সে। এখন সেগুলোকে প্রত্যাহার করে নেয়ায় তার কাজে কোন বাধা সৃষ্টি হয়নি। নাফাজ মোহাম্মদের ওপর হেকটরের ঘৃণাটা নিতান্তই ব্যক্তিগত, তাই সে কারও প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়াই নিজের হাতে তাঁর সর্বনাশ করতে চায়। তাতে যে আলাদা একটা সুখ আছে সেটা থেকে নিজেকে সে বঞ্চিত করতে রাজী নয়।

চিত্তে কোন রকম উদ্বেগ নেই হেকটরের। সম্পূর্ণ সন্তুষ্টি বোধ করছে সে। জানানো হয়েছে তাকে, সাগর কন্যা এখন তাদের দখলে চলে এসেছে। সকালটা হতে যা দেরি, ব্যক্তিগতভাবে একেবারে তার নিজের হাতের মুঠোয় চলে আসবে নাফাজ মোহাম্মদের শখের সাগর কন্যা। ওদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা আর রাডারের কথা জানা আছে তার। ইউরেনাস, ইলেকট্রিক পুল-পুশ, ক্যাপ্টেন গেস্টনের পরিচালনায় আর একটু অন্ধকার হলেই প্রাথমিক আক্রমণের জন্যে রওনা হয়ে যাবে। প্রকৃতিও তার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে সহযোগিতার হাত। এই কিছুক্ষণ আগে কলো মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে আধখানা চাঁদসহ গোটা আকাশ, থামার কোন লক্ষণ ছাড়াই মুষলধারে শুরু হয়ে গেছে বৃষ্টি। সাগর এলাকা স্থলভূমির মত কখনোই গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায় না, কিন্তু মেঘ-বৃষ্টি দেখা দেয়ায় প্রয়োজনীয় অন্ধকার আজ পাওয়া যাবে বলে আশা করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

রেডিওরুম থেকে একটা মেসেজ নিয়ে এসে দেয়া হলো হেকটরকে। দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিল সে মেসেজটার ওপর। ক্রাডল থেকে ফোনের রিসিভার তুলে যোগাযোগ করল হেলিপ্যাডের সাথে। পাইলটের সাথে কথা বলছে সে। 'তুমি রেডি, এমারসন?'

'ইয়েস, স্যার।'

'এখুনি,' সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দিল হেকটর। হাত বাড়িয়ে রিয়োস্টাট সুইচটা খানিকটা ঘোরাল সে। আবছা একটা আলোর আভায় আলোকিত হয়ে উঠল হেলিপ্যাড, পাইলট এমারসনের জন্যে যথেষ্ট, এর চেয়ে কম আলোতেও টেক অফ করতে পারবে সে। আকাশে উঠে একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করল হেলিকপ্টারটা, ল্যান্ডিং লাইট অন করে ধীর, সাবলীল ভঙ্গিতে শান্ত সাগরের বুকে নামছে, স্থির হয়ে দাঁড়ানো সী-উইচের কাছ থেকে একশো গজ দূরে।

রাডার রুমের সাথে যোগাযোগ করছে হেকটর। 'স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ ওটাকে?'

'ইয়েস, স্যার। আমাদের রাডারে ইন্স্ট্রুমেন্ট অ্যাপ্রোচের আকারে ধরা যাচ্ছে ওটাকে।'

'তিন মাইল দূরে থাকতে জানাবে আমাকে,' বলল হেকটর।

এক মিনিট উতরে যাবার আগেই মেসেজটা দিল তাকে অপারেটর। রিয়োস্টাট সুইচটা এবার পুরো ঘুরিয়ে দিল হেকটর, উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল সাথে সাথে হেলিপ্যাড।

এক মিনিট পর বৃষ্টির ভেতর দিয়ে ল্যান্ডিং লাইট অন করে উত্তর দিক থেকে ছুটে আসতে দেখা গেল আর একটা হেলিকপ্টারকে। আরও ষাট সেকেন্ড পর সী-উইচের হেলিপ্যাডে একটা হালকা পোকার মত আলতোভাবে ল্যান্ড করল সেটা। বিশেষ ধরনের কার্গো বহন করছে বলে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করছে পাইলট। সাথে সাথে ফুয়েলিং লাইন সংযুক্ত করে দেয়া হলো। দরজা খুলে যাচ্ছে। তিনজন লোক নামছে 'কপ্টার থেকে। এদের মধ্যে রয়েছে সেই তিনজন ভুয়া সামরিক অফিসার—কর্নেল ফারগুসন, লেফটেন্যান্ট কর্নেল সুইংস্ এবং মেজর ডুরান্ড। এরাই নিটলে রোয়ান আর্মারী লুট করে নিয়ে এসেছে হেকটরের জন্যে উপহার। বড় সাইজের দুই হাতলওয়ালা দুটো সুটকেস ধরাধরি করে নামাতে সাহায্য করছে ওরা। বয়ে নিয়ে যাবার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে, অস্বাভাবিক ভারী ওগুলো। ক্রুদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে হেকটর। কেসগুলো কোথায় আশ্রয় পাবে জায়গাটা দেখিয়ে দিল তাদেরকে সে।

দশ মিনিটের মধ্যে আবার আকাশে উঠল হেলিকপ্টারটা, ফিরে যাচ্ছে যেখান থেকে এসেছে, সেই মেইনল্যান্ডে। এর পাঁচ মিনিট পর সী-উইচের নিজস্ব হেলিকপ্টারটা ফিরে এল হেলিপ্যাডে। সাথে সাথে সব আলো নিভিয়ে দেয়া হলো হেলিপ্যাডের।

ছয়

সাগর কন্যা দখল করেও মনে শান্তি নেই কন্ডির। চারজন মাত্র সহকারী নিয়ে এত বড় একটা প্রকাণ্ড ড্রিলিং রিগের কত দিক সামলাবে সে? উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তায় মনের ভেতরটা ছটফট করছে তার। একই অবস্থা হয়েছে তার সহকারীদের। চাপা একটা অস্থিরতা অনুভব করছে সবাই। সাগর কন্যা নিজেদের দখলে থাকলেও, এই থাকার কোন মানে নেই, স্পষ্ট বুঝতে পারছে। যে-কোন মুহূর্তে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টে যেতে পারে। হেকটর বা কন্ডি, দু'জনের কেউই জানত না যে জিউসেপ বারজেন তার খুনে-গুণ্ডা বাহিনী নিয়ে সাগর কন্যায় আছে। জানলে মাত্র এই ক'টা লোক দিয়ে কন্ডিকে পাঠাত না সে, কন্ডিও আসতে রাজী হত না।

এক এবং দু'নম্বর কোয়ার্টারের মাস্টার কী পকেটে রয়েছে কন্ডির। ড্রিলিং ক্রুরা রয়েছে এক নম্বরে, দু'নম্বরে রয়েছে বারজেন আর তার লোকেরা। কন্ডি জানে, দুই কোয়ার্টারেই অসংখ্য জানালা দরজা রয়েছে, অথচ সবগুলোর ওপর নজর রাখার

মত যথেষ্ট লোক নেই তার হাতে। তাই একমাত্র উপায়টা গ্রহণ করতে হয়েছে তাকে। এক্সটারনাল লাউড হেইলারের মাধ্যমে ঘোষণা করে দিয়েছে সে, প্ল্যাটফর্মে বেরুনো চলবে না কারও। কেউ যদি এই আদেশ অমান্য করে বের হয়, দেখামাত্র গুলি করা হবে তাকে। ঘোষণাটা প্রচার করে দিয়ে দু'নম্বর কোয়ার্টারের চারদিকে সারাক্ষণ টহল দেবার জন্যে দু'জন লোককে পাঠিয়ে দিয়েছে সে। নিরস্ত্র ড্রিলিং রিগ ক্রুদের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করার কোন কারণ নেই তার। ওদের ওপর নজর না রাখলেও চলবে। বাকি দু'জন সহকারীকে প্ল্যাটফর্মের ওপর নজর রাখার জন্যে পাঠিয়েছে সে। নাফাজ মোহাম্মদ, তার দুই সিসমোলজিস্ট বিজ্ঞানী এবং লেডী ফারহানা, এদের ব্যাপারেও তেমন কোন মাথাব্যথা নেই কভির। কারণ, এদেরকে সার্চ করে দেখা হয়েছে, কারও কাছে কোন আগ্নেয়াস্ত্র নেই। থাকার মধ্যে আছে শুধু, মুখের ভাব দেখে বোঝা যায়, তার ওপর প্রচণ্ড ঘৃণা। কিন্তু এককভাবে ঘৃণা জিনিসটার ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা নেই। ডাক্তার কিপলিঙের ব্যাপারেও উদ্বিগ্ন নয় কভি। সত্তর বছরের বুড়ো, দু'একটা ডাক্তারী ছুরি-কাঁটা সাথে থাকলেও, কিই বা করতে পারবে সে। তবু, সাবধানের মার নেই ভেবে, প্ল্যাটফর্মে টহলদানরত সহকারীদেরকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছে, অন্তত তাদের একজন যেন একটা চোখ খোলা রাখে নাফাজ মোহাম্মদের স্যুইট, ল্যাবরেটরি আর সিক-বে-র তিন দরজার দিকে। স্যুইট, ল্যাব আর সিক-বে, একটা থেকে আরেকটায় যাবার একাধিক দরজা আছে।

দেখামাত্র গুলি করা হবে, লাউড হেইলারের এই ঘোষণাটা ওই তিন জায়গায় যারা রয়েছে—নাফাজ মোহাম্মদ, ডাক্তার কিপলিং, রানা, আনিস এবং শিরি ফারহানা—এদের কারও কানে গিয়ে পৌঁছায়নি। যে-কোন অয়েল রিগে নানা ধরনের কান ঝালাপালা করা যান্ত্রিক আওয়াজ আর লোকজনের চড়া গলার চেঁচামেচি হয়, তাই এই তিনটে কোয়ার্টারকে সম্পূর্ণ সাউন্ড প্রুফ করে তৈরি করেছেন নাফাজ মোহাম্মদ।

ল্যাবরেটরির ভেতর ছোট্ট একটা কেবিন। সাগর কন্যার লে-আউটের উপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে রানা। ঝাড়া পাঁচ মিনিট ধরে কয়েকবার খুঁটিয়ে দেখল ও, মনে এখন আর কোন সংশয় নেই ওর—চোখ বেঁধে দিলেও কোথাও কিছুর সাথে ধাক্কা না খেয়ে সাগর কন্যার যে-কোন জায়গা থেকে ঘুরে ফিরে আসতে পারবে। লে-আউট থেকে চোখ তুলছে রানা, ঠিক সেই সময় গুলিবর্ষণ হলো। কিন্তু সাউন্ড প্রুফ দরজার জন্যে কোন শব্দ পৌঁছুল না ওর কানে। একটা দেরাজে প্ল্যানটা রেখে দিয়ে চুরুট ধরাল ও। কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে ল্যাবরেটরির একটা হাতলহীন চেয়ারে বসতে যাবে, এই সময় দরজা খুলে গেল। কান্নার আওয়াজ ঢুকল রানার কানে। ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল ও, সেই মুহূর্তে ওর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল শিরি ফারহানা।

হতভম্ব হয়ে গেছে রানা।

'কেন! কেন! কেন আপনি ওখানে ছিলেন না!' রানার বুকে কপাল ঠুকছে শিরি, ফোঁপাচ্ছে সে। 'আপনি ওদেরকে বাধা দিতে পারতেন। আপনি ওকে বাঁচাতে পারতেন...'

ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা রানার। সময় নষ্ট না করে সব কথা জানা দরকার, তাই রূঢ় ব্যবহার করতে হলো শিরির সাথে। দু'হাত দিয়ে ধরে নিজের বুকের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়ে শিরিকে একটা চেয়ারে জোর করে বসিয়ে দিল ও। পিছিয়ে গেল এক পা। 'শান্ত হও,' অবিচলিত গলায় বলল রানা। 'কি হয়েছে সংক্ষেপে বলো।'

বোকার মত কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল শিরি রানার মুখের দিকে। এখন আর ফোঁপাচ্ছে না সে। শুধু দুই চোখ থেকে দুটো পানির ধারা গড়িয়ে নামছে গাল বেয়ে।

'কথা বলো,' আবার বলল রানা।

'গুলি করেছে ওরা আনিসকে...'

'শব্দ হলো না, গুলি করল কখন?'

'সাউন্ড প্রুফ দরজা, তাই...'

'কোথায় লেগেছে গুলি?'

'বু...'

পুরো শব্দটা শোনার আগেই আবার ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। বুকে গুলি খেয়েছে আনিস। ধাক্কাটা দুই সেকেন্ডের মধ্যে সামলে নিল রানা। চেহারা থেকে খসে পড়েছে সমস্ত ভাব। উদ্বিগ্ন বা আতঙ্কিত দেখাচ্ছে না ওকে, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বলেও মনে হচ্ছে না। শুধু চোখ দুটো শ্বাপদের মত জ্বলছে ওর।

'কতটুকু জখম হয়েছে? ডাক্তার কি বলছেন?'

আবার ফুঁপিয়ে উঠল শিরি। 'মাসুদ ভাই, ও বাঁচবে না...'

'গুলি করল কেন ওরা?' চাপা কণ্ঠস্বর, কিন্তু গম গম করে উঠল।

আবার কান্না থেমে গেল শিরির। 'ওয়ার্নিংটা শুনতে পাইনি আমরা। দু'জনে প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে এসেছিলাম আমরা। ড্রিলিং ডেরিকের কাছে পৌঁছতেই...'

'কিসের ওয়ার্নিং?'

'কন্ডি লাউড স্পীকারে ঘোষণা করেছিল, মিনিট পাঁচ-সাত আগে, প্ল্যাটফর্মে কাউকে দেখামাত্র গুলি করা হবে। কিন্তু বাবার স্যুইট থেকে তা আমরা কেউ শুনতে পাইনি। বৃষ্টি থেমে গেছে দেখে আমি আর আনিস...'

'আনিস এখন কোথায়?'

'সিক বে-তে। ডা. কিপলিং অপারেশন করছেন। আনিস আপনাকে খবর দিতে বলল...'

'জ্ঞান আছে ওর?' উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে দরজার দিকে এগোল রানা। লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে রানার পিছু নিল শিরি।

সিক বে।

নিঃশব্দ পায়ে ভেতরে ঢুকে অপারেশন থিয়েটারের সামনে, ডাক্তার কিপলিঙের পাশে এসে দাঁড়াল রানা। টেবিলের ওপর শুয়ে আছে আনিস, ঘাড়-মাথা কোমর পর্যন্ত রক্তে ভাসছে সে। চোখ দুটো বন্ধ। ওর ঘাড়ে এরই মধ্যে ব্যান্ডেজ বাঁধার কাজ শেষ করেছেন ডাক্তার কিপলিং। এখন ওর বুকের ওপর কাজ করছেন।

একটা চেয়ারে বসে রয়েছেন নাফাজ মোহাম্মদ। প্রচণ্ড রাগে যে কোন মুহূর্তে

বিস্ফোরণ ঘটার মত চেহারা হয়েছে তাঁর মুখের। শিরদাঁড়া খাড়া, সোজা তাকিয়ে আছেন সামনের সাদা দেয়ালটার দিকে। সিক বে-র ভেতর, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে কন্ডি। ভাবলেশহীন চেহারা, যেন কিছুতেই কিছু এসে যায় না তার। ওদের দু'জনের দিকেই ঘাড় ফিরিয়ে একবার করে তাকাল রানা। ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে শিরি ফারহানা, সাহস করে আনিসের সামনে আসতে পারছে না সে। কান্নার আওয়াজ চাপার জন্যে নিজের মুখে হাত চাপা দিয়ে রেখেছে ও।

মৃদু গলায় ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কি রকম বুঝছেন, ডাক্তার?'

রানার গলা কানে যেতে না যেতে চোখ মেলে তাকাল আনিস। 'আমি সেরে উঠব, মাসুদ ভাই,' দুর্বল, কিন্তু স্পষ্ট কণ্ঠে বলল সে। একটু হেসে অভয় দিতে চাইছে রানাকে। কিন্তু যন্ত্রণায় আবার বিকৃত হয়ে উঠল চেহারা।

'অবশ্যই তোমাকে সেরে উঠতে হবে, আনিস,' দৃঢ়তার সাথে বলল রানা। হঠাৎ ঝুঁকে পড়ল ও, আনিসের রক্ত ভেজা কানের কাছে ঠোঁট নামিয়ে নিয়ে গিয়ে নিচু গলায় বলল, কিন্তু শুনতে পেল সবাই, 'অন্তত শিরির জন্যে তো বটে,' তারপর আরও খাদে নেমে গেল রানার গলা, যাতে শুনতে না পায় কেউ, 'তাছাড়া, আনিস, আজ তোমাকে জানাচ্ছি, কোন প্রাইভেট ফার্মের সেবা করছ না তুমি, সরাসরি দেশের সেবা করছ। অনেক কাজ বাকি আমাদের, সেগুলো শেষ করার জন্যে অবশ্যই তোমাকে সেরে উঠতে হবে।'

সমস্ত ব্যথা-বেদনা শরীর থেকে কোথায় চলে গেল আনিসের। উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চেহারা। রানার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে আছে সে, রানা যেন সম্মোহিত করছে তাকে।

এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আনিসকে টপ্ সিক্রেট একটা তথ্য জানিয়ে দেবার পেছনে দুটো কারণ রয়েছে রানার। এক, এতদিন ধরে দেশের সেবা করছে জানতে পারলে প্রাণশক্তি বেড়ে যাবে ওর, মৃত্যুর সাথে লড়াই করার অদম্য একটা বাসনা জেগে উঠবে ওর মনের ভেতর। দুই, জখমের নমুনা দেখে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে আনিস নাও বাঁচতে পারে—মৃত্যুর আগে প্রত্যেক এজেন্টের জানার অধিকার আছে, আসলে মাতৃভূতির সেবা করে গেল সে।

উত্তর দেবার জন্যে অপেক্ষা করছেন ডাক্তার কিপলিং। রানা সিধে হয়ে দাঁড়াতেই বললেন তিনি, 'দুটো গুলি খেয়েছে ও। একটা ঘাড়ে। একচুলের জন্যে আর্টারী ছুঁতে পারেনি, সোজা বেরিয়ে গেছে—ওটা নিয়ে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। বুকের আঘাতটা সিরিয়াস। ফেটাল নয়, তবে সিরিয়াস। বাঁ দিকের ফুসফুসে আঘাত করেছে বুলেট, কোন সন্দেহ নেই এ-ব্যাপারে, তবে ইন্টারনাল ব্লীডিং এত কম যে ধারণা করছি ফুসফুসের গায়ে আঁচড় কেটেছে মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। সমস্যাটা অন্যখানে, আমার সন্দেহ হচ্ছে মেরুদণ্ডের ঠিক পেছনে থেমে গেছে বুলেট।'

'শিরদাঁড়ার কোন ক্ষতি হয়নি তো?'

'আপনি বললে এখুনি উঠে দাঁড়াতে পারি আমি, মাসুদ ভাই,' যন্ত্রণায় নীল হয়ে আছে আনিসের মুখ। চোখ খুলেই বুজে ফেলল সে। আবার হাসতে চেষ্টা করছে, বলল, 'বুলেটটার ব্যাপারে চিন্তা করবেন না। এই জায়গার কাছাকাছি…'

ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল রানা, 'জানি। বছরখানেক ধরে আরেকটা বুলেট রয়েছে ওখানে। এবারেরটার সাথে ওটাকেও এই সুযোগে বের করে ফেলতে হবে।'

'এবং তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব,' বললেন ডাক্তার কিপলিং। 'কাজটা আমিও করতে পারতাম, কিন্তু আমাকে সাহায্য করার জন্যে এখানে কোন এক্স-রে মেশিন নেই। একটু পর থেকেই ওকে রক্ত দিতে শুরু করব আমি।'

'অপারেশনের জন্যে হাসপাতালে পাঠানো দরকার ওকে?'

'অবশ্যই! এই মুহূর্তে!' বললেন ডাক্তার।

ঘাড় ফিরিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ানো কড্ডির দিকে তাকাল রানা। 'শুনলে তো?'

'না।'

'কিন্তু দোষটা শমসেরের নয়,' বলল রানা। 'তোমার ওয়ার্নিং ও শুনতে পায়নি।'

'কপাল মন্দ ওর,' বলল কড্ডি। 'এর বেশি কিছু বলার নেই আমার।' একটু থেমে আবার বলল, 'আপনারা যদি ভেবে থাকেন ওকে আমি 'কপ্টারে তুলে তীরে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করব—ভুলে যান। তা করলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ইউ. এস. মেরিনের একটা ব্যাটালিয়ান পৌঁছে যাবে এখানে। নিজের কবর খোঁড়ার কোনও ইচ্ছা আপাতত নেই আমার।'

'ও মারা গেলে তোমাকে দায়ী করা হবে,' শান্ত কিন্তু আশ্চর্য দৃঢ়তার সাথে বলল রানা।

'মি. সাদ্দাম,' রানাকে উদ্দেশ্য করে গম্ভীর ভঙ্গিতে জানাল কড্ডি, 'একদিন না একদিন সবাইকে মরতে হয়।' সিক বে থেকে বেরিয়ে গেল সে। যাবার সময় নিজের পেছনে দড়াম করে বন্ধ করে দিয়ে গেল দরজাটা।

মাথা নিচু করে পাঁচ সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। তারপর মুখ তুলে তাকাল নাফাজ মোহাম্মদের দিকে। 'আপনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ করতে পারেন, মি. নাফাজ।'

'বলুন!'

'আপনার স্যুইটের সাথে তো রেডিওরুমের সরাসরি কন্ট্যাক্ট আছে, তাই না? ইচ্ছা করলে আপনি কি রেডিওরুমের সব কথা শুনতে পারেন?'

'পারি। দুটো বোতাম টিপলেই দুই তরফের যে-কোন কথাবার্তা কানে আসবে আমার—টেলিফোন, এয়ারফোন, ওয়ালরিসিভার যেটাই ব্যবহার করুক না কেন ওরা।'

'এখুনি গিয়ে এই শোনার দায়িত্বটা নিন আপনি, প্লীজ। এক সেকেন্ডের জন্যেও অন্য কোনদিকে কান দেবেন না। ওদের প্রতিটি আলাপের প্রতিটি শব্দ শুনতে হবে।' টেবিলে শায়িত আনিসের দিকে তাকাল রানা। 'আধঘণ্টার মধ্যে হেলিকপ্টারে তুলে হাসপাতালে পাঠাতে চাই ওকে আমি।'

'কি বলছেন আপনি?' বিমূঢ় দেখাচ্ছে নাফাজ মোহাম্মদকে। 'কিভাবে তা সম্ভব?'

'এখনও আমি নিজেই তা জানি না,' বলল রানা। 'শুধু জানি, পাঠাতে হবে। পাঠানোও হবে।'

ভদ্রলোক পাগল নাকি? কয়েক সেকেন্ড স্থির দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন নাফাজ মোহাম্মদ। তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন সিক বে থেকে। পকেট থেকে সরু একটা পেন্সিল-টর্চ বের করল রানা। চিন্তিতভাবে কয়েক সেকেন্ড দেখল সেটাকে। তারপর বারবার বোতামে চাপ দিয়ে টর্চটা জ্বালছে আর সাথে সাথে নিভিয়ে ফেলছে। ভঙ্গিটা অলস, যেন সময় নষ্ট করার জন্যে কাজ আর খুঁজে পায়নি কিছু। মুখের রঙ ম্লান, রক্তশূন্য দেখাচ্ছে ওর। টর্চ ধরা হাতটা কাঁপছে একটু একটু। রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নিজেকে ইতিমধ্যে সামলে নিয়েছে শিরি ফারহানা। আনিসকে স্পষ্টভাবে কথা বলতে শুনে খানিকটা দুশ্চিন্তামুক্ত হয়েছে সে, বুঝতে পেরেছে বেঁচে থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষাই ওকে সম্ভবত এ-যাত্রা রক্ষা করবে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আনিস রানার দিকে। তাই দেখে দু'পা এগিয়ে রানার পাশে চলে এল শিরি, সে-ও তাকিয়ে আছে রানার দিকে। পেন্সিল-টর্চ ধরা রানার হাতটা কাঁপছে লক্ষ করে এক ইঞ্চির দশভাগের একভাগ পরিমাণ কুঁচকে উঠল তার ভুরু। কয়েক সেকেন্ড পর হতাশার ছায়া পড়ল তার চেহারায়। তারপর ধীরে ধীরে তাচ্ছিল্যের একটা ভাব ফুটে উঠল দুই চোখে। এই ভীতুর ডিম লোকটাকে বুদ্ধিমান আর দুঃসাহসী বলে শ্রদ্ধা করে আনিস?—ভাবছে শিরি।—একটাও গুলি না খেয়ে যে-লোক ভয়ে কাঁপে, তার কাছ থেকে কিইবা থাকতে পারে আশা করার?

'তোমার পিস্তল?' জানতে চাইল রানা।

'আমাকে তুলে আনার জন্যে লোক ডাকতে চলে গেল ওরা,' বলল আনিস, 'সেই ফাঁকে হামাগুড়ি দিয়ে নিজেকে যতটা সম্ভব কিনারার কাছে নিয়ে গেলাম। বেল্টের ক্লিপ খুলে ছুঁড়ে পানিতে ফেলে দিয়েছি সব।'

'গুড বয়। তার মানে এখনও আমাদের পরিচয় ধোয়া তুলসী পাতা।' যেন এতক্ষণে নিজের হাতের কাঁপুনিটা লক্ষ করল রানা। পেন্সিল টর্চটা অফ করে দিয়ে দুটো হাতই ট্রাউজারের দুই পকেটে লুকিয়ে ফেলল। প্রশ্ন করল আনিসকে, 'কে গুলি করেছে তোমাকে?'

'একজন নয়, দু'জন,' বলল আনিস।

'চিনতে পেরেছ?'

মাথা ঝাঁকাল আনিস। তারপর বলল, 'ওদের সাথে এর আগে ঝগড়া হয়েছে শিরির।'

'নাম?'

'কোরাল আর লিকন।'

'শিরির সাথে ঝগড়া হলো কেন?'

ডাক্তার কিপলিং আবেদনের ভঙ্গিতে তাকালেন রানার দিকে। তাই দেখে কি যেন বলতে যাচ্ছিল আনিস, কিন্তু তাকে ইশারায় চুপ করতে বলে পাশে দাঁড়ানো শিরি ফারহানার দিকে তাকাল রানা।

'তখন ওয়ার্নিংটা ঘোষণা করা হয়নি,' বলল শিরি। 'আমি আর আনিস

প্ল্যাটফর্মে বেরিয়েছি, ওরা আমাদেরকে বাধা দিল। বলল, দু'জন একসাথে ঘোরাঘুরি করা চলবে না। এই নিয়ে তর্ক হয় আমার সাথে ওদের।'

'কোরাল আর লিকন,' বিড় বিড় করে নাম দুটো পুনরাবৃত্তি করল রানা। তারপর কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে গেল সিক বে থেকে।

বিষাদের ছায়া ফুটে উঠল শিরি ফারহানার চেহারায়। একটু তিক্ত গলায় বলল, 'তোমার বস্ খুব সাহসী লোক—এই ধরনের কি যেন একটা কথা বলেছিলে না তুমি আমাকে?'

'পুট আউট দা লাইট অ্যান্ড দেন পুট আউট দা লাইট,' ফিস ফিস করে বলল আনিস।

'কি বললে?'

দুটো ইঞ্জেকশন সমস্ত ব্যথা থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে আনিসকে। হাসছে ও। 'আমি বলিনি, বলেছে ওথেলো নামে এক লোক। কোটিপতির মেয়েদের নিয়ে এই এক সমস্যা। অশিক্ষিত।'

মুখটা ভার করতে গিয়েও ক্ষান্ত হলো শিরি। 'ওরে লক্ষ্মী শয়তান, বুঝতে পেরেছ এখন তোমার ওপর রাগ করতে পারব না, তাই এই সুযোগে গাল-মন্দ যত পারো করে নিতে চাও, বুঝেছি! করো। কিছু বলব না আমি। কিন্তু কেমন যেন রহস্য করে বললে তুমি কথাটা। মানেটা কি? বলবে?'

খুক করে কেশে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন ডাক্তার কিপলিং।

'গলায় বুলেট আটকে নেই, সুতরাং কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছে না আমার, ডা. কিপলিং,' বলল আনিস। তাকাল শিরির দিকে। 'আলোটা নেভাও—কথাটা সহজ হলেও সহজ নয়—এর মধ্যে একটু রহস্য আছে বৈকি। কিন্তু, রহস্যটা যে কি, বিশ্বাস করো, সঠিক তা আমি নিজেও জানি না। তবে মাসুদ ভাই সম্পর্কে হাজার হাজার গল্প শুনেছি তো, তার একটাও বিশ্বাস করতে রাজী হবে না তুমি।'

'তোমার মাসুদ ভাই!' মৃদু ব্যঙ্গ আর তাচ্ছিল্যের সুরে বলল শিরি।

একটা হাসি দমন করল আনিস।

'রহস্যটা বলবে?'

'প্রথমে মাসুদ ভাই আলো অফ করবেন,' বলল আনিস। 'শুনেছি বিড়ালের চোখ ওঁর, অন্ধকারেও প্রায় পরিষ্কার সব দেখতে পান। তুমি আমি যেখানে অন্ধ, মাসুদ ভাই সেখানে...'

'তাতে কি?'

'তাতে বিরাট একটা সুবিধে পাচ্ছেন মাসুদ ভাই, এই সহজ কথাটা ঢুকছে না তোমার মাথায়?' বলল আনিস। 'অন্ধকারে যারা আছে তারা ওঁকে দেখতে পাবে না, কিন্তু উনি তাদেরকে দেখতে পাবেন। তখন, ঠিক সেই মুহূর্তে, আরেক ধরনের একটা আলো নিভিয়ে দেবেন তিনি।'

'আরেক ধরনের আলো?'

'মানুষের কোমল গুণগুলোর অপর নাম আলো, তাও জানো না? যেমন ধরো দয়া। দয়া একটা গুণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে সেই আদি যুগ থেকে। যেহেতু এটা একটা গুণ, তাই এর অপর নাম আলো। বিশেষ ধরনের আলো। সেই

আলোটা নিভিয়ে দিলে কি হবে ভেবে নাও।'

'মাসুদ ভাই নির্দয় হয়ে উঠবেন, বলতে চাইছ তুমি?'

মুচকি একটু হাসল আনিস।

'দূর, দূর!' বিরক্তির সাথে বলল শিরি ফারহানা। 'তোমার কথা বুঝতে পারছি, কিন্তু বিশ্বাস করছি না মোটেও। ওঁকে আমি কাঁপতে দেখেছি।'

'বোকা, কাঁচা মেয়ে। মাসুদ ভাইকে চিনতে পারা তোমার কম্মো নয়। আর ওঁকে যার চেনার সাধ্য নেই, শ্রদ্ধা করার ক্ষমতা নেই, তাকে বিয়ে করার কথা ভাবতেও পারি না আমি।'

'গালমন্দ ছেড়ে এবার শাসাচ্ছ—বুঝেছি!'

'ঘোড়ার ডিম বুঝেছ!' বলল আনিস। 'বুঝতে হলে শোনো আমার কথা। মাসুদ ভাই সম্পর্কে যতটুকু শুনেছি তার একশো ভাগের একভাগও যদি সত্যি হয়—ধরে নাও কোরাল আর লিকন মারা গেছে। হয় এরই মধ্যে মারা গেছে, নয়তো বড় জোর আর দু'এক মিনিট আয়ু আছে ওদের। নিজের সহকারীদের নিজের মতই ভালবাসেন মাসুদ ভাই। তাদের কারও গায়ে টোকা লাগলেও সাংঘাতিক রি-অ্যাকশন হয় ওঁর। আর, নিজেকে কিভাবে রক্ষা করতে হয় তাও খুব ভালভাবে জানা আছে তাঁর।' দুর্বলভাবে একটু হাসল আনিস। 'মাসুদ ভাই কোন সমস্যার আংশিক সমাধান পছন্দ করেন না, তিনি জড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলেন।'

অবিশ্বাসের সুরে বলল শিরি, 'কিন্তু ওঁকে আমি কাঁপতে দেখেছি। একজন কাপুরুষ ছাড়া ওভাবে কেউ...'

'বেঁচে আছে বা প্রাণ আছে এমন কাউকে ভয় করেন না মাসুদ ভাই,' বলল আনিস। 'কাঁপার কথা যদি বলো, ওটা আমিও দেখেছি। ওটা ভয়ের কাঁপুনি নয়, প্রচণ্ড রাগের কাঁপুনি, বুঝলে? কাপুরুষ বললে না? তা, হ্যাঁ, মাসুদ ভাই সম্পর্কে অনেকেই ও-কথা ভেবেছে এর আগেও—সম্ভবত মাটির দুনিয়ায় তাদের সবার শেষ ভাবনা ছিল ওটা।' হাসছে আনিস। 'আরে, এখন দেখছি তুমি কাঁপছ?'

কোন উত্তর দিল না শিরি ফারহানা।

'পাশের কেবিনে একটা কাবার্ড আছে,' বলল আনিস। 'যাই পাও ভেতরে নিয়ে এসো তো দেখি।'

দ্বিধাগ্রস্ত দেখাচ্ছে শিরিকে, কিন্তু কোন প্রশ্ন না করে বেরিয়ে গেল সে, দু'মিনিট পর ফিরেও এল। হাতে একজোড়া জুতো। জুতো ধরা হাত দুটো সামনের দিকে যতটা বাড়ানো সম্ভব ততটা বাড়িয়ে রেখেছে সে, এবং মুখে আতঙ্কের ছাপ দেখে মনে হচ্ছে জুতো নয়, একজোড়া গোক্ষুর সাপ ধরে আছে।

'মাসুদ ভাইয়ের জুতো না?'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' বলল শিরি।

'ওখানেই রেখে এসো বরং। খানিক পরই এগুলো দরকার হবে তাঁর।'

ফিরে এসে শিরি জানতে চাইল, 'এবার বলো, জুতো জোড়া কেন খুলে রেখে গেছেন উনি?'

'যাতে পায়ের শব্দ কেউ টের না পায়।'

'কেন?'

'সব প্রশ্নের উত্তর চাও—তুমি কচি খুকী নাকি?'

'তার মানে…তার মানে তুমি বলতে চাইছ, মাসুদ ভাই একজন খুনী?'

'তার আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, কোন্ ধরনের মানুষ পছন্দ তোমার? কাপুরুষ? নাকি সাহসী?'

'কাপুরুষকে আমি ঘৃণা করি,' বলল শিরি।

'তারমানে তুমি বলতে চাইছ,' সুরটা রায় ঘোষণার মত আনিসের, 'মাসুদ ভাইকে তুমি শ্রদ্ধা করো।'

জেনারেটর রুম। ভেতরে ঢুকেই যা খুঁজছে পেয়ে গেল রানা। ছোট্ট একটা তামার ফলকে লেখা রয়েছে 'ডেক লাইটস্।' টেনে নামিয়ে দিল লিভারটা।

অন্ধকার প্ল্যাটফর্ম। জেনারেটর রুম থেকে বেরিয়ে এল রানা। দাঁড়িয়ে পড়েছে। চোখে সইয়ে নিচ্ছে অন্ধকার। ডেরিক ক্রেনের দিকে চাপা স্বরে কথা বলছে কারা যেন। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

ত্রিশ সেকেন্ড পর অন্ধকার সয়ে এল চোখে। নিঃশব্দ পায়ে এগোচ্ছে রানা ডেরিক ক্রেনের দিকে। পায়ে জুতো নেই ওর। শুধু মোজা।

চোখে অন্ধকার সয়ে গেলেও দুই গজ দূরের জিনিস দেখতে পাচ্ছে না রানা। দেখতে না পেলেও, চাপা কণ্ঠস্বরের আওয়াজ শুনে বুঝল দু'জন লোক গজ দুই দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না ও, তারাও ওকে দেখতে পাচ্ছে না। হয়তো আরও চব্বিশ ইঞ্চি এগোলে দেখতে পাবে রানা। কিন্তু মস্ত ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে সেটা। নিঃশব্দে পেন্সিল টর্চের মুখটা অপর হাতে ধরা পয়েন্ট থারটি এইট স্মিথ এ্যান্ড ওয়েসনের ব্যারেলের ওপর তাক করল ও। তারপর বুড়ো আঙুলের চাপ দিয়ে সামনের দিকে ঠেলে দিল আলোর সুইচটা।

চরকীর মত, বিদ্যুৎগতিতে আধপাক ঘুরে গেল লোক দু'জন, একই সাথে দু'জনের হাত যার যার পিস্তল ছুঁতে যাচ্ছে।

'না,' মৃদু গলায় নিষেধ করল রানা। শুভানুধ্যায়ীর কোমল সতর্কবাণীর মত শোনাল ওর কণ্ঠস্বর। 'এটা কি, বুঝতে পারছ?'

বুঝতে পারছে ওরা। সাইলেন্সার লাগানো পয়েন্ট থারটি এইটের গভীর-নীলচে রঙ, তার ওপর পেন্সিল টর্চের আলো পড়ে চকচক করছে। ওদের দু'জনের হাতই পাথরের মত স্থির হয়ে গেল পিস্তলের কাছে পৌঁছুবার আগেই। পয়েন্ট থ্রী-এইট আর পেন্সিল টর্চের আলোর পেছনে অন্ধকার, কাউকে দেখতে পাচ্ছে না ওরা।

'ধীরে ধীরে হাত তোলো। মাথার পেছনে। ঘুরে দাঁড়াও। তারপর সোজা হাঁটতে শুরু করো।'

নিঃশব্দে মাথার পিছনে হাত তুলল ওরা। একসাথে ঘুরে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে হাঁটছে।

প্ল্যাটফর্মের কিনারায় পৌঁছুল ওরা। থামতে বলেনি রানা, কিন্তু তবু ওরা দাঁড়িয়ে পড়েছে। ষোলো ইঞ্চি দূরে কিনারা। কিনারা থেকে ঝপ্ করে খাড়া নেমে গেছে সাগর কন্যার গা দুশো ফিট নিচে। দুশো ফিট নিচে গালফ অব মেক্সিকোর ঠাণ্ডা হিম আর গহীন গভীর পানি।

'মাথার পেছনে আরও শক্ত করে চেপে রাখো হাতগুলো,' বলল রানা। 'হ্যাঁ, ঘুরে দাঁড়াও এবার।' কণ্ঠস্বরে রাগ, বিদ্বেষ, ঘৃণা বা হুমকি—কিছুই নেই।

শরীর দুটো কাঁপতে শুরু করে আবার থেমে গেল একজনের। ঘুরে দাঁড়াল ওরা, কিন্তু এবার দু'জন একযোগে নয়। একজন দেরি করে ফেলল এক সেকেন্ড।

'তোমরা কোরাল আর লিকন?' মৃদু স্বরে প্রশ্ন করল রানা।

পেছনে, ষোলো ইঞ্চি দূরে প্ল্যাটফর্মের কিনারা। লোক দু'জনের ঘাড়ের কাছে শিরদাঁড়া থেকে নেমে আসছে একটা শির শির ভয়ের স্রোত। জোর পাচ্ছে না পায়ে। গলা শুকিয়ে গেছে, আওয়াজ বেরুচ্ছে না।

'তোমরাই কি মি. শমসেরকে গুলি করেছ?' আবার প্রশ্ন করল রানা।

এবারও গলা থেকে আওয়াজ বেরোল না ওদের। দু'জনেই বুঝতে পারছে, অনন্তকালের উদ্দেশে যাত্রা শুরু হতে আর মাত্র এক সেকেন্ড বাকি আছে তাদের।

দু'বার ট্রিগার টিপল রানা, লিকন আর কোরাল গালফের পানি স্পর্শ করার আগেই ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরে আসতে শুরু করেছে ও। মাত্র চার কদম এগিয়েছে, এই সময় টর্চের উজ্জ্বল আলো এসে পড়ল ওর মুখের ওপর। সারা শরীরে একটা ধাক্কার মত লাগল আলোটা। পাথর হয়ে গেল রানা।

'কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! এ যে দেখেছি বিজ্ঞানী সাহেব মি. সাদ্দাম!' লোকটাকে, বা টর্চের পিছনে পিস্তলটাকে দেখতে পাচ্ছে না রানা। কিন্তু গলাটা চিনতে পারছে। জোড়া-ভুরু, ভোঁতা নাক লারসেন। 'কী আশ্চর্য, বিজ্ঞানীর হাতে দেখছি সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল! কোথায় কি করতে যাওয়া হয়েছিল, মি. সাদ্দাম?'

নিজের অজান্তেই মস্ত ভুল করে বসেছে লারসেন। রানাকে দেখামাত্র গুলি করা উচিত ছিল তার, তারপর একেবারেই যদি কৌতূহল দমন করতে না পারত, তখন না হয় রানার লাশকে জিজ্ঞেস করতে পারত প্রশ্নটা। বোতামে চাপ দিয়ে জ্বলন্ত পেন্সিল টর্চটা উপর দিকে ছুঁড়ে দিল রানা। সহজাত প্রবৃত্তির বশে বন বন করে ঘুরতে ঘুরতে ওপারে উঠে যাওয়া টর্চের সাথে ওপরে উঠে যাচ্ছে লারসেনের দৃষ্টি। আশ্চর্য সুন্দর একটা আলোর নকশা এঁকে ওপরে উঠে আবার ওটা নামতে শুরু করার আগেই ট্রিগার টিপে দিল রানা। লারসেনের লাশটা প্ল্যাটফর্মে দড়াম করে পড়ে যাচ্ছে, এই সময় টর্চটা শূন্যে লুফে নিল ও। এখনও জ্বলছে সেটা।

ঝুঁকে পড়ল রানা। লারসেনের একটা পা ধরে পিছিয়ে আসছে ও। কিনারায় পৌঁছে লাশটা টপকে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে পেছন ফিরল। পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে কিনারা থেকে নামিয়ে দিল মৃত দেহটা।

সিক বে-র ছোট্ট কেবিনটায় ফিরে এসে জুতো পরল রানা। সিক-বে-তে ঢুকে দেখল ডাক্তার কিপলিং আনিসকে রক্ত দেবার আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলেছেন এরই মধ্যে। এক ফোঁটা করে রক্ত ঢুকছে আনিসের শিরায়।

রিস্টওয়াচটা চোখের সামনে তুলে সময় দেখল আনিস। 'ছয় মিনিট,' বলল সে। 'এত দেরি হলো কেন, মাসুদ ভাই?' কণ্ঠে সংশয় নিয়ে জানতে চাইল সে।

ভুরু কুঁচকে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার মুখের দিকে শিরি ফারহানা। ভয়ের লেশ মাত্র নেই তার চেহারায়। কিছুটা অবিশ্বাস, কিছুটা বিস্ময় ফুটে রয়েছে

তার চেহারায়।

'দুঃখিত,' হালকা রসিকতার সুরে বলল রানা। দেরি হয়ে যাবার জন্যে কৃত্রিম ক্ষমা প্রার্থনার ক্ষীণ আবেদন ফুটল তার চেহারায়। 'আমার কপাল মন্দ, তাই ফেরার পথে দেখা হয়ে গেল লারসেনের সাথে। সে-ই দেরি করিয়ে দিল একটু।'

'তার মানে, মাসুদ ভাই, আপনি বলতে চাইছেন, লারসেনের কপাল মন্দ?' চোখ কপালে তুলে জানতে চাইল আনিস। 'কোরাল আর লিকন—ওদের সব খবর ভাল তো?'

'এ কথাটা তো জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি!' বলল রানা। হতাশ একটা ভঙ্গি করে এদিক ওদিক মাথা দোলাল ও। 'এখন আর কোন উপায় নেই!'

'বুঝলাম,' সহানুভূতির সুরে বলল আনিস। 'পানি এখানে কতটা গভীর জানা নেই, অত নিচে নেমে কুশলাদি জেনে আসা সম্ভব নয় আর।'

'পানির গভীরতা? তা জেনে নেয়া এমন কি আর কঠিন?' বলল রানা। 'ড. কিপলিং, স্ট্রেচার আছে এখানে?' মাথা ঝাঁকিয়ে ডাক্তার জানালেন, আছে। 'একটা তাহলে রেডি করে রাখুন, প্লীজ। তবে যেখানে আছে সেখানেই থাকুক আপাতত, এখুনি এখানে নিয়ে আসার দরকার নেই। আনিসকে দেখিয়ে আবার বলল ও, 'ওকে 'কপ্টারে তোলার পরও রক্ত দেয়া যাবে কি?'

'কোন সমস্যাই নয় ওটা,' বললেন ডাক্তার। 'আপনি সম্ভবত ওর সাথে যেতে বলবেন আমাকে, মি. সাদ্দাম?'

'এইটুকু দয়া যদি করেন খুব খুশি হব আমি—কৃতজ্ঞ বোধ করব,' বলল রানা। 'আরেকটা কথা। বোধহয় খুব বেশি দাবি করা হয়ে যাচ্ছে, তবু বলছি, মি. শমসেরকে যোগ্য মেডিকেল অথরিটির হাতে তুলে দিয়ে আবার আপনি যদি এখানে ফিরে আসতে পারেন···'

'আমার জন্যে এর চেয়ে আনন্দের ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না,' মুচকি হেসে বললেন ডাক্তার কিপলিং। 'এ-বছর সত্তরে পা দিয়েছি আমি, এতদিন ভেবেছি জীবনের কোন অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হইনি আমি। এখন বুঝতে পারছি, মারাত্মক ভুল ছিল ভাবনায়। এখনও অনেক কিছু শিখতে আর দেখতে বাকি আছে আমার।'

ওদের তিনজনের দিকেই স্তম্ভিত, বিমূঢ়, অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে ঘন ঘন তাকাচ্ছে শিরি ফারহানা। তিনজনকেই প্রশান্ত দেখাচ্ছে। উদ্বেগ, ভয় বা উত্তেজনার চিহ্নমাত্র নেই কারও চেহারায়। নিজের অজান্তেই তিনটে অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে, 'আপনারা সবাই পাগল!'

'সত্যি পাগল নয় যারা শুধু তাদেরকেই বলা হয় কথাটা,' মৃদু হেসে বলল আনিস।

'শিরি,' বলল রানা, 'শমসেরের সাথে ফ্লোরিডায় ফিরে যাচ্ছ তুমিও। যদি কিছু নেবার থাকে, এখুনি গুছিয়ে নাও। ওখানে তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। তোমার বাবা আমাকে জানিয়েছেন, তোমার জন্যে তিনি কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা এখান থেকেই করতে পারবেন।'

দ্বিধান্বিত দেখাচ্ছে শিরিকে। আনিসের দিকে তাকাল সে। একটা চোখ টিপল আনিস। রানার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে।

মুখ খোলার আগে একটা ঢোক গিলল শিরি। বলল, 'ওর সাথে যাওয়া উচিত আমার, বুঝি। কিন্তু বাবা আমার জন্যে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন শুনে এ-ও বুঝতে পারছি ওর পাশে থাকার কোন সুযোগই আমি পাব না। তাহলে ফিরে গিয়ে লাভ কি? এই বিপদে ওর সেবাই যদি করতে না পারলাম...'

'ওর সেবা করার জন্যে সারাটা জীবন সময় পাবে তুমি,' বলল রানা। 'আগে শত্রুদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করো, সেটাই এখন সবচেয়ে জরুরী। শমসেরকে যেখানে পাঠানো হচ্ছে সেখানে ওর সেবা-শুশ্রূষার কোন অভাব হবে না। সাগর কন্যায় থাকা তোমার জন্যে নিরাপদ নয়।'

'এখানে আমার বাবাও তাহলে নিরাপদ নন,' যুক্তি দেখিয়ে বলল শিরি। 'বাবাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।'

শিরি তর্ক করার জন্যে তৈরি হয়ে আছে বুঝতে পেরে বিরক্ত হলো রানা। নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল ও, সিক বে থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ভাবছে, নাফাজ মোহাম্মদকে দিয়ে বলিয়ে শিরিকে রাজী করাতে হবে।

'আবার খুন করতে চললেন নাকি?' স্পর্ধা বা ধৃষ্টতা প্রকাশের সুরে নয়, কৌতূহল বশে জানতে চাইল শিরি।

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল শিরির দিকে। বলল, 'এমন বেয়াড়া মেয়ে তো দেখিনি আর!'

রানার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে চুপসে গেল শিরি। আত্মসম্মানে ঘা লেগেছে ওর।

'কষে দুটো চড় লাগিয়ে দিন!' একটা হাসি দমন করে সুপারিশ করল আনিস।

কালো আঁধার হয়ে উঠল শিরির চেহারা। এক সেকেন্ড কি যেন ভাবল সে, তারপর হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখটা। বলল, 'চড় মারবেন? উঁহু, ওঁর পক্ষে স্রেফ অসম্ভব সেটা। কেন অসম্ভব, তা আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করুক, তা না হলে কারণটা বলব না।'

কিন্তু রানা বা আনিস, কেউই প্রশ্নটা করল না দেখে একটু নিরাশ দেখাল তাকে। সিক বে থেকে বেরিয়ে গেল রানা।

ভুরু কুঁচকে উঠল শিরির।

'কোথায় গেলেন উনি? নিশ্চয়ই আবার কারও জান কবচ করতে?'

'না,' বলল আনিস। 'এখন অন্য কোন কাজে গেছেন।'

'ওর মত তুমিও কি...?' প্রশ্নটা শেষ করল না শিরি, কিন্তু কি জানতে চাইছে তা পরিষ্কার বুঝতে পারল আনিস।

বলল, 'আমি একজন অসুস্থ মানুষ। এমন কোন প্রশ্ন আমাকে তোমার করা উচিত নয় যাতে আমি আপসেট হয়ে পড়ি...'

'আসলে, তোমাকে আজও আমি চিনতে পারিনি, তাই না?'

'পারোনি,' জানিয়ে দিল আনিস। 'যদি পারতে, সকাল-বিকাল পায়ে হাত দিয়ে কদমবুসি করতে।'

'আমার প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেছ তুমি,' গম্ভীর হয়ে উঠছে শিরি। 'তুমি অসুস্থ, তাই চাপ দিচ্ছি না। কিন্তু যারা খুনী তাদেরকে ঘৃণা করি আমি, এ-কথাটা জেনে রাখো। যারা মিথ্যা কথা বলে, তাদেরকেও ঘৃণা করি। সুস্থ হয়ে ওঠো, তখন সত্যি

উত্তরটা জানিয়ো আমাকে।'
'এ-ব্যাপারে খুব সিরিয়াস মনে হচ্ছে তোমাকে।'
'হ্যাঁ,' বলল শিরি। কি যেন ভাবল, তারপর আবার বলল, 'সত্যি যদি কাউকে কোনদিন খুন করে থাকো, আমাকে বিয়ে করার আশা ছেড়ে দিতে পারো তুমি। যাকে ঘৃণা করতে হবে তার সাথে ঘর-সংসার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'
'এ-কথা কয়েক হাজারবার শুনেছি তোমার মুখে,' বলল আনিস। 'এবং প্রতিবার উত্তরটাও পেয়েছ।—তোমাকে বিয়ে করব কিনা তা এখনও আমি ভেবে দেখিনি। তুমিই বরং আভাসে ইঙ্গিতে জানিয়েছ, আমি তোমাকে বিয়ে করলে তোমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে।'
'অস্বীকার করছি না,' থমথম করছে শিরির চেহারা। 'কিন্তু তখন আমি বিশ্বাস করতাম দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন তোমার আদর্শ। কিন্তু…'
'তোমার বিশ্বাস ভাঙল কেন?'
'তোমার বসকে অবলীলায় মানুষ খুন করতে দেখে,' বলল শিরি। 'এবং একথা বুঝতে পেরে যে সুস্থ থাকলে ওই কাজ তুমিও করতে।'
'জান বাঁচানো ফরজ, শিরি। আমাদেরকে ওরাই আক্রমণ করেছে আগে।'
কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শিরি বলল, 'দেশ থেকে আইন উঠে যায়নি। কেউ যদি কাউকে আক্রমণ করে তার বিচার করার অধিকার শুধু আদালতের আছে, আর কারও নেই।'
'অশিক্ষিত। অল্প বিদ্যে ভয়ঙ্করী। তুমি আইন সম্পর্কে কিছুই জানো না। আইনে আত্মরক্ষার চেষ্টাকে পূর্ণ সমর্থন দেয়া হয়েছে।'
'মাসুদ ভাই আত্মরক্ষার জন্যে খুন করেছেন, বলতে চাইছ?'
'অবশ্যই।'
'মিথ্যে কথা। ওর গায়ে কেউ টোকা পর্যন্ত মারেনি…'
'আমাকে গুলি করেনি ওরা?' বলল আনিস। 'শুধু মাসুদ ভাই কেন, সাগর কন্যায় যারা রয়েছে তাদের প্রত্যেকের জীবন বিপন্ন, তুমি জানো, বুঝেও না বোঝার ভান করছ কেন?'
'কথার প্যাঁচ দিয়ে আমাকে বোকা বানাতে পারবে না, কচি খুকী নই আমি,' ঝাঁঝের সাথে বলল শিরি। 'ভাল কথা, আমাকে সাগর কন্যায় থাকতে বলার পেছনে তোমার উদ্দেশ্যটা কি?'
'তুমিই একদিন বলেছিলে, আমার কাজ শিখতে তোমার নাকি ভীষণ ইচ্ছা হয়,' বলল আনিস। 'তাই এই সুযোগটা নিতে বলছি তোমাকে। মাসুদ ভাইয়ের সাথে যদি সাগর কন্যায় থেকে যাও, মাত্র দু'একদিনেই দু'দশ বছরের শিক্ষা পেয়ে যাবে।'
'মানুষ খুন করতে শেখার কোন ইচ্ছে আমার নেই,' দৃঢ়তার সাথে জানিয়ে দিল শিরি। একটু থেমে জানতে চাইল, 'যতদূর বুঝতে পারছি, সাগর কন্যা একটা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হবে, রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে এখানে—কেমন ভালবাস তুমি আমাকে, এখানে থেকে যেতে বলছ যে?'
হাসল আনিস। 'মাসুদ ভাই যতক্ষণ আছেন, এখানে তোমার কোন ভয় নেই।

কেউ তোমার ছায়া পর্যন্ত মাড়াতে পারবে না।'

'একজন মানুষের ওপর এতটা ভরসা রাখা বোকামিও হতে পারে,' বলল শিরি।

'এখানে থাকো। ওঁর পিছু পিছু ঘুর ঘুর করো। নিজেই সব পরিষ্কার বুঝতে পারবে। শিখতেও পারবে অনেক কিছু।'

'শিখতে আমার বয়ে গেছে!' ঠোঁট উল্টে, তাচ্ছিল্যের সাথে বলল শিরি। 'এখানে আমি থাকছি বটে, কিন্তু তা খুন করা শেখার জন্যে নয়। আমি আমার বাবাকে রেখে কোথাও যেতে চাই না।'

'তবু,' বলল আনিস, 'সাদা ব্লাউজটা বদলে ফেলা দরকার তোমার। নেভী-ব্লু জীনস চলবে। নেভী-ব্লু বা কালো জাম্পার পরতে পারো।'

'কেন?'

নিঃশব্দে হাসছে আনিস।

'কেন?' আবার জানতে চাইল শিরি।

ডাক্তার কিপলিং ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন এতক্ষণে। 'লেডী ফারহানা, মি. শমসেরকে শুধু যে রক্ত দেয়া হচ্ছে তাই নয়, ব্লাড প্রেশারের ব্যাপারটাও আপনার বিবেচনার মধ্যে থাকা উচিত।'

'আমার ব্লাডপ্রেশার নরমাল,' বলল আনিস।

'কেন?' এবার বিমূঢ় দেখাচ্ছে শিরিকে।

'মুখে যাই বলো, মাসুদ ভাইয়ের কাছ থেকে শেখার আগ্রহ আসলে তুমি কোনভাবেই দমিয়ে রাখতে পারবে না,' বলল আনিস। 'অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতে হলে সাদা পোশাক পরা চলে না, তাতে শত্রুপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।'

রেগেমেগে কি-যেন বলতে যাচ্ছিল শিরি, কিন্তু তাকে এবার বাধা দিলেন ডা. কিপলিং। বললেন, 'না। আর একটা কথাও বলা চলবে না আমার পেশেন্টের সাথে, লেডী ফারহানা। আমি দুঃখিত।'

চুপচাপ কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল শিরি। রাগের ভাব ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাচ্ছে চেহারা থেকে। ঝুঁকে পড়ে আনিসের কপালে একটা আলতো চুমো খেল। তারপর সোজা বেরিয়ে গেল সিক বে থেকে।

নাফাজ মোহাম্মদের লিভিংরুম। পাশাপাশি দুটো আর্মচেয়ারে বসে আছে রানা আর নাফাজ মোহাম্মদ। ওয়াল-স্পীকারগুলো অন করা হয়েছে। নেভী-ব্লু জীনস আর নেভী পোলো পরে ভেতরে ঢুকল শিরি ফারহানা, তাকে দেখামাত্র জরুরী ভঙ্গিতে ঠোঁটের সামনে তর্জনী তুলে চুপ থাকতে বলল রানা।

স্পীকারের মাধ্যমে কামরার ভেতর ছড়িয়ে পড়ছে একটা কণ্ঠস্বর। গলাটা চিনতে পারছে শিরি, কন্তি কথা বলছে।

'...শুধু জানি ডেক লাইট হঠাৎ করে নিভে গিয়েছিল,' বলছে কন্তি, 'কয়েক মিনিটের জন্যে। মিনিট কয়েক আগে ফিরেও এসেছে আবার। ল্যান্ড করার জন্যে এখন আর আলোর কোন অভাব নেই আপনাদের।'

'রাডার স্ক্যানার নিউট্রাল করেছ?'

এটা শিরির পরিচিত কণ্ঠস্বর নয়। এর আগে কখনও শোনেনি। কিন্তু নাফাজ

মোহাম্মদের ঠোঁট জোড়া পরস্পরের সাথে আরও চেপে বসল দেখে বোঝা যাচ্ছে জন হেকটরের কণ্ঠস্বর তাঁর কাছে অপরিচিত নয়।

'এখন আর তার দরকার আছে বলে মনে করি না,' বলল কন্তি।

'প্রস্তাবটা তোমারই ছিল। সারো কাজটা। দশ মিনিটের মধ্যেই রওনা হচ্ছি আমরা। পৌঁছুতে লাগবে পনেরো মিনিট।'

'তার মানে আপনিও আসছেন, স্যার?'

'না। আরও জরুরী কাজ আছে আমার।' ক্লিক্ করে শব্দ হলো একটা। ট্র্যান্সমিশন বন্ধ করে দিয়েছে হেকটর।

অস্বস্তির সাথে বললেন নাফাজ মোহাম্মদ, 'ঠিক কি বলতে চাইল শয়তানটা বুঝতে পারলাম না।'

'কঠিন মূল্য না দিয়ে বোঝার কোন উপায়ও নেই,' বলল রানা। শিরির দিকে তাকাল ও। 'তোমার পায়ে জুতো নেই কেন?'

ঠোঁট বাঁকা করে একটু হাসল শিরি। 'বাবাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, যে-কোন জিনিস একবার দেখলেই দ্রুত শিখে নিতে পারি আমি। জুতো পায়ে দিয়ে প্ল্যাটফর্মে হাঁটাহাঁটি করলে আওয়াজ হয়।'

'প্ল্যাটফর্মে কে যেতে বলেছে তোমাকে?'

'কেউ বলুক বা না বলুক, আমি যাব। আমার শিক্ষার মধ্যে নাকি অনেক ফাঁকি আর ফাঁক-ফোকর রয়ে গেছে। সেগুলো ভরে নিতে হবে। কিলাররা কিভাবে অপারেট করে দেখতে চাই আমি।'

অস্বস্তির ছায়া পড়ল রানার চোখে। বলল, 'কেউ কাউকে খুন করতে যাচ্ছে না এখানে। তোমার ব্যাগ গুছিয়ে নাও। খানিক পর রওনা হবে তোমরা।'

'আমি কোথাও যাচ্ছি না।'

'কেন?'

'বাবাকে ছেড়ে কোথাও আমি যাব না,' দৃঢ় স্বরে বলল শিরি। 'তাছাড়া, ওই যে বললাম, কিছু শিখতে চাই আমি।'

'দরকার হলে,' শান্ত, কিন্তু কঠিন সুরে বললেন নাফাজ মোহাম্মদ, 'দড়ি দিয়ে বেঁধে হলেও পাঠানো হবে তোমাকে।'

'তাই?' একটুও ঘাবড়াচ্ছে না শিরি। 'কিন্তু আমার জিভটা তো আর কেউ বাঁধতে পারবে না? পুলিস প্রচণ্ড আগ্রহের সাথে শুনবে আমার কথা, যখন ওদেরকে বলব মিসিসিপি আর্মারীর লুট করা আগ্নেয়াস্ত্রগুলো কোথায় আছে।'

সবিস্ময়ে মেয়ের দিকে তাকালেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'আমার এত বড় সর্বনাশ করতে পারবে তুমি? আমার মেয়ে হয়ে?'

'আমার হাত-পা বেঁধে জোর করে 'কপ্টারে তুলে দেবে তুমি? আমার বাবা হয়ে?' পাল্টা প্রশ্ন শিরির।

হতাশ ভঙ্গিতে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ছেন নাফাজ মোহাম্মদ।

ঝর ঝর করে মিষ্টি হাসি ঝরছে শিরির গলা থেকে। হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল সে। ওয়াল-স্পীকারগুলো জ্যান্ত হয়ে উঠেছে আবার।

হেক্টরের গলা, 'শোনো, গায়ে শুধু বাতাস লাগিয়ে বেড়িয়ো না। রাডারটা

বন্ধ করো।'

'কিভাবে?' টেসিও কথা বলছে এবার। ত্যক্ত, বিরক্ত কণ্ঠস্বর। 'ওই ড্রিলিং রিগের মাথায় চড়া কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব?'

'বোকার মত কথা বোলো না। রাডার রুমে যাও। কনসোলের ঠিক ওপরে লাল একটা লিভার সুইচ আছে। টেনে নামিয়ে দাও ওটা।'

'হ্যাঁ, তা আমি করতে পারি,' স্বস্তির হাঁফ ছেড়ে বলল টেসিও।

একটা দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ পেল ওরা। পা ছুঁড়ে জুতো জোড়া খুলে ফেলল রানা, নিভিয়ে দিল কামরার আলো, আস্তে করে সিকি ইঞ্চি ফাঁক করল দরজাটা। এরই মধ্যে ওদের দিকে পেছন ফিরে এগোচ্ছে টেসিও, সোজা রাডার রুমের দিকে যাচ্ছে সে। রাডার রুমের দরজা খুলে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল তাকে রানা। নিঃশব্দ পায়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এল ও। চোখ দুটো আটকে রয়েছে রাডার রুমের খোলা দরজার দিকে। এগোচ্ছে নিঃশব্দ পায়ে। সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা বের করে বাঁ হাতে নিল। এই সময় পেছন থেকে নরম গলা ভেসে এল ওর কানে। 'আপনি ন্যাটা? তা তো জানতাম না! খাবারও বুঝি ওই বাঁ হাতে তুলে মুখে দেন?'

এখন আর দাঁড়াবার সময় নেই। বকাঝকা করে লাভও নেই কোন, বুঝতে পারছে রানা। হাল ছেড়ে দিয়ে, কাঁধ ঝাঁকাল, তারপর এগোল সামনে।

'চুপ!' শিরিকে আবার কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে দেখে চাপা কণ্ঠে শাসাল রানা।

লাল লিভারটায় হাত দিতে যাচ্ছে টেসিও, এই সময় নিঃশব্দ পায়ে রাডার রুমে ঢুকল রানা। বলল, 'নোড়ো না।'

পাথর হয়ে গেল টেসিও।

'মাথার পেছনে হাত তোলো। ঘুরে দাঁড়াও। তারপর এগিয়ে এসো।'

ধীরে ধীরে মাথার পেছনে হাত তুলল টেসিও। ঘুরে দাঁড়াল। রানাকে দেখে চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার। 'মি. সাদ্দাম!'

'কোনও চালাকি নয়,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'এরই মধ্যে তোমার তিন বন্ধুকে খতম করতে হয়েছে, আরেকজনকে করলেও ঘুম নষ্ট হবে না আমার। গুনে গুনে চার পা এগোও। তারপর থামো। তারপর আবার পেছন ফেরো।'

চোখ দুটো এখন আর বিস্ফারিত হয়ে নেই টেসিওর, পিটপিট করছে পাতাগুলো। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারছে না কিছুতেই। তিন পা এগোল সে, তারপর দ্বিধাগ্রস্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল। ক'পা এগিয়েছে, মনে নেই।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলল রানা, 'ওতেই হবে। ঘুরে দাঁড়াও এবার।'

ঘুরে দাঁড়াল টেসিও।

ডান হাতটা কোটের পকেট থেকে বের করল রানা। চামড়ার একটা স্ট্র্যাপ জড়ানো রয়েছে ওর কব্জিতে, স্ট্র্যাপের শেষ মাথায় ছোট্ট একটা বালির বস্তা। মাত্র পাঁচ ইঞ্চি লম্বা বস্তাটা। দু'পা এগিয়ে টেসিওর ডান কানের উপর মারল রানা। পর মুহূর্তে ধরে ফেলল ওর অজ্ঞান দেহটা। ধীরে ধীরে নামিয়ে দিল মেঝেতে।

'একটুও কি দয়ামায়া নেই আপনার...' গলার ভেতর বাকি শব্দগুলো আটকে

গেল শিরির, ইচ্ছা করেই বেশ একটু জোরের সাথে ওর মুখে হাত চাপা দিয়েছে রানা।

'জোরে কথা বোলো না,' রূঢ় কণ্ঠে ফিসফিস করে বলল রানা। ঝুঁকে পড়ে টেসিওর পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে নিজের পকেটে ভরল।

'এভাবে না মারলেও তো পারতেন ওকে,' নিচু গলায় বলল শিরি। 'হাত-পা বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে দিলেও তো চলত।'

'উপদেশ খয়রাত করতে ডেকেছি তোমাকে? আধঘন্টার জন্যে বিশ্রাম নিচ্ছে টেসিও। একটা অ্যাসপ্রিন খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে আবার।'

'যাক, একেবারে যে খুন করে ফেলেননি, তাই রক্ষে। এইবার চলুন, কোন্‌দিকে যাবেন?'

'কভির কাছে যেতে হচ্ছে আমাকে। কিন্তু তুমি আমার সাথে যাচ্ছ না।'

'কভির কাছে কেন?' জবাবদিহি চাওয়ার সুর।

'টেসিওর ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে খোঁজ নিতে বেরিয়ে আসবে সে। টেসিওর অবস্থা দেখে রেডিওফোনের সাহায্যে সাবধান করে দেবে হেকটরকে। হেলিকপ্টারটা তাহলে আর পাঠাবে না হেকটর।'

'সেটাই তো চান আপনি, তাই না?'

'না। আমি চাই আসুক ওটা।'

রাডার রুমের আলো নিভিয়ে দিয়ে প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে এল রানা। ওকে অনুসরণ করছে শিরি।

নাফাজ মোহাম্মদের সিটিংরুমের সামনে দিয়ে যাচ্ছে ওরা। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'ভেতরে ঢোকো,' শিরিকে বলল ও। 'পেছনে ঘুর ঘুর করলে কাজে ব্যাঘাত হয়। ঢোকো ভেতরে।'

'অসম্ভব! কক্ষনো না...'

শিরির একটা হাত খপ্‌ করে ধরে টেনে সিটিংরুমের ভেতর নিয়ে এল ওকে রানা। মৃদু বিস্ময়ের সাথে মুখ তুলে ওদের দিকে তাকালেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'মি. নাফাজ,' বলল রানা, 'আপনার এই বেয়াড়া মেয়ে যদি ওই দরজার বাইরে পা দেয়, আমি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করব আপনাকে। ডেকের আলো নিভিয়ে দিতে যাচ্ছি আমি। আমার অনুমতি না নিয়ে কেউ যদি প্ল্যাটফর্মে বেরোয়, দেখা মাত্র গুলি করা হবে তাকে। কথাটা যেন মনে থাকে। এখানে আমরা ছেলেখেলা করতে আসিনি।' বেরিয়ে এসে বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল রানা দরজাটা।

সাত

বেহুঁশ কভির পকেট থেকে দুই গোছা চাবি আর পিস্তলটা বের করে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা। দ্রুত পায়ে হেঁটে চলে এল দু'নম্বর কোয়ার্টারের সামনে। দরজা খুলে ভেতরে পা রাখল ও, সুইচ অন করে আলো জ্বালল করিডরের। 'কমান্ডার

হাম্মাম,' গলা চড়িয়ে ডাকল। 'জিউসেপ বারজেন।'

করিডরের দু'পাশের দুটো দরজার গায়ে ভেতর থেকে করাঘাত হচ্ছে। চাবি দিয়ে দরজা দুটো খুলে দিল রানা।

'মি. সাদ্দাম!' সবিস্ময়ে বলল কমান্ডার লিল হাম্মাম। 'আপনি এখানে কি করছেন?'

'নিরীহ একজন বিজ্ঞানী, খাবারটা যাতে ঠিক মত হজম হয়, তাই একটু হাঁটাহাঁটি করছি,' বলল রানা। ওকে হাসতে দেখেও বিস্ময়ের ঘোর কাটছে না কমান্ডারের।

'কন্ডির ওয়ার্নিং শোনেননি আপনি? প্ল্যাটফর্মে কাউকে দেখামাত্র...'

'আপাতত দুঃসময় কাটিয়ে উঠেছি আমরা,' বলল রানা। 'একটা খারাপ খবর, দুটো ভাল। খারাপটা আগে। মি. শমসের ঘাড়ে আর বুকে গুলি খেয়েছেন। ডাক্তার বলছেন, বুলেটটা শিরদাঁড়ার পেছনে গিয়ে বসে আছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে পাঠাতে হবে ওকে। মি. নাফাজের পার্সোনাল পাইলট কে?'

'পোসটার।'

'আপনার একজন লোককে এখুনি পাঠিয়ে দিন তার কাছে,' বলল রানা। 'ফুয়েল নিয়ে 'কপ্টার রেডি রাখে যেন। সুখবর—রেডিও রূমে কন্ডি আর রাডার রূমে টেসিও, দু'জনেই অজ্ঞান হয়ে আছে।' জিউসেপ বারজেনের দিকে তাকাল রানা। 'কিছুক্ষণ পর ওদের যখন জ্ঞান ফিরবে, তুমি ওদের দায়িত্ব নিতে পারবে তো?'

'এত বড় সৌভাগ্য হবে আমাদের, বিশ্বাসই করতে পারছি না,' মাফিয়া গুণ্ডা সর্দার সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দিল রানাকে, 'স্যার, ওদের ব্যাপারে আপনাকে আর কিছু ভাবতেই হবে না। এমন সেবা শুশ্রূষা করব, চিরকাল মনে তো রাখবেই, দেখা হলে বাপ ডাকবে।'

'কণ্ডির আরও তিনজন সহকারী ছিল,' বলল কমান্ডার হাম্মাম।

'হ্যাঁ, ছিল,' বলল রানা। 'তারা ঝাঁপ দিয়ে পানিতে পড়ে বেঁচে গেছে।'

'বেঁচে গেছে?' চোখ কপালে তুলে, ঘোর অবিশ্বাসের সাথে বলল কমান্ডার। 'অসম্ভব! গালফ অব মেক্সিকো এখানে নয়শো ফিট গভীর।'

'আমি বলতে চাইছি,' শান্তভাবে বলল রানা, 'ওরা আত্মহত্যা করে বেঁচে গেছে।'

প্রথমে বিস্ফারিত হয়ে উঠল কমান্ডারের চোখ দুটো। তারপর রানার আপাদমস্তকে সপ্রশংস দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। 'কিন্তু,' জানতে চাইল সে, 'গুলির আওয়াজ বা ঝপাৎ করে পানিতে পড়ার কোন শব্দ তো আমরা শুনিনি? আপনি একজন বিজ্ঞানী, নিশ্চয়ই প্রশ্ন দুটোর উত্তর দিতে পারবেন?'

'সাইলেন্সার লাগানো থাকলে পিস্তলে গুলির আওয়াজ হয়? আর পানি তো দুশো ফিট নিচে, পতনের শব্দ এত উঁচুতে ওঠে না।'

'ধন্যবাদ,' কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কমান্ডার। 'আপনার সম্পর্কে আর কিছু জানতে বাকি থাকল না আমার। নাম ঠিকানাটাই তো মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় নয়, তার প্রকৃতিটাই বড় কথা। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি, মি. সাদ্দাম।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা।

'আরেকটা সুখবর কি?'

'হেলিকপ্টার করে আরও লোকজন পাঠাচ্ছে হেকটর,' বলল রানা। 'খুব বেশি নয়, আট কিংবা নয় জন। সম্ভবত এই মুহূর্তে টেক-অফ করছে। পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে। তার মানে, বোঝা যাচ্ছে, হেকটরের জাহাজ দিগন্তরেখার ঠিক নিচেই কোথাও রয়েছে, সেটাকে নাগালের মধ্যে পাচ্ছে না আমাদের রাডার।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল কমান্ডারের মুখটা। 'আপনি বললে আকাশে থাকতেই গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিতে পারি হেলিকপ্টারটাকে।'

'তাই করা উচিত বলে প্রথমে আমিও ভেবেছিলাম,' বলল রানা। 'কিন্তু এখন অন্য কথা ভাবছি। ওদের জন্যে এখানে কোন বিপদ নেই এই রকম একটা পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যাতে নিশ্চিন্ত মনে নেমে আসে। তারপর আটক করব। ওদের লীডারকে দিয়ে হেকটরের কাছে "সব ঠিক হ্যায়" মেসেজ পাঠানো তেমন কঠিন হবে না।'

'যদি সে রাজী না হয়? কিংবা, চেঁচিয়ে উঠে সাবধান করে দিতে চেষ্টা করে হেকটরকে?'

'মুখ খুলতে যাচ্ছে দেখলেই সাইলেন্সার ব্যবহার করব আমি,' বলল রানা। 'কিছুই শুনতে পাবে না হেকটর।'

'গুলি খেয়েই কেউ মারা যায় না,' বলল কমান্ডার। 'তার আর্তনাদ যদি শুনতে পায় হেকটর, সব ভেস্তে যাবে না?'

'একটা পয়েন্ট থারটি-এইট বুলেট যখন আপনার খুলির গোড়া দিয়ে ঢুকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী তির্যক ভঙ্গিতে ওপরদিকে যাত্রা আরম্ভ করবে, আর্তনাদ তো দূরের কথা, একটা নিঃশ্বাস ফেলারও সময় পাবেন না আপনি।'

'আপনি বলতে চাইছেন, লোকটাকে খুন করবেন?' ঠিক অবিশ্বাস করছে না কমান্ডার, কেমন যেন হতভম্ব দেখাচ্ছে তাকে।

'উপায় না থাকলে, হ্যাঁ। তারপর দ্বিতীয় লোকটাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করব আমরা,' বলল রানা। 'তাকে নিয়ে কোন সমস্যা দেখা দেবে বলে মনে করি না।'

'এখন আমার জানতে ইচ্ছা করছে, আসলে আপনি কে?' কৌতূহল, বিস্ময় আর ভক্তিতে চেহারাটাই বদলে গেছে কমান্ডারের।

'একজন নিরীহ বিজ্ঞানী,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'কাজ ছাড়া কিছু বুঝি না। ভালয় ভালয় হেলিকপ্টারটা নামার পর হেকটরকে তার লোকদের কাউকে দিয়েই একটা মিথ্যে খবর পাঠাতে চাই আমি। বলা হবে, হেলিপ্যাডের ওপর পৌঁছে এঞ্জিন ফেল করেছিল, ফলে ক্রাশ ল্যান্ড করতে বাধ্য হয়েছে, মেরামতের জন্যে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে।'

'তাতে লাভ?'

'হাতে একটা হেলিকপ্টার থাকবে, কখন কি দরকার লাগে কে বলতে পারে?' বলল রানা। 'তাছাড়া, আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, একটা হেলিকপ্টার হারালে কিছুটা অসুবিধে তো ভোগ করতে হবেই হেকটরকে। এই মুহূর্তে তার যত

অসুবিধে সৃষ্টি করতে পারব ততই লাভ আমাদের।' জিউসেপ বারজেনের দিকে তাকাল রানা। 'তুমি তোমার লোকজনদের নিয়ে ওদের অভ্যর্থনা জানাবে, পারবে তো?'

'সুন্দর পারব,' বলল জিউসেপ বারজেন। 'আপনার কোন সাজেশন আছে, স্যার?'

'তোমার মত একজন এক্সপার্টকে আবার কি সাজেশন দেব?'

'স্যার…স্যার কি তবে আমাকে চেনেন?'

'তোমাকে চিনি, এ-কথা বললে অর্থটা পরিষ্কার হয় না,' বলল রানা। 'পুলিসকে চিনি। ওদের সাথে দু'রকম সম্পর্কই আছে আমার—ওরা আমার বন্ধুও, আবার শত্রুও।' বাজে কথায় সময় নষ্ট না করে কাজের কথায় ফিরে এল রানা। 'এই রিগে অসংখ্য পোর্টেবল সার্চ-লাইট আছে। 'কপ্টার থেকে নেমেই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ভবনের দিকে এগোবে ওরা। আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে থাকব আমি, সময় হয়েছে মনে করলেই নিভিয়ে দেব ডেকের সমস্ত আলো, তারপর সার্চ-লাইটগুলো জ্বেলে দেব সব একসাথে—ওরা তখন, ধরো, ত্রিশ গজের মত দূরে থাকবে। চোখ-ধাঁধানো আলোয় অন্ধ হয়ে যাবে ওরা, কেউ দেখতেই পাবে না তোমাদেরকে।'

'ধন্যবাদ, গেরিলা কমান্ডার, স্যার,' মাথা ঝাঁকিয়ে শ্রদ্ধা প্রকাশ করল বারজেন।

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে কমান্ডার লিল হাম্মামের দিকে তাকাল রানা, বলল, 'মি. নাফাজের সাথে আপনার দেখা হওয়া উচিত।'

'হ্যাঁ, চলুন, যাওয়া যাক।'

বারজেন তার লোকদেরকে দ্রুত নির্দেশ দিচ্ছে, ওদের দিকে পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল রানা আর কমান্ডার।

'আপনার প্ল্যান সম্পর্কে জানেন মি. নাফাজ?' জিজ্ঞেস করল কমান্ডার।

'সময় পেলাম কোথায় যে বলব? তাছাড়া বলতেই হবে তারই বা কি মানে? তেল থেকে কোটি কোটি ডলার রোজগার করার কৌশল আমাকে তিনি জানাবেন?'

'যুক্তি বটে!' কয়েক মুহূর্তের জন্যে রেডিও রূমের সামনে দাঁড়াল ওরা। রক্তাক্ত শরীর নিয়ে এখনও অচেতন হয়ে পড়ে রয়েছে কড়ি, মুখটা ক্ষতবিক্ষত, চেনাই যাচ্ছে না। 'ইস্, সুযোগটা থেকে আপনি আমাকে বঞ্চিত করেছেন।' ক্ষীণ অভিযোগের সুর কমান্ডারের গলায়। 'অনেক টাকার গাড্ডায় ফেলে দিয়েছেন আপনি ওকে। প্লাস্টিক সার্জেন সস্তায় পাওয়া যায় না।'

সিক বে-তেও কিছুক্ষণের জন্যে থামল ওরা। চোখ বড় বড় করে জেগে আছে আনিস, পেশীবহুল হাত দুটো শক্ত মুঠো পাকানো। রানার সাথে কমান্ডারকে দেখে মুচকি হাসল সে। 'জানতাম। কিন্তু বেশ একটু দেরি করেছেন এবারও, সাদ্দাম ভাই,' ভুরু কুঁচকে উঠল তার। 'এদিকের পানি কতটা গভীর?'

'নয়শো ফিট।'

'সেক্ষেত্রে ডাইভিং সরঞ্জাম দরকার হবে আপনার,' ঠিক কি বলতে চাইছে

আনিস তা একমাত্র রানা ছাড়া আর কারও বোঝার কথা নয়। কমান্ডারের দিকে তাকাল সে। 'বোঝাই যাচ্ছে আমাকে আপনি চিনতে পারছেন না, নাকি চেনেন?'

মাথা একটু ঝুঁকিয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল কমান্ডার লিল হাম্মাম। মৃদু গলায় বলল, 'চিনলেও চিনতে মানা আছে।'

'ধন্যবাদ,' একটু হাসি দেখা গেল আনিসের মুখে। 'মি. নাফাজ রিটায়ার করলেও সাগর কন্যার কমান্ডার হিসেবে বহাল থাকবেন আপনি।'

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কমান্ডারের মুখ। 'ধন্যবাদ, মি. আনি···সরি, মি. শমসের।'

'কোথায় ছিলেন এতক্ষণ আপনি, কি করছিলেন?'

'বিশ্রাম নিচ্ছিলাম,' বলল কমান্ডার হাম্মাম। 'এই সুযোগে মি. সাদ্দাম আমাকে অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত করেছেন। পানিতে লাফিয়ে পড়ে তিনজনের আত্মহত্যা দেখার কোন সুযোগ দেননি, কন্তির চোখ থেকে দিনের আলো কেড়ে নেবার সুখটা একাই উপভোগ করেছেন, ভাগ দেননি আমাকে। টেসিওকে বানাবার সুযোগটা পর্যন্ত পাইনি আমি।'

'আমার গুরু,' রানাকে দেখিয়ে বলল আনিস, 'এসব ব্যাপারে একটু স্বার্থপর বলে খ্যাতি আছে ওঁর। সাগর কন্যা তাহলে আমাদের হাতে?'

'আপাতত,' বলল রানা।

'আপাতত, সাদ্দাম ভাই?'

'তোমার কি মনে হয় এত সহজে হাল ছেড়ে দেবে হেকটর? না হয় পাঁচজন লোক হারিয়েছে সে, আরও হয়তো আট নয় জন হারাতে যাচ্ছে—দুই কোটি বিশ লক্ষ ডলার নিয়ে মাঠে নেমেছে যে, তার জন্যে এ আর এমন কি ক্ষতি? তাছাড়া, ভুলে যাচ্ছ কেন, মি. নাফাজ আর আমার ওপর তার যে প্রচণ্ড ঘৃণা রয়েছে সেই ঘৃণাই তার নিজের সর্বনাশ, তার ধ্বংস ডেকে আনতে যাচ্ছে। এখুনি যদি হাল ছেড়ে দেয়, সে যে বেঁচে যাবে। কিন্তু এবার তো তার কপালে বেঁচে যাওয়া নেই।'

'আশ্চর্য, অদ্ভুত আর অকাট্য যুক্তি!' অসুস্থ আনিসকে মুগ্ধ দেখাচ্ছে। 'কি করবে তাহলে এখন সে?'

'সময় এলেই জানা যাবে,' বলল রানা। 'তার উদ্দেশ্য যতদূর বুঝি, শুধু সাগর কন্যাকে ধ্বংস করা নয়। এখানে যারা আছে তাদের মধ্যে মি. নাফাজ আর আমি উপস্থিত আছি কিনা তা জেনে নেবে সে, তারপর সব কিছু ধ্বংস করার চেষ্টা করবে।'

'আপনার পরিচয় এখানে যারা জানে তারা মুখ খুলবে না···'

'তা জানি,' বলল রানা। আমাকে দেখেও চিনতে পারবে না সে। কিন্তু, কেন যেন মনে হচ্ছে, আমার উপস্থিতির কথা অজানা থাকবে না তার কাছে।' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তাতে অবশ্য এখনই কিছু এসে যাচ্ছে না।' ডাক্তার কিপলিঙের দিকে তাকাল রানা। 'ডাক্তার, ক্রুদের সাহায্য নিয়ে স্ট্রেচারটা এবার নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে হয়।' কমান্ডার হাম্মামের দিকে তাকাল এবার। 'দু'জন ক্রু দিয়ে সাহায্য করতে পারেন আপনি?'

'নিশ্চয়ই।'

'ওরা মি. শমসেরকে স্ট্রেচারে তুলে হেলিকপ্টারে উঠিয়ে দেবে,' বলল রানা। তাকাল আনিসের দিকে। 'একই ফ্লাইটে তোমার সাথে কভি আর টেসিওকে পাঠাতে হচ্ছে। অস্বস্তি বোধ করবে না তো? মরা মুরগীর বাচ্চার মত পড়ে থাকবে ওরা পেছনে।'

'কিছু এসে যায় না। ওদের খাতির যত্ন করতে পারব না এই যা দুঃখ।'

'তোমার সাথে একই ফ্লাইটে যাবার কথা নয় ওদের,' বলল রানা। 'কিন্তু একটা কথা চিন্তা করে এছাড়া আর কোন উপায়ও দেখছি না আমি।'

আনিসের চোখে প্রশ্ন দেখে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে রানাকে। 'আমার বিশ্বাস, সাগর কন্যাকে আবার দখল করে নেবে হেকটর। কিভাবে, সে-ব্যাপারে আমার কোনও ধারণাই নেই। শুধু এইটুকু জানি যে শয়তানী বুদ্ধি আর ধ্বংস করার প্রবৃত্তি নিয়ে যে-কোন উদ্যোগী পুরুষ যা খুশি তাই অর্জন করতে পারে। হেকটর যদি সফল হয়, আমি চাই না কভি আর টেসিও আঙুল তুলে আমাকে চিনিয়ে দিক। নিরীহ একজন সিসমোলজিকাল বিজ্ঞানী হিসেবেই এখানে থাকতে চাই আমি।'

ফোনে কয়েকটা নির্দেশ দিল কমান্ডার হাম্মাম, তারপর রানার সাথে চলে এল নাফাজ মোহাম্মদের কামরায়।

নাফাজ মোহাম্মদ ফোনে কথা বলছেন, গম্ভীর গলায় হুঁ-হাঁ করছেন শুধু। শিরি ফারহানাকেও গম্ভীর দেখাচ্ছে। রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিল সে। বলল, 'এই যে বীর পুরুষ, প্ল্যাটফর্মটাকে রক্তে ভাসিয়ে আসা হলো বুঝি?'

ধনীর দুলালী, মুখে কিছুই আটকায় না, একটু বিরক্ত হলেও, শিরির আচার-ব্যবহারের পেছনে আরেকটা মজার ব্যাপারও লক্ষ করছে রানা। মুখে যাই বলুক, ওর চোখ দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, মনে মনে রানাকে সে শুধু শ্রদ্ধা নয়, রীতিমত ভক্তি করতে শুরু করেছে। স্বভাবে একটু চপলতা আছে এই যা। মনের ভেতর কোন ঘোরপ্যাঁচ নেই, সরল মেয়ে, কিন্তু দস্যি। ওর কথায় বা আচরণে মনে করার কিছু নেই আসলে।

'আমার ওপর অন্যায় করছ তুমি,' বলল রানা। 'আর কেউ থাকলে তো খুন করব!'

নিঃশব্দে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল শিরি।

'সাগর কন্যা এখন আমাদের হাতে, লেডী ফারহানা,' বলল কমান্ডার হাম্মাম। 'মিনিট দশেকের মধ্যে ছোট্ট আরেকটা ঝামেলা ঘাড়ে চাপবে আমাদের, কিন্তু সেটা আমরা অনায়াসে সামলে নিতে পারব।'

রিসিভার রেখে দিয়ে জানতে চাইলেন নাফাজ মোহাম্মদ, 'তার মানে?'

'হেলিকপ্টারে করে কিছু লোক পাঠাচ্ছে হেকটর। বেশি নয়, আট কিংবা নয় জন। কোন সুযোগ পাবে না ওরা। হেকটরের ধারণা, সাগর কন্যা এখনও কভির মুঠোয় রয়েছে।'

'আসল ঘটনা তা নয়, বলতে চাইছ?'

'এখনও জ্ঞান ফেরেনি কভির, স্যার,' বলল কমান্ডার। 'টেসিওরও। দু'জনকেই নাইলনের রশি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে।'

স্বস্তির একটা ভাব ফুটে উঠল নাফাজ মোহাম্মদের চেহারায়। জানতে চাইলেন, 'ওদের সাথে কি হেকটরও আসছে?'

'না।'

নিরাশ হলেন নাফাজ মোহাম্মদ, 'আমার দুর্ভাগ্য। আরও খারাপ খবর আছে। ট্যাঙ্কার রকেটে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিয়েছে।'

'স্যাবোটাজ?' গম্ভীর স্বরে জানতে চাইল রানা। সাউল শিপিং লাইনসের ট্যাঙ্কার ওটাও।

'না। এঞ্জিনের মেইন ফুয়েল সাপ্লাই লাইন ফেটে গেছে। সাময়িকভাবে অচল হয়ে গেছে। ছোট্ট একটা গোলযোগ, কিন্তু কয়েক ঘণ্টা লেগে যাবে মেরামত করতে। অবশ্য দুশ্চিন্তার কিছু নেই, মেরামতের কাজ কতদূর এগোল তা ওরা আমাকে আধঘণ্টা পর পর জানাবে।'

উদ্বিগ্ন বোধ করার আরেকটা কারণ ঘটেছে। মেরিন বীমা কোম্পানীগুলো এবং লন্ডনের লয়েড'স্ জানিয়ে দিয়েছে সানলাইট নামে কোন জাহাজের অস্তিত্ব কোথাও নেই। আরও উদ্বেগের ব্যাপার, মেরিন গালফ্ কর্পোরেশন নৌ-পুলিসকে রিপোর্ট করেছে ফ্রী পোর্ট থেকে তাদের একটা সিসমোলজিকাল সার্ভে জাহাজ নিখোঁজ হয়ে গেছে। জাহাজটার নাম ড্যান্সার।

অপরদিকে, স্বস্তি বোধ করার মত দুটো খবর পাওয়া গেছে ইউ. এস. নেভির কাছ থেকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার বাতিল সাবমেরিনগুলো হয় ভেঙেচুরে লোহা হিসেবে মণ দরে নয়তো অন্যকোন রাষ্ট্রের কাছে বিক্রি করে দেয়। আজ পর্যন্ত একটা সাবমেরিনও কোন কমার্শিয়াল কোম্পানী বা কোন ব্যক্তি বিশেষের হাতে পড়েনি। তাছাড়া, এই মুহূর্তে গালফ্ কোস্ট বরাবর কোন বৈরী রাষ্ট্রের এমন কোন জাহাজ নেই যেটা পানির নিচে ডুব দিতে পারে।

হঠাৎ টেলিফোন কল আপ বেলটা ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল। ওয়াল রিসিভারের সুইচ অন করলেন নাফাজ মোহাম্মদ। রেডিও অফিসার দ্রুত উত্তেজিত, সংক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে জানাল, 'হেলিকপ্টার, নিচু দিয়ে আসছে, উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে, পাঁচ মাইল দূরে।'

'তবু যাই হোক আমাদের অনুকূলে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে,' বলল কমান্ডার হাম্মাম। রানার দিকে তাকাল সে। 'চলুন, স্যার।'

'আপনি যান, আসছি আমি,' বলল রানা। 'ছোট্ট একটা নোট লিখতে হবে আমাকে, মনে নেই?'

'ও হ্যাঁ,' বলল কমান্ডার, 'তাই তো।' কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে।

একটা কলম দিয়ে গোটা গোটা অক্ষরে কিছু লিখল রানা, সংক্ষিপ্ত আর সহজ ভাষায়, যাতে অর্থ উদ্ধারে ভুল করার কোন অবকাশ না থাকে। কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রাখল ও। তারপর এগোল দরজার দিকে।

'প্ল্যাটফর্মে তোমাদের সাথে থাকতে পারি আমি?' জানতে চাইলেন নাফাজ মোহাম্মদ।

দরজার কাছে ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'বিপদের কোন আশঙ্কা আছে, ব্যাপারটা তা নয়,' বলল ও। 'এখানেই যথেষ্ট কাজ রয়েছে আপনার। রাডার, রেডিও,

সোনার আর অ্যাঙ্কোরিং কেবল্-এর সাথে লাগানো সেনসরি ডিভাইসের মনিটরিং শোনার কাজটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এখন।'

'ঠিক বলেছেন। ধন্যবাদ। তাছাড়া, স্টেট ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারিকে ডেকে জিজ্ঞেস করার সময় হয়েছে, আমার ঘাড়ের ওপর থেকে যুদ্ধ-জাহাজগুলোকে সরিয়ে নেবার ব্যাপারে কতদূর কি করতে পারল সে।'

মিনতির সুরে বলল শিরি ফারহানা, 'বিপদের কোন ভয় নেই বলছেন, মাসুদ ভাই, আমি তাহলে আসি আপনার সাথে?'

'না।'

নিমেষে বদলে গেল মূর্তি। দুই কোমরে হাত রেখে জানতে চাইল শিরি, 'কেন?'

মুচকি হেসে বলল রানা, 'হিরোইনের ভূমিকা ত্যাগ করে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের ভূমিকাটা নাও—সিক বেতে অত্যন্ত অসুস্থ একজন লোক রয়েছে, তোমার সেবা তার দরকার।'

হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরে পেয়েছে, এমন একটা ভাব ফুটে উঠল শিরির চেহারায়। নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল সে, তারপর প্রায় ছুটে চলে গেল সিক বের দিকে।

ব্যাপারটা লক্ষই করলেন না নাফাজ মোহাম্মদ। ফোনের রিসিভার তুলে কথা বলছেন তিনি হেড ড্রিলার বাবাল লোয়াঙ্গোর সাথে। নির্দেশ দিচ্ছেন, ক্রিস্টমাস ট্রী আবার চালু করো, তেল ভাণ্ডার অনুসন্ধানের জন্যে শুরু করো ড্রিলিং।

সাগর কন্যা। হেলিপ্যাড।

হেলিকপ্টারটা নামছে। অ্যাকোমোডেশন এরিয়ার গাঢ় ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে জিউসেপ বারজেন আর তার দলবল। কমান্ডার হাম্মামের সাথে চাপা গলায় কথা বলছে সে। এই সময় পৌঁছুল রানা।

প্ল্যাটফর্মের আলো একেবারে নিভিয়ে দেয়া হয়নি, কিন্তু কমিয়ে এনে ম্লান করে রাখা হয়েছে। তবে হেলিপ্যাডের আলো জ্বলছে, উজ্জ্বল ড্যান্স ফ্লোরের মত দেখাচ্ছে সেটাকে। ছয়টা সার্চলাইট বাছাই করা জায়গায় বসিয়ে রেখেছে বারজেনের লোকেরা। রানার দিকে তাকাল বারজেন, মাথা ঝাঁকিয়ে নিঃশব্দে অনুমতি দিল তাকে রানা। শান্তভাবে এগোল বারজেন হেলিপ্যাডের দিকে। তার হাতে একটা এনভেলাপ দেখা যাচ্ছে।

'কপ্টারটা নামল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে খুলে গেল দরজা। লোকজন নামছে। প্রত্যেকের হাতে অটোমেটিক কারবাইন। 'আমি ম্যাকক্লাস্কি,' বলল বারজেন। 'তোমাদের লীডার কে?'

'আমি,' প্রকাণ্ড গরিলা সবাই, তাদের মধ্যে থেকে একজন এগিয়ে এসে দাঁড়াল বারজেনের সামনে, 'ম্যারিনো।' বাঘের মত চেহারা লোকটার। 'কন্তি কোথায়? তারই তো এখানে চার্জে থাকার কথা।'

'সেই চার্জে আছে,' বলল বারজেন। 'এই মুহূর্তে নাফাজ মোহাম্মদের সাথে তর্ক হচ্ছে তার। তোমাদের জন্যে নাফাজ মোহাম্মদের কোয়ার্টারে অপেক্ষা করছে

সে।'

'ডেক লাইটের এই অবস্থা কেন?'

'ভোল্টেজ ড্রপ। অসুবিধে হবে না, ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। হেলিপ্যাডগুলোর নিজস্ব জেনারেটর আছে।' হাত তুলে অ্যাকোমোডেশন এলাকাটা দেখাল বারজেন। 'ওদিকে।'

মাথা ঝাঁকাল ম্যারিনো, পিছনে আটজন গরিলাকে নিয়ে এগোল সে। বারজেন বলল, 'এক মিনিটের মধ্যে আসছি আমি। মি. হেকটরের একটা সিক্রেট মেসেজ দিতে হবে পাইলটকে।'

হেলিকপ্টারে উঠল বারজেন। পাইলটের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচিয়ে বলল, 'হ্যালো! মি. হেকটর একটা জরুরী মেসেজ পাঠিয়েছেন তোমাকে।'

আশ্চর্য হয়ে পাইলট বলল, 'কিন্তু আমাকে তো সাথে সাথে ফিরে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে?'

'তাই যাবে। কিন্তু মেসেজটা আগে পড়ে নাও। নাফাজ মোহাম্মদ আর তার মেয়েকে দেখার সাধ জেগেছে মি. হেকটরের মনে,' কথা শেষ করে নিঃশব্দে হাসল বারজেন।

পাইলটও হাসছে। বারজেনের হাত থেকে এনভেলাপটা নিল সে। খুলল। ভেতরের কাগজের টুকরোটা দেখল। একপিঠে কিছু লেখা নেই। উল্টাল সেটা। অপরপিঠেও কিছু লেখা নেই। অবাক বিস্ময়ে মুখ তুলে তাকাল সে। 'মানে?'

'এইটা,' ছোট কামানের মত একটা পিস্তল দেখাল পাইলটকে বারজেন। 'চুপ! নড়লেই গুলি।'

ঠিক এই সময় দপ্ করে নিভে গেল প্ল্যাটফর্মের আলো। প্রায় সাথে সাথে, এক সেকেন্ড পর, একযোগে জ্বলে উঠল শক্তিশালী ছয়টা সার্চ লাইট। লাউড-হেইলারে কঠোর নির্দেশ শোনা যাচ্ছে কমান্ডার হাম্মামের, 'হাতের অস্ত্র ফেলে দাও। নইলে রক্ষা পাবে না একজনও।'

ম্যারিনোর একজন গরিলা আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার পরিচয় দিল। কমান্ডারের কথা শেষ হবার আগেই বিদ্যুৎ খেলে গেল তার শরীরে। ডাইভ দিয়ে দড়াম করে পড়ল ডেকের উপর, এরই মধ্যে তার সাব-মেশিন গানের নল থেকে একটা রেখা টেনে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে ব্রাশ ফায়ারের ঝাঁক ঝাঁক বুলেট। একটা সার্চলাইট চুরমার করে দিল সে। নিজের এই সাফল্য দেখে লোকটা যদি আদৌ কোন রকম সন্তোষ বোধ করে থাকে তা বড় জোর এক সেকেন্ডের একশো ভাগের এক ভাগ সময় পর্যন্ত স্থায়ী হলো, সার্চলাইটের ভাঙা কাঁচ প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে পড়ার আগেই বারজেনের লোকেরা ঝাঁঝরা করে দিল তার খুলি আর বুক। বাকি সবকজন গরিলা তাদের হাতের অটোমেটিকগুলো ফেলে দিতে দ্বিধা করল না।

একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলল বারজেন। পাইলটকে বলল, 'দেখলে তো? মরে গিয়ে কোন লাভ হলো লোকটার? এসো।'

পাইলটসহ আটজন লোককে একটা জানালাহীন স্টোর রূমে নিয়ে যাওয়া হলো। প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি রশি খরচ করতে কুণ্ঠিত হলো না বারজেন। সবার হাত-পা শক্ত করে বাঁধা তো হলোই, তারপর আটজনকে একসাথে জড়িয়ে

আবার বাঁধা হলো। বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে তালা মেরে দেয়া হলো দরজায়। নয় নম্বর গরিলা, ম্যারিনোকে নিয়ে আসা হয়েছে রেডিওরুমে। একটু পরই সেখানে হাজির হলো রানা।

সম্পূর্ণ নতুন বেশভূষা এখন রানার পরনে। একটা বয়লার স্যুট পরেছে ও, মুখ ঢাকা পড়ে আছে একটা মেকশিফট হুডে। হুডটা থাকায় ওর কণ্ঠস্বরও অন্য রকম শোনাবে। সম্ভাব্য সব উপায়ে নিজের পরিচয় গোপন রাখতে চেষ্টা করছে রানা।

নোট লেখা কাগজটা পকেট থেকে বের করল রানা। পয়েন্ট থারটি-এইটের মাজল্ ম্যারিনোর ঘাড়ের গোড়ায় চেপে ধরল। হেকটরের সাথে যোগাযোগ করে কাগজে লেখা মেসেজটা পড়ার নির্দেশ দিল ও ম্যারিনোকে। বলল, 'যা লেখা রয়েছে তা ছাড়া একটা শব্দও যেন মুখ ফস্কে বেরিয়ে না আসে। জোরে একটা নিঃশ্বাস পর্যন্ত নয়। তার মানে, কোন চালাকি করতে গেলেই উড়িয়ে দেব খুলি। সাইলেন্সার তো দেখতেই পাচ্ছ।'

প্রকাণ্ডদেহী ম্যারিনো অভিজ্ঞ লোক, শত্রুর চোখ দেখেই বুঝে নিতে পারে খুন করার সংকল্প কতটুকু দৃঢ়। রানার চোখে সেই সংকল্পে কোন খাদ দেখছে না সে। অনিচ্ছার সাথে নয়, সহযোগিতার ভঙ্গিতে যোগাযোগ করল সে হেকটরের সাথে, বলল, সব ঠিক আছে এদিকে। পুরো হাতের মুঠোয় রেখেছে কন্ডি সাগর কন্যাকে। কিন্তু ল্যান্ড করার সময়, শেষ মুহূর্তে, এঞ্জিনে গোলযোগ দেখা দেয়ায় আন্ডার-ক্যারিজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে মেরামতের জন্যে।

এতটুকু উদ্বিগ্ন মনে হলো না হেকটরকে। ম্যারিনোর মাধ্যমে কন্ডিকে কিছু উপদেশ দিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল সে।

নাফাজ মোহাম্মদের কেবিন।

কমান্ডার হাম্মামকে সাথে নিয়ে ভিতরে ঢুকে আগের চেয়ে খুশি দেখছে নাফাজ মোহাম্মদকে রানা। খুশির কারণ, পেন্টাগন থেকে খবর এসেছে, কিউবা আর ভেনিজুয়েলান নৌ-বাহিনীর দুটো যুদ্ধ-জাহাজই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে পানিতে। হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, পরবর্তী নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা।

আরেকটা ভাল খবর, জানাচ্ছেন নাফাজ মোহাম্মদ, ট্যাঙ্কার রকেট আবার তার যাত্রা শুরু করেছে। আশা করা যাচ্ছে, নব্বুই মিনিটের মধ্যে গলভেস্টনে পৌঁছে যাবে সে।

কিন্তু, নাফাজ মোহাম্মদের জানার কথা নয় যে ট্যাঙ্কার রকেট এই মুহূর্তে গলভেস্টনের কাছ থেকে কয়েকশো মাইল দূরে রয়েছে। শুধু তাই নয়, ফুল স্পীডে এখনও সে গলভেস্টনের কাছ থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে, শান্ত সাগরের উপর দিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে।

কেবিনে ঢুকল শিরি ফারহানা। 'গুলির আওয়াজ শুনেছি আমি,' বলল সে। 'ব্রাশ ফায়ার। মনে হলো দুই তরফ থেকেই। ক'জন মরল এবার?'

'মেহমানরাই প্রথম গুলি করে জানান দিল যে তাদের কাছে অস্ত্র আছে,' বলল রানা। 'পাল্টা গুলি করে ওদেরকে জানিয়ে দেয়া হলো যে আমরাও নিরস্ত্র নই। কেউ মরেনি, কেউ আহত হয়নি। আমরা ওদেরকে বন্দী করেছি।'

'নিশ্চয়ই কোন স্টোররূমে, যেখানে কোন জানালা নেই? ওরা অক্সিজেন পাবে কোথা থেকে?'

'বাচাল মেয়ে, বেশি কথা বোলো না তো,' বললেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'কমান্ডারের সাথে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আলোচনা করব এখন আমি।'

'চলো, আমরা বরং অসুস্থ বিজ্ঞানীকে হেলিকপ্টারে তুলে দিয়ে আসি,' বলল রানা।

তীব্র দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল শিরি। কৃত্রিম ভয়ে একটু আঁতকে ওঠার ভান করল রানা, ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে এল কেবিন থেকে। পিছনে পায়ের শব্দ পাচ্ছে ও।

সিক-বে থেকে স্ট্রেচারের পিছু পিছু হেলিকপ্টারের কাছে এল ওরা। একান্তে কিছু কথা বলল রানা আনিসের সাথে। রানা পিছিয়ে আসতে এগিয়ে গেল শিরি। আনিসের কপালে চুমো খেল সে। নিচু গলায় বলল, 'এখনও সময় আছে, আনিস। আসব তোমার সাথে?'

হাসছে আনিস। বলল, 'না। আমি চাই মাসুদ ভাইয়ের কাছে থেকে কিছু অভিজ্ঞতা হোক তোমার। এই ধরনের সুযোগ আবার কবে পাবে, আদৌ পাবে কিনা কে জানে। আমার উপযুক্ত স্ত্রী হতে হলে আমার পেশা সম্পর্কেও কিছু জ্ঞান থাকা দরকার তোমার। তোমাকে আমার যোগ্য সহকারিণী হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। সেজন্যেই মাসুদ ভাইয়ের কাছে রেখে যাচ্ছি তোমাকে। তোমার নিরাপত্তার কথা ভেবে কোনও দুশ্চিন্তা নেই আমার মনে। মাসুদ ভাই যা বলবেন, বিনা তর্কে মেনে নেবে তুমি, কেমন?'

'আচ্ছা,' বলে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিল শিরি কথাটা রানা শুনতে পেল কিনা।

প্রথমে স্ট্রেচার তোলা হলো 'কপ্টারে। তারপর ডাক্তার কিপলিং উঠলেন। কন্ডি আর টেসিওর হাতে ইস্পাতের তৈরি হাতকড়া পরানো রয়েছে। তাদের পিছু পিছু উঠল বারজেনের একজন লোক, তার কাঁধে কারবাইন, পকেটে পিস্তল। বাঁ হাতে ধরে রয়েছে দুটো লোহার চেইন, সেগুলোয় তালা মারার ব্যবস্থা আছে। 'কপ্টারে ওঠার পর কন্ডি আর টেসিওর পা বাঁধা হবে এই চেইনগুলো দিয়ে। বারজেনের লোকটাকে আড়ালে ডেকে ছোট্ট একটা নির্দেশ দিয়ে রেখেছে রানা। 'কপ্টারে চড়ার পর কন্ডি আর টেসিওকে অজ্ঞান করে রাখবে বারজেনের লোকটা। কোন রকম ঝুঁকি নিতে চায় না রানা, সেজন্যেই এই নির্দেশটা দিয়েছে ও।

সবাই 'কপ্টারে উঠে পড়েছে, কিন্তু এখনও দরজাটা বন্ধ হয়নি, শিরিকে বলল রানা, 'শেষ সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে, এখনও ভেবে দেখো। যাবে?'

'আর কোন কথা আছে?' হাসছে শিরি। 'এক কথা বারবার শুনতে ভাল লাগে না আমার।'

টেক-অফ করল হেলিকপ্টার। একটা চক্কর মেরে মেইন ল্যান্ডের দিকে এগোচ্ছে সোজা। সন্তুষ্ট চিত্তে পা বাড়াল রানা, পেছনে শিরি।

কিন্তু নাফাজ মোহাম্মদের কেবিনে এসে সন্তুষ্ট ভাবটা ম্লান হয়ে গেল ওদের চেহারা থেকে। কমান্ডার হাম্মাম এবং নাফাজ মোহাম্মদ, দু'জনেই আলাদা আলাদা রিসিভারে কথা বলছে। দু'জনের চেহারাতেই গাম্ভীর্য আর হতাশার ভাব।

দু'জনেই ওরা অতিরিক্ত ট্যাঙ্কার ভাড়া করার চেষ্টা করছে, কিন্তু কোথাও কোন সুবিধে করতে পারছে না। দক্ষিণ উপকূলে এই মুহূর্তে ছয় ছয়টা খালি পঞ্চাশ হাজার টনের ডি-ডব্লিউ ট্যাঙ্কার রয়েছে, কিন্তু সেগুলো সবই বড় বড় তেল কোম্পানীর ট্যাঙ্কার, দরকার হলে বিনা পয়সায় অন্য যে-কোন ব্যবসায়ীকে সাময়িক কাজ চালাবার জন্যে সবগুলো দেবে তারা, কিন্তু নাফাজ অয়েল কোম্পানীর শত অনুরোধ বা তিন গুণ বেশি ভাড়াতেও একটা ট্যাঙ্কার দেবে না। এরাই তো নাফাজ মোহাম্মদের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে। কাছাকাছি মাপের ট্যাঙ্কার রয়েছে ব্রিটেন, নরওয়ে আর মেডিটারেনিয়ানে, কিন্তু ওই সব জায়গা থেকে চার্টার করে নিয়ে আসা প্রচুর সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, খরচও পড়ে যাবে অনেক বেশি। সাউল শিপিং লাইনসের পঞ্চাশ হাজার টনী ট্যাঙ্কার কাছে পিঠে অন্তত গোটা দশেক রয়েছে, কিন্তু বোর্ড অব ডিরেক্টরের চেয়ারম্যান মি. মাসুদ রানাকে জিজ্ঞেস না করেও নাফাজ মোহাম্মদ খবর পেয়েছেন সেগুলো এই মুহূর্তে সমস্ত চার্টার বাতিল করে দিয়ে সশস্ত্র কোস্ট গার্ড ঘাঁটিতে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছে। বিপদের আশঙ্কা থাকায় এই সিদ্ধান্ত মি. রানাই নিয়েছেন, সে-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই নাফাজ মোহাম্মদের মনে। এই পরিস্থিতিতে তিনি মি. রানাকে তাঁর ট্যাঙ্কার ভাড়া করার প্রস্তাব দিতে পারেন না। এরই মধ্যে দু'দুটো ট্যাঙ্কার হারিয়েছেন ভদ্রলোক।

কমান্ডারের সাথে সুপার-ট্যাঙ্কার চার্টার করার বিষয়েও আলোচনা করলেন নাফাজ মোহাম্মদ। প্রস্তাবটা সঙ্গত কারণেই সাথে সাথে বাতিল করে দিল কমান্ডার। তেল পরিবহনের সামগ্রিক পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে সুপার-ট্যাঙ্কার ভাড়া করতে হলে অস্বাভাবিক বেশি দর দিতে হবে, অথচ তাদের কাজের জন্যে ওই বিশাল আকারের ট্যাঙ্কার-এর কোন প্রয়োজন নেই। নাফাজ অয়েল কোম্পানীর নিজস্ব সুপার-ট্যাঙ্কার রয়েছে, সেগুলোর একটা এদিকে এনে কাজে লাগানো যায় কিনা তাও বিবেচনা করে দেখা হলো। কিন্তু তবু কোন সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব হলো না। নিজস্ব সুপার-ট্যাঙ্কারগুলো অনেকদূরে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত রয়েছে, সেখান থেকে নিয়ে আসতে গেলে লাভের চেয়ে লোকসান বেশি। তাছাড়া ভাসমান ট্যাঙ্ক থেকে যে পরিমাণ তেল খালাস করা হবে তা দিয়ে সুপার-ট্যাঙ্কারের চারভাগের একভাগ জায়গাও ভরবে না। সেদিক থেকে ভাবতে গেলেও সুপার-ট্যাঙ্কার ব্যবহার করা লোকসানের ব্যাপার। আরেকটা কথা বিবেচনা করে দেখার রয়েছে। রোবটের কপালে যা ঘটেছে তা একটা সুপার-ট্যাঙ্কারের কপালেও ঘটতে পারে। অত বড় ঝুঁকি না নেয়াই ভাল।

আরেকটা মেসেজ এল রকেট থেকে। অন টাইম অন কোর্স রিপোর্ট। জানাচ্ছে, এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে গলভেস্টনে। গম্ভীরভাবে বলল নাফাজ মোহাম্মদ, তবু যাহোক অন্তত দুটো ট্যাঙ্কার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কোন উপায় যখন নেই, এগুলোকেই দৌড় খাটিয়ে বাকি সবখানে তেল সরবরাহের কাজ করিয়ে নিতে হবে। এরই মধ্যে চারদিক থেকে অভিযোগ আসতে শুরু করেছে, সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায় অসন্তুষ্ট হচ্ছে পার্টিরা।

আরও আধ ঘণ্টা পর ট্যাঙ্কার রকেট তার পরবর্তী রিপোর্ট পাঠাল। গলভেস্টনে

পৌঁছুতে আর মাত্র ত্রিশ মিনিট দেরি। সব ঠিকঠাক মত চলছে মনে করে খুশি হলেন নাফাজ মোহাম্মদ।

কিন্তু খুশি হবার নয়, আঁতকে ওঠার মত ঘটনা তাঁর জন্যে আরও ঘটছে এই মুহূর্তে। অন্ধকার গভীর হয়ে এসেছে দেখে হেকটরের নির্দেশে সী-উইচের পাশ থেকে রওনা হয়ে গেছে ইলেকট্রিক পুল-পুশ ইউরেনাস। সোজা সাগর কন্যার দিকে এগিয়ে আসছে সেটা। এঞ্জিনগুলোকে চালু রেখেছে তার ইলেকট্রিক ব্যাটারি। সাগর কন্যার সোনার ডিভাইসে এর অস্তিত্ব ধরা পড়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম, নেই বললেই চলে।

ইউরেনাসে কয়েকজন দক্ষ ডাইভার রয়েছে। প্রচুর পরিমাণে মাইন, লিমপেট মাইন এবং অ্যামাটোল বীহাইভ নিয়ে আসছে ইউরেনাস। এই বিস্ফোরকগুলো লং ডিসট্যান্স রেডিওর সাহায্যে ফাটানো যায়।

আধ ঘন্টা পর। চূড়ান্ত সুখবর দিয়ে ট্যাঙ্কার রকেট রিপোর্ট করল, গলভেস্টনে পৌঁছেচে সে। এবার তেল খালাস করতে যা দেরি, সাথে সাথে ফিরতি পথে সাগর কন্যার দিকে রওনা হয়ে যাবে সে।

নাফাজ মোহাম্মদ কমান্ডার হাম্মামকে বললেন, এই মুহূর্তে গলভেস্টন পোর্ট কর্তৃপক্ষের সাথে ব্যক্তিগত ভাবে কথা বলতে চান তিনি। টাকা যত বেশি লাগে লাগুক, রকেটকে যেন সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে তেল খালাস করার সুযোগ দেয়া হয়। সিরিয়াল নাম্বার ধরে কার্গো খালাস করতে হলে অস্বাভাবিক বেশি সময় লেগে যায়, বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটা বরদাস্ত করা সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে।

যোগাযোগ করতে এক মিনিটের বেশি লাগল না। হারবার মাস্টারকে নিজের দাবি জানালেন নাফাজ মোহাম্মদ। আকাশ থেকে পড়ল হারবার মাস্টার। বলল, 'স্যার, আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'কোন্ ভাষায় বললে বুঝবে?' রেগেমেগে জানতে চাইলেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'ইংরেজি ছাড়াও আরও পাঁচটা ভাষা জানি আমি। শোনো, অযথা সময় নষ্ট না করে যা বলছি করো। আমার ট্যাঙ্কারকে তেল খালাস করার সুযোগ সবার আগে দিতে হবে। আমি চাই না...'

'স্যার...স্যার, আপনি বোধ হয় কোন মারাত্মক ভুল করছেন,' বলল হারবার মাস্টার। 'কিংবা আপনার তথ্যের মধ্যে সাংঘাতিক ভুল আছে। আপনার ট্যাঙ্কার রকেট বন্দরে তো এসেই পৌঁছায়নি এখনও।'

'কি বলছ তুমি? তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে...'

'এক সেকেন্ড, স্যার।'

এক সেকেন্ডের জায়গায় ত্রিশ সেকেন্ড পেরিয়ে গেল। উদ্বেগে ছটফট করছেন নাফাজ মোহাম্মদ। গম্ভীর মুখে বসে আছে রানা। সর্বনাশ যে আরও একটা ঘটে গেছে সে-ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত ও। ওর সন্দেহ, সাউল শিপিং লাইনস্ আরেকটা ট্যাঙ্কার হারিয়েছে। কেবিনের পরিবেশ বদলে যাবার সাথে সাথে শিরি ফারহানার মধ্যেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কখন কার কি দরকার হয়, পরিবেশনের জন্যে একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। এরই মধ্যে নাফাজ মোহাম্মদ আর রানাকে

পানীয় নিয়ে এসে দিয়েছে। বাবার পাইপে টোবাকো ভরে দিয়েছে। চুরুটের বাক্সটা এনে রেখেছে রানার কাছাকাছি।

হারবার মাস্টারের গলা পাওয়া গেল আবার, 'খারাপ খবর, স্যার। বন্দরে তো আপনার ট্যাঙ্কারের কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই-ই আমাদের রাডার স্ক্যানারেও ওই আকারের কোন জাহাজের অস্তিত্ব চল্লিশ মাইলের মধ্যে ধরা পড়ছে না।'

'তাহলে গেল কোথায় সেটা?' যত রাগ হারবার মাস্টারের ওপর ঝাড়ছেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'এই তো কয়েক মিনিট আগেও রিপোর্ট পেয়েছি তার কাছ থেকে।'

'ট্যাঙ্কারের নিজের কল-সাইনে?'

'অবশ্যই।'

'তাহলে চিন্তার তেমন কিছু নেই,' নাফাজ মোহাম্মদকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছে হারবার মাস্টার। 'অন্তত কোন দুর্ঘটনায় যে পড়েনি তা তো বোঝাই যাচ্ছে।'

'ঘোড়ার ডিম বোঝা যাচ্ছে!' রেগেমেগে রিসিভারটা রেখে দিলেন নাফাজ মোহাম্মদ। ধীরে ধীরে তাকালেন তিনি রানার দিকে।

গম্ভীর গলায় বলল রানা, 'হ্যাঁ, আরেকটা ট্যাঙ্কার হারিয়েছি আমি।'

'আপনার এ-কথা বলার কারণ?' তীক্ষ্ণ গলায় জানতে চাইলেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'আমার ধারণা, রকেটের ক্যাপ্টেন কোন ভুল করেছে।'

'আমার বিশ্বাস অন্য রকম। ক্যাপ্টেন তার নিজের জাহাজেরই একটা স্টোররূমে বন্দী হয়ে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে।'

'আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।'

চুরুটে আগুন ধরাচ্ছে রানা। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'বাস্তবকে মেনে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, মি. নাফাজ। ঘটতে তো কিছুই বাকি থাকছে না, একটা ট্যাঙ্কার হাইজ্যাক হওয়াটা কি আর এমন বিচিত্র, বলুন?'

'হাইজ্যাক? হাইজ্যাক?' চেঁচিয়ে উঠলেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'আপনার কি মাথা খারাপ হলো? ট্যাঙ্কার হাইজ্যাক হবার কথা কে কবে শুনেছে?'

'জাম্বো জেট হাইজ্যাক হবার আগে পর্যন্ত কে কবে শুনেছে যে একটা জাম্বো জেট হাইজ্যাক হয়েছে?' বলল রানা।

'কিন্তু রোবটের কপালে কি ঘটেছে তা জানার পর রকেটের ক্যাপ্টেন কোন জাহাজকে তার ধারে কাছে ঘেঁষতেই দেবে না, হাইজ্যাক হবে কিভাবে?'

'কোন জাহাজকে কাছে ঘেঁষতে দেবে না, কথাটা ঠিক নয়,' বলল রানা। 'জাহাজটা যদি নৌ-বাহিনীর হয়? অথবা যদি কোস্টগার্ড হয়?' নাফাজ মোহাম্মদকে নিরুত্তর দেখে আবার বলল ও, 'আমরা শুনেছি, মেরিন গালফ্ কর্পোরেশন তাদের একটা সার্ভে জাহাজ হারিয়ে ফেলেছে। বাতিল কোস্টগার্ড জাহাজগুলোই শেষ পর্যন্ত সার্ভে জাহাজে রূপান্তরিত হয়, এ-কথা আপনিও জানেন। এই সার্ভে জাহাজগুলোয় হেলিপ্যাড থাকে, হেলিকপ্টারের সাহায্যে সিসমোলজিক্যাল প্যাটার্ন বম্বিংয়ের ফলাফল পর্যবেক্ষণ করার জন্যে। নিখোঁজ জাহাজটার নাম ড্যাঙ্গার। সবখানে লোক আছে আপনার, যোগাযোগ আছে, ইচ্ছা করলে আসল ঘটনা জেনে

নিতে কয়েক মিনিটের বেশি লাগবে না আপনার।'

সত্যি কয়েক মিনিটের বেশি লাগল না। রিসিভার নামিয়ে রেখে নাফাজ মোহাম্মদ বললেন, 'আপনার কথাই ঠিক। সাবেক আমলে ড্যাঙ্গার একটা কোস্টগার্ড কাটারই ছিল। তার মানে ড্যাঙ্গারের নাম বদলে সেটার নতুন নামকরণ করা হয়েছে সানলাইট। গলভেস্টন থেকে হেকটর এই সানলাইট নিয়েই রওনা হয়েছে। এখন শুধু খোদাই বলতে পারেন সানলাইটের আবার নতুন কি নাম রেখেছে শয়তানটা। এরপর কি, তাই ভাবছি আমি!'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা, তারপর বলল, 'এরপর সম্ভবত হেকটর কথা বলতে চাইবে আপনার সাথে।'

'কেন? কি বলার আছে তার আমাকে?'

'হয়তো কোন দাবি জানাবে,' বলল রানা। 'ঠিক জানি না।'

কিন্তু এত সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নন নাফাজ মোহাম্মদ। ট্যাঙ্কার রকেটের খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত মনে শান্তি নেই তাঁর। রকেটের যদি কিছু হয়, ক্ষতিটা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে স্বীকার করতে হবে। তার কারণ, বেশ কিছু দিন আগে সাউল শিপিং লাইনসের একটা ট্যাঙ্কার আগুন লেগে ডুবে যাবার পর তাঁর সাথে ওই কোম্পানীর নতুন চুক্তি হয়েছে, সেই চুক্তির এক নম্বর শর্ত হলো, চার্টার করা ট্যাঙ্কারের কোন ক্ষতি হলে সাউল শিপিং লাইনসকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, নয়তো নতুন একটা ট্যাঙ্কার কিনে দিতে হবে। এই শর্ত পূরণ করা না হলে সাউল শিপিং লাইনস নাফাজ অয়েল কোম্পানীর বিরুদ্ধে কোর্টে কেস করতে পারবে।

প্রভাবশালী, ক্ষমতাবান বন্ধুর কোন অভাব নেই নাফাজ মোহাম্মদের। ওয়াশিংটনের সাথে আবার যোগাযোগ করলেন তিনি। এবার ন্যাভাল হেড কোয়ার্টারের একজন অ্যাডমিরালের সাথে। অ্যাডমিরাল তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু। অনুরোধ নয়, নাফাজ মোহাম্মদ অ্যাডমিরালের কাছে দাবি জানালেন, সময় এমনিতেই যথেষ্ট নষ্ট হয়েছে, আর কোন রকম দেরি সহ্য হবে না তাঁর, সংশ্লিষ্ট এলাকায় এয়ার-সী সার্চের ব্যবস্থা করা হোক। এখুনি। এই মুহূর্তে। নৌ-দফতর সবিনয়ে তাঁকে জানাল, এ-ধরনের কিছু একটা করতে হলে কমান্ডার-ইন-চীফের অনুমতি লাগবে তাদের। কমান্ডার-ইন-চীফ, অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট স্বয়ং। প্রেসিডেন্ট, সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানা গেল, ব্যাপারটাকে অত্যন্ত হালকাভাবে নিয়েছেন এবং সৌজন্য সহকারে এড়িয়ে গেছেন। তাছাড়া, এই মুহূর্তে, তিনি অত্যন্ত জরুরী একটা মীটিংয়ে বসার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, সুতরাং তাঁকে বলার অবকাশই পাওয়া যায়নি যে দেশের একজন কোটিপতি তাঁর সাথে ব্যক্তিগত ব্যাপারে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে কথা বলতে চান।

কংগ্রেসের ঘুম ভাঙাতে চেষ্টা করলেন নাফাজ মোহাম্মদ। কিন্তু কংগ্রেস তেল খনি মালিকদের কোন অভিযোগ শুনতে পর্যন্ত রাজী নয়। কারণ, এই তেল ব্যবসায়ীরাই তো দেশটার অর্থনীতির ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে রেখেছে। নাফাজ অয়েল কোম্পানী যে সরকারকে সবচেয়ে কম দামে তেল দিচ্ছে, এ-কথা বলেও তেমন কোন সুবিধে আদায় করা গেল না। তাছাড়া, নাফাজ মোহাম্মদকে জানানো

হলো, কংগ্রেস যদি কোন সুপারিশ করেও, তা করতে অন্তত চার-পাঁচ দিন সময় লাগবে। এবং, শেষ পর্যন্ত হয়তো সিদ্ধান্ত নেয়া হবে, এ-ব্যাপারে নাক গলাবার অধিকার কংগ্রেসেরও নেই। কারণ, সংশ্লিষ্ট এলাকাটা রাষ্ট্রীয় সীমানার বাইরে, বা প্রায় বাইরে। যদি বা সার্চের ব্যবস্থা নেয়া হয়, নৌ-বাহিনী ওই এলাকার শতাধিক জাহাজকে তাদের রাডারে ধরতে পারবে, কিন্তু নির্দিষ্ট ভাবে নিখোঁজ জাহাজটাকে চিহ্নিত করা তাদের পক্ষেও সম্ভব হবে না।

এবার সি.আই.এ-র কাছে ধরণা দিলেন নাফাজ মোহাম্মদ। তাদের অনীহার পরিমাণ আরও বেশি দেখা গেল। গত কয়েক বছর ধরে জনসাধারণের কামড় খেয়ে তাদের শরীরে এত বেশি ঘা আর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে যে সেগুলো সারাতেই তারা অত্যন্ত ব্যস্ত, অন্য কোন দিকে খেয়াল দেবার সময়ই তাদের নেই।

এফ.বি.আই. নীরস ভঙ্গিতে জানিয়ে দিল, তারা শুধু দেশের ভেতরকার সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে থাকে। তাছাড়া, প্রতিষ্ঠানটার জলাতঙ্ক রোগ আছে বললেও অত্যুক্তি হয় না, পানি দেখলে ভয় পায় তারা।

শেষ পর্যন্ত, মরিয়া হয়ে, নাফাজ মোহাম্মদ সিদ্ধান্ত নিলেন জাতিসংঘের শরণাপন্ন হবেন তিনি। অনেক কষ্টে একটা হাসি দমন করে রানা তাঁকে নিষেধ করল। গম্ভীরভাবে কমান্ডার হাম্মামও তাঁকে নিরুৎসাহিত করল। কারণ, ব্যাখ্যা করে বলল রানা, এ-ধরনের কোন ব্যাপারে নাক গলাবার আইনসঙ্গত অধিকার জাতিসংঘের নেই। তাছাড়া, এই মুহূর্তে গোটা জাতিসংঘে কেউ নাফাজ মোহাম্মদের জন্যে জেগে বসে নেই, সবাই নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে।

হতাশায় প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন নাফাজ মোহাম্মদ। জীবনে কখনও কোন ব্যাপারে পরাজয় স্বীকার করেননি তিনি, কিন্তু আজ বুঝি তাঁকে পরাজয়ই স্বীকার করে নিতে হবে। কোন দিক থেকেই কোন সাহায্যের আশা দেখছেন না তিনি।

রেডিও-ফোনে একটা ভয়েস-ওভার কল এল। রানার কথাই ফলল। নাফাজ মোহাম্মদের সাথে কথা বলতে চায় জন হেকটর। অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাল সে, ট্যাঙ্কার রকেটের ব্যাপারে নাফাজ মোহাম্মদ যেন কোন রকম উদ্বেগ বোধ না করেন, কারণ সেটা ভাল লোকের হাতে নিরাপদ জায়গাতেই আছে।

'কোথায়?' সামনে মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তা না হলে বিশ্রী একটা গালি দিতেন হেকটরকে নাফাজ মোহাম্মদ।

'কোথায় বলতে আপত্তি নেই,' বলল হেকটর, 'জায়গাটার বিশদ বর্ণনা দিতে আপত্তি আছে আমার।'

'কোথায়?' প্রচণ্ড রাগে হুঙ্কার ছাড়লেন আবার নাফাজ মোহাম্মদ।

'সেন্ট্রাল আমেরিকার একটা বন্দরে,' হাসির সুর হেকটরের কণ্ঠে। 'এই দেশটা তেলের অভাবে সাংঘাতিক কষ্ট পাচ্ছে, তাই ঠিক করেছি, রকেটের তেল এদেরকে দান করে দেব।' আসলে কারও সাথে মৌখিক একটা চুক্তি হয়ে গেছে হেকটরের, রকেটের তেল চলতি বাজার দরের চেয়ে অর্ধেক দামে কিনে নেবে সে। তাও কয়েক শো হাজার ডলার আসবে হেকটরের পকেটে। '...তারপর,' বলছে হেকটর, 'ট্যাঙ্কারটাকে মাঝ সাগরে নিয়ে গিয়ে একশো ফ্যাদম পানির নিচে ডুবিয়ে দেব, যদি না...'

'যদি না···কি?' রিসিভার ধরা হাতটা একটু একটু কাঁপছে নাফাজ মোহাম্মদের।
'যদি না ক্রিস্টমাস ট্রী বন্ধ করা হয়, যদি না সমস্ত ড্রিলিং আর পাম্পিং বন্ধ করা হয়। এবং, এটাই সবচেয়ে জরুরী, যদি না সাগর কন্যায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয় মাসুদ রানাকে।'
'বোকার মত কথা বলছ তুমি, হেকটর। তোমার লোকেরা এরই মধ্যে বন্ধ করে দিয়েছে ক্রিস্টমাস ট্রী। সমস্ত পাম্পিং আর ড্রিলিঙের কাজও বন্ধ।'
'আমি প্রমাণ চাই,' বলল হেকটর। 'আমার লোককে ডাকা হোক, তার সাথে কথা বলতে হবে আমাকে। কিন্তু তার আগে, মাসুদ রানা। কোথায় সে? আমি তার কোন সন্ধান পাচ্ছি না কেন?'
'কার কথা বলছ তুমি?' বিস্মিত গলায় জানতে চাইলেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'কে মাসুদ রানা? তার সাথে আমার কি সম্পর্ক?'
'সাউল শিপিং লাইনসের মালিক। আপনার হবু জামাইয়ের মনিব। তাকে আপনি ভাল করে চেনেন। ওকে আমার দরকার,' হেকটরের গলার সুরে অদ্ভুত হিংস্র একটা ভাব ফুটে উঠেছে এখন। 'কোথায় সে?'
'কোথায় তা আমি কিভাবে জানব?' কৃত্রিম বিরক্তির সাথে জানতে চাইলেন নাফাজ মোহাম্মদ।
'জানতে হবে। আপনার নিজের স্বার্থে। এমন কোন জায়গা নেই যেখানে তাকে খুঁজিনি আমি। হারামজাদা একেবারে বাতাসে মিলিয়ে গেছে। কিন্তু এভাবে যদি লুকিয়ে বেড়ায় তাহলে তো আমার চলবে না। তাকে আমার পেতেই হবে। কোথায় সে?'
'আমি জানি না।'
'শেষ কখন যোগাযোগ করেছে আপনার সাথে?'
'কোন যোগাযোগই হয়নি তার সাথে আমার।'
'মিথ্যে কথা!' অপর প্রান্তে হুঙ্কার ছাড়ল হেকটর। 'তার একটা ট্যাঙ্কার ডুবে গেছে, আরেকটার কোন খোঁজ নেই—এসব খবর সে রাখছে না বলছেন? অসম্ভব! নিশ্চয়ই আপনার সাথে যোগাযোগ আছে তার। আপনি জানেন কোথায় সে আছে। বলুন?'
'আমার বন্ধু বা শুভানুধ্যায়ী নয় এমন একজন সম্পর্কে মিথ্যে কথা বলে কি লাভ আমার? এমনিতেই জীবন অতিষ্ঠ করে রেখেছ তুমি, তার ওপর উটকো ঝামেলা নিয়ে এই মুহূর্তে মাথা ঘামাবার মত মানসিক অবস্থা আমার নেই। হ্যাঁ, মি. রানা যোগাযোগ করেছিলেন, কিন্তু আমার সাথে নয়, আমার মেয়ের বন্ধু আনিস আহমেদের সাথে। সেটা চব্বিশ ঘণ্টা আগের ঘটনা। আনিস আমার বাড়িতে ছিল। ফোনে কথা বলেন মি. রানা। আনিস সাথে সাথে চলে যায়। তারপর থেকে ওদের কোন খবর আমার জানা নেই।'
অনেকক্ষণ কোন কথা বলছে না হেকটর। ওয়াল-রিসিভারগুলোর সুইচ অন করা, গভীর মনোযোগের সাথে অপেক্ষা করছে রানা হেকটর কি বলে শোনার জন্যে।

'তাহলে আমার অনুমানটাই সত্যি, তাই না?' আশ্চর্য দৃঢ়তা আর অদ্ভুত আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল হেকটর। 'সে যে কাপুরুষ নয় তা আমার চেয়ে আর কে ভাল জানে? না, আমার ভয়ে লুকায়নি মাসুদ রানা এই মুহূর্তে আপনার সামনে বসে রয়েছে সে, তাই না, মি. নাফাজ?'

হতভম্ব হয়ে গেছেন নাফাজ মোহাম্মদ। লোকটা জাদু জানে নাকি, ভাবছেন তিনি। দ্রুত সামলে নিলেন নিজেকে। বললেন, 'হ্যাঁ। ঠিকই বলছ তুমি। মি. রানা আমার সামনে বসে রয়েছেন, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ তুমি, তাই না? আমিও দেখতে পাচ্ছি, তোমার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। একই সময় দু'জায়গায় কিভাবে রয়েছেন সেটাই যা অবাক কাণ্ড, কি বলো?'

'ও, ঠাট্টা করার মানসিকতা এখনও রয়েছে আপনার?' গম গম করে উঠল হেকটরের গম্ভীর কণ্ঠস্বর। 'ঠিক আছে, নিশ্চিন্তে থাকুন, ঠাট্টা করার স্পর্ধা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করছি আমি। আমার লোককে ডেকে দিন।'

'অপেক্ষা করো।'

ম্যারিনোকে ডেকে নিয়ে আসার জন্যে এরই মধ্যে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেছে রানা। আবার যখন ফিরল, শিরি দেখল, ওভারঅল আর মাস্ক পরে রয়েছে ও। দ্রুত, সংক্ষেপে যা বোঝাবার বুঝিয়ে দেয়া হলো ম্যারিনোকে। রানার চোখে আবার সেই হত্যার নেশাটা চকচক করে উঠতে দেখছে ম্যারিনো। ঘাড়ে পিস্তলের নল চেপে থাকা সত্ত্বেও বেঁচে থাকার তাগিদে হেকটরের সাথে কথা বলার সময় নিজের গলাটাকে একটু কাঁপতে দিল না সে। শুধু তাই নয়, উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে রানার মন থেকে সমস্ত আশঙ্কা দূর করার চেষ্টাও করল।

প্রথমেই রানার চেহারার বর্ণনা দিল হেকটর, জানতে চাইল, 'এই চেহারার কোন লোক সাগর কন্যায় আছে?'

'নেই, স্যার,' আছে কি নেই তা স্মরণ পর্যন্ত করার চেষ্টা করল না ম্যারিনো।

'লোকটা ছদ্মবেশ নিয়ে থাকতে পারে,' বলল হেকটর। 'নামটাও হয়তো বদলে ফেলেছে। যাও, ভাল করে খোঁজ-খবর নিয়ে দেখে এসো।'

ম্যারিনোর হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিল রানা। সেটার উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে সে। 'তার কোন দরকার আছে বলে মনে করি না, স্যার। সমস্ত ক্রু আর টেকনিশিয়ানের আই. ডি. কার্ড চেক করেছি আমি। অতিরিক্ত বা ফালতু লোক একজনও নেই ওদের মধ্যে…'

'গুড,' বলল হেকটর। 'বুদ্ধির কাজ করেছ তুমি। কিন্তু ক্রু আর টেকনিশিয়ান ছাড়া আর যারা রয়েছে? তাদের মধ্যে ওই চেহারার কেউ নেই?'

'একজন ডাক্তার আছেন, কিন্তু তাঁর বয়েস সত্তরের কম নয়। আরেকজন বিজ্ঞানী আছেন,' বলছে বটে ম্যারিনো, কিন্তু কে সেই বিজ্ঞানী, আদৌ সে সাগর কন্যায় আছে কিনা, কিছুই জানা নেই তার, 'সিসমোলজিস্ট। তাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। ড. সাদ্দাম।' রানার দেয়া কাগজে লেখা সূত্র ধরে কথা বলছে সে।

'সিসমোলজিস্ট ড. সাদ্দাম?' সন্দেহের সুর ফুটে উঠল হেকটরের গলায়। 'কই, এই নামের কোন সিসমোলজিস্টকে তো চিনি না আমি!' সন্দেহ করার কারণ

আছে হেকটরের। তেল ব্যবসা এবং গবেষণার সাথে জড়িত যারা তাদের সবাইকে না চিনলেও প্রায় সবার নামই একবার করে অন্তত কানে এসেছে তার। তার স্মরণশক্তিও প্রখর, একবার কোন নাম শুনলে কখনও ভোলে না। ড. সাদ্দাম নামে কোন সিসমোলজিস্ট আছে বলে জানা নেই তার।

এখানে উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিল ম্যারিনো। হেকটরকে বলল সে, 'এর ব্যাপারে কোন ভুল হচ্ছে না আমার, স্যার। ইনি সদ্য কায়রো ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করে বেরিয়েছেন।'

'সদ্য পাস করা?' নিরাশ শোনাল হেকটরের গলা। 'কিন্তু তোমার সাথে পরিচয় হলো কিভাবে?'

'আপনার মনে নেই, স্যার, ইউনিভার্সিটি থেকে কিছু ডকুমেন্ট চুরি করে আনার জন্যে আপনি আমাকে কায়রোয় পাঠিয়েছিলেন?' সত্যের সাথে মিথ্যের মিশেল দিয়ে চমৎকার বিশ্বাসযোগ্য করে তুলছে গল্পটা ম্যারিনো। 'তখন ইনি ছাত্র ছিলেন।'

'কোন ভুল করছ না তো?'

'অসম্ভব, স্যার।'

'হারামীটা তাহলে গেল কোথায়?' যেন মহা ফাঁপরে পড়ে গেছে হেকটর।

এই ফাঁকে শার্টের আস্তিন দিয়ে মুখের ঘাম মুছে নিচ্ছে ম্যারিনো।

'কোন সমস্যা রয়েছে ওখানে তোমাদের?' শেষ পর্যন্ত প্রসঙ্গ বদল করল হেকটর।

'সব হাতের মুঠোয়, স্যার,' দৃঢ় গলায় বলল ম্যারিনো। 'দুশ্চিন্তা করার কোন দরকারই নেই আপনার।'

'বেশ, রেডিওরুমে থেকো।' কেটে গেল যোগাযোগ।

বারজেনের দু'জন লোক ম্যারিনোকে নিয়ে বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে।

'এমন অকৃতজ্ঞ মানুষ তো জীবনে দেখিনি,' তীব্র প্রতিবাদের সুরে বলল শিরি ফারহানা। 'আপনার জন্যে মিথ্যে কথা বলতে গিয়ে ঘেমে গোসল হয়ে গেল বেচারা লোকটা, তাকে একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিতে নেই?'

হুডটা মাথা থেকে নামাল রানা। 'সবই নিজের প্রাণের স্বার্থে করেছে বেচারা,' বলল ও। 'আমার উপকার করার ইচ্ছায় ওর মুখ থেকে কথাগুলো বের হয়নি। পাওনা হয়নি, তবু দেব—ধন্যবাদ জিনিসটা কি এতই সস্তা?'

'যাই বলুন,' বললেন নাফাজ মোহাম্মদ, 'আপনি যে সাগর কন্যায় নেই কথাটা হেকটরকে বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছে ম্যারিনো।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'লোকটার তিনটে জিনিসের প্রশংসা করতে হয়। সুন্দর মিথ্যে বলতে পারে। নার্ভটা শক্ত।'

'আরেকটা জিনিস?' প্রশ্ন করল শিরি।

'বেঁচে থাকার আকুতি,' বলল রানা। 'এটার কথা চেপে যেতে চাইছিলাম এই জন্যে যে ব্যাপারটা আমার কাছে প্রশংসাযোগ্য, কিন্তু অন্যের কাছে তা নাও হতে পারে। ওর বন্ধুরা ওকে কাপুরুষ বলবে।'

'ওহ্ গড!' হতাশায় এদিক ওদিক মাথা দোলাচ্ছে শিরি। 'শেষ পর্যন্ত লোকটার

দুর্নামও গাইছেন আপনি? তাও দর্শন আউড়ে? নাহ্, এখনও চিনতে ঢের বাকি আছে আপনাকে আমার…'

আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল শিরি। কিন্তু রানা ঝট্ করে দরজার দিকে তাকাতেই চুপ করে গেল সে। কেবিনের ভেতর তিনজনই এখন সতর্ক সজাগ হয়ে উঠেছে। ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ। এদিকেই আসছে।

আট

দৌড়ে এসে কেবিনে ঢুকল দু'জন লোক। একজন বারজেন, অপরজন দায়েশ আরাবিল। দায়েশ রিগের একজন ক্রু, তার কাজ প্ল্যাটফর্মের পায়া আর টেনশনিং অ্যাংকর কেবল্-এর সাথে লাগানো সেনসরি ইন্সট্রুমেন্টের রীডিং চেক করা। বিশাল বুকের ছাতিটা ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে তার, চেহারায় উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা।

'বলো, বলো, খারাপ খবর শোনার জন্যে তৈরি হয়েই আছি আমি,' বললেন নাফাজ মোহাম্মদ।

'রিগের তলায়, স্যার,' হাঁপাচ্ছে দায়েশ। 'আমার ইন্সট্রুমেন্টের রীডিং দেখে মনে হচ্ছে কেউ…কিছু একটা এসেছে রিগের নিচে।'

'কি…কি বললে?' উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়লেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'রিগের তলায় কেউ আসবে কোথেকে? নিজের অজান্তে পোর্টহোলের দিকে তাকিয়ে গাঢ় অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেলেন না তিনি। 'রাডারে কিছু ধরা পড়েছে?'

'রাডাররুম থেকে হয়েই তো এখানে আসছি, স্যার,' বলল দায়েশ। 'রাডার স্ক্রিনে কিছুই নেই। কিন্তু আমার ধারণা মিথ্যে হতে পারে না, স্যার। কিছু একটা ধাতব জিনিস পশ্চিম পায়ের সাথে ঘষা খাচ্ছে…'

'সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, বলতে চাইছ?'

'জী, স্যার।'

অবিশ্বাসে এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'এখানে তার লোকজন থাকতে সাগর কন্যাকে ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা করবে হেকটর, এ আমি ভাবতে পারছি না।' রানার দিকে তাকালেন তিনি।

'সাগর কন্যাকে ডুবিয়ে দিতে চাইছে, তা আমিও বিশ্বাস করি না,' বলল রানা। 'প্রথম কথা, দু'চার ঘণ্টার চুপিসার চেষ্টায় তা সম্ভব নয়। হেকটর সম্ভবত একটা পা আর সেটার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য টিউব আর কেবল্-এর ক্ষতি করে সাগর কন্যার ভাসমানতা নষ্ট করে দিতে চাইছে। তাতে পাম্পিং আর ড্রিলিং মেকানিজম অচল হয়ে যাবে বলে ভেবেছে হয়তো। সঠিক বলা মুশকিল। কে জানে, সে হয়তো নিজের লোকজনদের সাথে বেঈমানী করারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমন কোন উপায় হয়তো আবিষ্কার করেছে যাতে সাগর কন্যাকে ডুবিয়ে দিতে খুব বেশি সময় লাগবে না তার।' বারজেনের দিকে তাকাল রানা। 'তোমরা তো স্কুবা ইকুইপমেন্ট নিয়ে এসেছ। কোথায়, দেখাও আমাকে।' দ্রুত কেবিন থেকে বেরিয়ে

এল রানা, ওকে অনুসরণ করছে বারজেন আর দায়েশ।

'ভদ্রলোক কোথায় গেলেন, ড্যাডি?' জানতে চাইল শিরি।

'আমাকে জিজ্ঞেস না করে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই তো পারো,' মেয়ের উপর প্রায় মারমুখো হয়ে উঠে বললেন নাফাজ মোহাম্মদ। একটু থেমে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করলেন তিনি। তারপর মেয়ের প্রশ্নের উত্তরে জানালেন, 'সম্ভবত রিগের নিচে আমাদের শত্রু যারা এসেছে তাদের...'

'তাদের সাথে লড়তে গেছেন, তাই না?' বাবার রাগ দেখে একটুও ঘাবড়ায়নি শিরি, বরং সেও যে বাবার ওপর রেগে গেছে তা প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করছে না। 'রিগের নিচে কেউ যদি এসে থাকে, তারা নিজেদেরকে রক্ষা করার উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র সাথে করে নিয়ে এসেছে, তাই না?' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকার পর আবার বলল শিরি, 'জেনেশুনে ভদ্রলোককে এত বড় বিপদের মুখে ঠেলে দিলে তুমি?'

'আমি বিপদের মুখে ঠেলে দিলাম?' অবাক হয়ে বললেন নাফাজ মোহাম্মদ।

'তা নয় তো কি!' বলল শিরি। 'তুমি তাঁকে বাধা দিতে পারতে!' বলে আর দাঁড়াল না শিরি, দ্রুত বেরিয়ে পড়ল কেবিন থেকে।

বারজেনের দলে ছ'জন দক্ষ স্কুবা ডাইভার রয়েছে, কিন্তু মাত্র একজনকে সাথে নেবে বলে স্থির করল রানা। ধ্বংসাত্মক কাজে ওস্তাদ লোকদেরকে চরিয়ে খায় বারজেন, তার অভিজ্ঞতার পরিধি কারও চেয়ে কম নয়, সহজে কেউ তাকে প্রভাবিত করতেও পারে না, কিন্তু এরই মধ্যে রানাকে যতটা চিনতে পেরেছে সে, বুঝে নিয়েছে এই লোকের বিবেচনাবোধের ওপর কথা বলা সাজে না তার। মনে মনে স্বীকার করে নিয়েছে সে, এমন ঠাণ্ডা মাথায় এত বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে আর কাউকে দেখেনি সে।

বারজেনের দলের ডাইভার চেথাম আর রানা দ্রুত স্কুবা আউটফিট পরে নিল। সাথে রিলোডেবল কমপ্রেসড এয়ার হারপুন গান আর খাপে ঢোকানো ছুরি নিয়েছে ওরা। ডেরিক ক্রেনের ডগায় মোটা তারের সাথে ঝুলছে একটা লোহার খাঁচা, দরজা টপকে সেটায় চড়তে যাচ্ছে রানা, এই সময় পেছন থেকে ডাকল শিরি, 'মাসুদ ভাই?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। বিরক্ত হয়েছে ও।

'বাধা দিয়ে আপনাকে আমি ধরে রাখতে পারব না,' ম্লান মুখে বলল শিরি। 'যাচ্ছেন, যান। কিন্তু...সাবধানে থাকবেন, কেমন?'

তিন সেকেন্ড নড়ল না রানা। তারপর মাস্কটা মুখ থেকে খুলে তাকাল শিরির দিকে। হাসছে ও। বলল, 'ধন্যবাদ, শিরি। এটা তোমার পাওনা হয়েছে।'

লোহার রড দিয়ে ঘেরা খাঁচার ভেতর ঢুকল রানা। দরজাটা বন্ধ করে দেয়া হলো। সিগন্যাল পেয়ে অপারেটর অন করল তার ইলেকট্রিক সুইচ। সচল হয়ে উঠল ডেরিক ক্রেন, সাগর কন্যার ডেক থেকে শূন্যে উঠে পড়ল খাঁচাটা। রিগের কিনারা থেকে বেশ কিছুটা দূরে পৌঁছে, ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামতে শুরু করল সেটা। পানির ঠিক দুই হাত উপরে থাকতে স্থির হয়ে গেল, দরজা খুলে প্রথমে চেথাম, তারপর ডাইভ দিল রানা।

ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার শরীর ঠাণ্ডা হিম পানির স্পর্শ পেয়ে। পাশে চেথামকে নিয়ে রিগের পশ্চিম পায়ার দিকে দ্রুত এগোচ্ছে ও সাঁতার কেটে।

ভুল করেনি দায়েশ আরাবিল। ডাইভারদের পাঠিয়েছে হেক্টর। দু'জনকে দেখতে পাচ্ছে রানা। একটা জাহাজের আবছা কাঠামো দেখা যাচ্ছে, সেটা থেকে বিশ ফিট নিচে রয়েছে লোক দু'জন। দু'জনেই শক্তিশালী হেডল্যাম্প পরে রয়েছে, ঘাড় আর কোমরের কাছ থেকে সোজা উঠে গেছে এয়ারলাইন আর কেবল্ জাহাজটার দিকে।

সাগর কন্যার বিশাল পায়ে মাইন, লিমপেট মাইন, কনভেনশনাল ম্যাগনেটিক মাইন আর গোল করে পাকানো বীহাইভ অ্যামাটোলের রোল ফিট করছে ওরা। বিস্ফোরকের পরিমাণ লক্ষ করে আশ্চর্য হলো রানা, ইফেল টাওয়ারকে মাটিতে শুইয়ে দেবার জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু পরমুহূর্তে সাগর কন্যার প্রকাণ্ড পায়ের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল ও, সত্যি যদি কোন ক্ষতি করতে হয় ওটার, এর চেয়ে কম বিস্ফোরকে কাজ হবে না। তবে বোঝা যাচ্ছে, পশ্চিম পা-টা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে চাইছে হেকটর।

বাছাই করে কাজ পাগল লোকদের পাঠিয়েছে হেকটর। দু'জনেই সাংঘাতিক নিষ্ঠার সাথে নিজেদের কাজে ব্যস্ত। ডানে-বাঁয়ে-পেছনে কোনদিকে তাকাবার অবসর নেই তাদের। রানার দেখাদেখি এগোবার গতি মন্থর হয়ে গেছে চেথামের। দুই স্কুবা ডাইভার মুখোমুখি হয়ে একজনের মাস্ক আরেকজনের সাথে চেপে ধরল, পরস্পরের চোখে তাকিয়ে আছে ওরা। প্রতিপক্ষদের হেডল্যাম্পের আলোয় চেথামের চোখে নগ্ন উল্লাস দেখতে পাচ্ছে রানা। সায় দেয়ার ভঙ্গিতে একযোগে মাথা কাত্ করল ওরা। ওদের দিকে পিছন ফিরে রয়েছে হেকটরের ডাইভাররা। আরও কিছুটা এগিয়ে এক সাথে হারপুন ছুঁড়ল রানা আর চেথাম। দুই ডাইভারের শিরদাঁড়া ভেঙে ভেতরে ঢুকে গেল হারপুন। লক্ষ্য ভেদে চেথামের নৈপুণ্য দেখে মুগ্ধ হলো রানা। সন্দেহ নেই, সাথে সাথে মারা গেছে লোক দু'জন। দ্রুত আবার কমপ্রেসড এয়ার হারপুন রিলোড করে নিল দু'জনেই। তারপর, সাবধানের মার নেই ভেবে, দুই প্রতিপক্ষের ব্রিদিং টিউব চিরে দিল্ ছুরি চালিয়ে। দুটোই অত্যাধুনিক টিউব, সাথে কমিউনিকেশন ওয়্যার রয়েছে।

বিশ ফিট ওপর থেকে ইলেকট্রিক পুল-পুশ ইউরেনাসের ক্যাপ্টেন গেস্টন সাথে সাথে টের পেল, সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে নিচে। কেবল্ টেনে তোলা হলো ডাইভারদের, এখনও তাদের পিঠে গেঁথে রয়েছে হারপুন। গানেলের ওপর দিয়ে লাশ দুটোকে নিয়ে যাবার সময় কয়েকজন ক্রু হাত চাপা দিল চোখে, আর্তনাদ করে উঠে একজন ক্রু চরকির মত আধ পাক ঘুরে পেছন ফিরল।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আরও দু'জন ডাইভারকে ঘায়েল করল রানা আর চেথাম, কিন্তু তারা মারা গেল, নাকি মারাত্মক ভাবে আহত হলো শুধু, বুঝতে পারল না ওরা।

পাল্টা হামলা করার জন্যে লোক দু'জনকে নামিয়েছিল গেস্টন। পানির নিচে ডুব দিল তারা, সাথে সাথে ঢিল পড়ল কেবলে। আঁতকে উঠল গেস্টন, কাদের পাল্লায় পড়েছে, এবার আর বুঝতে বাকি থাকল না তার। এক সেকেন্ড সময় নষ্ট না

করে এই দু'জনকেও টেনে তুলে জাহাজ নিয়ে পিঠটান দিল সে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাবার জন্যে এবার ডিজেল-এঞ্জিন চালু করেছে। আওয়াজ হচ্ছে হোক, অন্ধকারও কম গাঢ় নয়, সাগর কন্যার গোলন্দাজরা দেখতে পাবে না ইউরেনাসকে।

দুই স্কুবা ডাইভার, রানা আর চেথাম, নিজেদের হেডলাইট জ্বেলে নিল এবার। সাঁতার কেটে নেমে যাচ্ছে ওরা সাগর কন্যার পশ্চিম পায়ের দিকে, যেখানে ফিট করা রয়েছে মাইন আর বিস্ফোরকগুলো।

কিছুই না ছুঁয়ে প্রথমে পরীক্ষা করে নিল ওরা মাইন, লিমপেট মাইন, কনভেনশনাল ম্যাগনেটিক মাইন আর বীহাইভ অ্যামাটোলের রোলগুলো। সবগুলো মাইন আর বিস্ফোরকের সাথে টাইম ফিউজ রয়েছে, একটা একটা করে সেগুলো খুলে নিয়ে ফেলে দিল ওরা। সাগরের মেঝেতে গিয়ে পড়ল সব। কোন ঝুঁকি নিতে চায় না রানা, তাই সবগুলো মাইন আর বিস্ফোরক থেকে ডিটোনেটর খুলে নিতে ভুল করল না। তার কেটে অকেজো বিস্ফোরকগুলো ছাড়িয়ে নিল পা থেকে, ছেড়ে দিতেই টাইম ফিউজের সাথে দেখা করতে চলল ওগুলো সাগর তলে।

ডেরিক ক্রেনে চড়ে সাগর কন্যার প্ল্যাটফর্মে ফিরে এল ওরা। দরজা খুলে লোহার খাঁচা থেকে নেমেই রেডিওরুমের সাথে যোগাযোগ করল রানা। কিন্তু একটু অপেক্ষা করতে হলো ওকে। কারণ, অপারেটর জানাল, মি. নাফাজ মোহাম্মদ এই মুহূর্তে জন হেকটরের সাথে কথা বলছেন।

'কে কথা বলছ?' চাপা, সংযত গলায় জানতে চাইছে হেকটর।

'আমি নাফাজ মোহাম্মদ।'

'কন্ডি কোথায়?'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করলেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে...'

নাফাজ মোহাম্মদের কথা শেষ হবার আগেই গম্ভীর সুরে জানতে চাইল হেকটর, 'ম্যারিনো কোথায়?'

'প্ল্যাটফর্মে। ডেকে পাঠাব তাকে?'

'ডেকে পাঠাতে হবে কেন? রেডিওর সামনে তারই তো থাকার কথা।'

'তুমি কথা বলতে চাইলে...'

'আমি কথা বলতে চাইলে বন্ধ ঘর থেকে বের করে আনবে তাকে রেডিওর সামনে, এই তো? বুঝেছি...'

প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলেন নাফাজ মোহাম্মদ, 'তারমানে? তুমি কি...'

ডিনামাইটের মত বিস্ফোরিত হচ্ছে হেকটর। দুনিয়ার পাঁচ শ্রেষ্ঠ ধনীর এক ধনীকে তুই-তোকারী করছে সে, এ-থেকেই বোঝা যায় তার ক্রোধের মাত্রা। 'শালা বানচোত, নাফাজ! যদি তোর আমি চোদ্দগুষ্ঠি ধ্বংস না করি তো আমার নাম হেকটরই নয়!' সম্ভব হলে ওয়্যারলেসের সাহায্যে নাফাজ মোহাম্মদের গলা টিপে ধরত সে এই মুহূর্তে। 'আমার তিনজন লোককে খুন করেছিস শালা, এত বড় স্পর্ধা তোর? দাঁড়া, মজা দেখাচ্ছি তোকে, দাঁড়া।'

কেবিনে রানাকে ঢুকতে দেখে মুখে হাসি ফুটতে গিয়েও ফুটল না শিরির। অপ্রতিভ, দ্বিধাগ্রস্ত দেখাচ্ছে তাকে। এই মাত্র যে-কাজটা সেরে এসেছে রানা সেটার প্রশংসা নাকি কঠোর সমালোচনা করা উচিত, ঠিক যেন বুঝতে পারছে না সে।

হেকটরের অশ্লীল, অভদ্র কথাবার্তা শুনেও যেন শুনতে পাচ্ছেন না নাফাজ মোহাম্মদ। সম্পূর্ণ শান্ত দেখছে তাঁকে রানা। মৃদু, সংযত কণ্ঠে হেক্টরকে বলছেন, 'ঠিক এভাবেই আবার আঘাত হানা হবে। এবার তোমাকে আমি মধ্যমণি হিসেবে দেখতে চাই।'

এরই মধ্যে নিজের রাগটাকে সামলে নিয়েছে হেকটর। তুই-তোকারী করছে না এখন, তবে সম্মানসূচক আপনি শব্দটাও উচ্চারণ করছে না। 'প্ল্যাটফর্মের কারও কোন ক্ষতি না করে, আমার ইচ্ছা ছিল সাগর কন্যাকে সাময়িকভাবে অচল করে দেয়া,' সম্ভবত সত্যি কথাই বলছে হেকটর। 'কিন্তু তুমি যখন পাল্টা আঘাত করে আমাকে ঠেকাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছ, বেশ, এটার আশা ছেড়ে দিয়ে নতুন আরেকটা সাগর কন্যার স্বপ্ন দেখতে শুরু করো তাহলে। কথা দিচ্ছি তোমাকে, চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর এটাকে হারাবে তুমি। শুধু তাই নয়, সাবধান থেকো, নইলে তোমাকেও আমি নিশ্চিহ্ন করে দেব।'

আরও নরম হলেন নাফাজ মোহাম্মদ, নিচু গলায় জানতে চাইলেন, 'প্রলাপ বকছ কেন?' একটু হাসলেন তিনি। 'ভেবেছ খবর রাখি না? তোমার একমাত্র ভরসা যুদ্ধ-জাহাজগুলোকে ফেরত নেয়া হয়েছে, ওদের সাহায্য ছাড়া কিছুই করতে পারবে না তুমি। আমাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া, সে তো বহুত দূরের কথা।'

অপরপ্রান্তে হেকটরও হাসছে চাপাসুরে। 'সবুর, টের পাবে। যুদ্ধ-জাহাজ ছাড়াও তোমাকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার আরও উপায় জানা আছে আমার। সময় হোক, নিজেই সব দেখতে পাবে। ইতিমধ্যে, রকেটের সব তেল পানিতে ফেলে দিয়ে সাউল শিপিং লাইনসের ট্যাঙ্কার রকেটকে ডুবিয়ে দিচ্ছি আমি, খবরটা সেই শালা হারামীর বাচ্চা মাসুদ রানাকে পারলে জানিয়ে দাও।' যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল হেকটর।

রিসিভার নামিয়ে রেখে রানার দিকে তাকালেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'কি বুঝলেন ওর কথা থেকে, মি. রানা?'

'দিগন্তরেখার ঠিক নিচেই কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে ও।'

'পশ্চিম পায়ের খবর কি?' জানতে চাইলেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'গিয়ে কি দেখলেন?'

'চিন্তার কিছু নেই, আপনার সাগর কন্যা সম্পূর্ণ নিরাপদ এখন। গিয়ে কি দেখলাম···শুনলেনই তো তিনজন ডাইভারকে হারিয়েছে হেকটর। বিস্ফোরকগুলো এখন সাগর তলায় ঘুমাচ্ছে।'

'ওর তরফ থেকে আরও কিছু আশঙ্কা করেন আপনি?'

'করি,' বলল রানা। 'আত্মবিশ্বাসের কোন অভাব পড়েছে বলে তো মনে হলো না।'

'কিন্তু আর কি করার আছে ওর?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন নাফাজ মোহাম্মদ।

'মাথায় যার শয়তানী বুদ্ধি গিজগিজ করছে তার সম্পর্কে আগে থেকে কিছু বলা মুশকিল,' বলল রানা। 'চাইলে অনেক কিছুই করতে পারে সে। চাইছেও। কিন্তু ঠিক কখন কোন্‌টা করবে তা বলা সম্ভব নয়। একই উপায়ে আবার সাগর কন্যার ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে সে।'

অবিশ্বাসে সাদা ধবধবে ভুরু জোড়া কপালের মাঝখানে উঠে গেল নাফাজ মোহাম্মদের। 'এত বড় মার খেয়ে আবার সে ওই একই...'

তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল রানা, 'হ্যাঁ, ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত। কে জানে, সে হয়তো সেই সুযোগটাই নিতে চাইবে। একই ধরনের আরেকটা হামলা আমরা আশা করছি না ভেবে।' একটু থেমে আবার বলল রানা, 'তবে, এবার সে অন্য কোন কৌশল অবলম্বন করবে বলে মনে হয়। প্লেন বা সাবমেরিনের সাহায্য যোগাড় করা এখন আর তার পক্ষে সম্ভব নয়। কোন যুদ্ধ-জাহাজের সাহায্যও সে পাচ্ছে না। তার মানে আজ রাতে রাডার আর সোনারে লোক দরকার নেই। রেডিও অপারেটরকে একটু বিশ্রাম নিতে দিন, বেচারার ঘুম দরকার। ওর কেবিনে তো অ্যালার্ম বেল আছেই, দরকার হলে ডেকে পাঠালেই হবে। অবশ্য, দায়েশকে আমি ডিউটিতে রাখব। বলা যায় না, এটা ধ্বংস করার জন্যে আবার লোক পাঠাতে পারে হেক্টর।'

চুপচাপ রানার পাশে দাঁড়িয়ে ওর কথা শুনছিল এতক্ষণ জিউসেপ বারজেন। রানা থামতে বলল সে, 'কিন্তু এবার ওরা আপনার জন্যে তৈরি হয়েই আসবে। ডাইভারদের পানিতে নামাবার আগে আর্মড গার্ড নামাবে ওরা। ডাইভাররা যখন কাজ করবে, তাদেরকে পাহারা দেবে ওরা। এমনকি ইনফ্রা-রেড সার্চ-লাইটও ব্যবহার করতে পারে ওরা, প্ল্যাটফর্ম থেকে কিছুই টের পাব না আমরা। আপনার আর চেথামের ভাগ্য ভাল, জিতে গেছেন প্রথমবার, দ্বিতীয়বার তা নাও হতে পারে। এবার ওরা সতর্ক হয়েই আসবে।'

'ভাল ভাগ্যের কোন দরকারই নেই আমাদের,' বলল রানা। 'চুরি করে প্রচুর ডেপথ্‌ চার্জ আনিয়ে রেখেছেন মি. নাফাজ। এ-থেকে ধরে নিতে পারি, একজন অন্তত ডেপথ্‌ চার্জ এক্সপার্ট আছে তোমার দলে। নেই?'

'আছে,' গম্ভীর ভাবে একটু হেসে বলল বারজেন। 'মেগাটন। প্রাক্তন পেটি অফিসার। কেন?'

'পানিতে পড়ার সাথে সাথে বা একটু পরই বিস্ফোরিত হবে ডেপথ্‌ চার্জ, তার ব্যবস্থা করতে পারবে সে? সেভাবে সেট করতে পারবে ডিটোনেটর?'

'বোধহয় পারবে। কিন্তু—কেন?'

'তিনটে ডেপথ্‌ চার্জ, তিনটে পায়ের পঁচিশ গজের মধ্যে প্ল্যাটফর্মের কিনারায় রাখব আমরা,' বলল রানা। 'তোমার সহকারী মেগাটন এ-ব্যাপারে ভাল পরামর্শ দিতে পারবে। পঁচিশ গজ দূরে বলছি, আমার ভুলও হতে পারে। সেন্সরি ডিভাইসে দায়েশ যদি কিছু টের পায়, সাথে সাথে আমরা সংশ্লিষ্ট পায়ের কাছ থেকে একটা

ডেপথ্ চার্জ ফেলে দেব পানিতে।'

বিস্ময়ে চোখ জোড়া ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে বারজেনের।

'বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া রিগের ক্ষতি করতেও পারে, নাও পারে। করলে মারাত্মক ধরনের কিছু হবে না সেটা,' বলে চলেছে রানা, 'ডাইভাররা অবশ্যই বোট নিয়ে আসবে, বোটে যারা থাকবে তারা প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি ছাড়া আর তেমন কিছু অনুভব করবে না। কিন্তু পানিতে যারা থাকবে, ডাইভাররা, বিস্ফোরণের ধাক্কায় মুহূর্তে ভর্তা হয়ে যাবে।'

এদিকে ওদিক মাথা দোলাচ্ছে বারজেন, হতাশ সুরে বলল, 'স্যার, আপনার তুলনায় আমরা এখনও পিঁপড়ে মারতেও শিখিনি, কসম খোদার!'

চট্ করে শিরির মুখটা একবার দেখে নিল রানা। গম্ভীরভাবে বারজেনকে বলল, 'বাজে কথা বোলো না। আমরা মানুষ মারছি না। শুধু আত্মরক্ষার চেষ্টা করছি। চেষ্টাটা আন্তরিক, এই যা।'

'কথার ভেতরে এত চাতুরি ঠাসা থাকতে পারে, কল্পনাও করিনি কখনও,' কথাটা অস্ফুটে বলে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল শিরি ফারহানা।

বারজেনকে বলল রানা, 'যেভাবে বললাম ঠিক সেই ভাবে কাজ সারার জন্যে মেগাটন আর তোমার দু'জন লোককে বুঝিয়ে দাও সব।'

দ্রুত বেরিয়ে গেল বারজেন কেবিন থেকে।

একটা চুরুট ধরাল রানা। আবার ওর দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছে শিরি। নাফাজ মোহাম্মদও তাকিয়ে আছেন ওর দিকে। বাপ মেয়ে দু'জনের চোখেই প্রশ্ন, কারও দিকে না তাকিয়েও তা বুঝতে পারছে রানা। বারজেনকে নির্দেশগুলো দেবার পর এই কেবিনে বসে থাকার কথা নয় ওর। চুপচাপ আরও কিছুক্ষণ চুরুট ফুঁকল রানা। তারপর মনস্থির করে সরাসরি তাকাল নাফাজ মোহাম্মদের দিকে। বলল, 'কিছু যদি মনে না করেন, আপনার রেডিওরুমটা একবার ব্যবহার করতে পারি?'

'অবশ্যই! একশোবার!' স্বতস্ফূর্তভাবে বললেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'এর জন্যে আমাকে আবার জিজ্ঞেস করার কি আছে?'

'আমি চাই ওয়ায়্যারলেসে আমি যখন কথা বলব কেউ যেন ওয়াল-রিসিভারগুলো অন করে আমার কথা না শোনে,' বলল রানা।

'ঠিক আছে, তাই হবে…'

বেরিয়ে গেল রানা।

রেডিওরুমে ঢুকে অপারেটরকে ছুটি দিয়ে দিল, বলল, 'আজ রাতে তোমাকে আর দরকার হচ্ছে না, ঠেসে ঘুম দিয়ে নাও।'

সারা মুখে কৃতজ্ঞতার হাসি নিয়ে বেরিয়ে গেল অপারেটর।

রানা এজেন্সীর ওয়াশিংটন ব্রাঞ্চের সাথে যোগাযোগ করল রানা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সবগুলো বড় রাজ্যে একটি করে ব্রাঞ্চ রয়েছে এজেন্সীর—হেড কোয়ার্টার ওয়াশিংটনে। ওখান থেকে জানা গেল, হেকটরের লোকেরা এ-পর্যন্ত ছয়টা ব্রাঞ্চে হামলা চালিয়েছে, কিন্তু যেমন আশা করা গিয়েছিল, কোথাও কোন সুবিধে করতে পারেনি। আগে থেকেই রানার নির্দেশে সতর্ক ছিল সহকারীরা,

আক্রমণের অপেক্ষায় ওৎ পেতে বসে ছিল, মার খেয়ে স্রেফ নাস্তানাবুদ হয়েছে শত্রুরা। হতাহতের সংখ্যা ব্যাপক, তবে এজেন্সীর একজন লোকও গুরুতর ভাবে আহত হয়নি। তিনটে ব্রাঞ্চ থেকে খবর এসেছে, হেকটরের লোকেরা হামলা করতে এসেও হামলা করতে পারেনি, কারণ, পুলিসের সহায়তায় ব্রাঞ্চের লোকেরা আগেই তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলে। সর্বমোট আটত্রিশজন সশস্ত্র গুণ্ডাকে গ্রেফতার করতে সমর্থ হয়েছে পুলিস। অন্যান্য রাজ্যের ব্রাঞ্চগুলোয় এখনও হামলা করেনি হেকটরের লোকেরা। রানা আশা করল, করতে বোধহয় আর সাহসে কুলাবে না।

রেডিওরুম থেকে বেরিয়ে বারজেন, মেগাটন আর তাদের লোকেরা যেখানে কাজ করছে সেখানে এসে দাঁড়াল রানা। পাগুলোর কাছ থেকে ডেপথ্ চার্জ পঁচিশ গজ দূরে রাখার ব্যাপারে রানার সাথে একমত হলো মেগাটন। ওদের কাজের অগ্রগতি দেখছে রানা, এই সময় পাশে এসে দাঁড়াল শিরি ফারহানা।

'আরও মানুষ মরতে যাচ্ছে, তাই না?' রানার চেহারাটা কেমন যেন গম্ভীর, তাই ভয়ে ভয়ে, অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে, যেন বহু দূরের একটা তারাকে প্রশ্ন করল শিরি।

'কেউ যদি মারতে আসে, তুমি কি করবে?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'আমাকে কেউ মারতে আসবে না,' বলল শিরি। 'আপনাকেও না। অন্তত এখন পর্যন্ত আমাদের কাউকে মারতে আসেনি কেউ।'

'তোমাকে তাহলে গুলিটা করেছিল কে?'

'আমাকে গুলি করেছিল?' আকাশ থেকে পড়ল শিরি। পরমুহূর্তে কথাটা মনে পড়ে গেল তার। চেহারাটা কালো হয়ে গেল সাথে সাথে।

'মনে পড়েছে?' বলল রানা।

'সেটা আমাদেরই দোষ ছিল। ওরা আমাদেরকে নিষেধ করেছিল প্ল্যাটফর্মে বেরুতে, তবু আমরা বেরিয়েছিলাম।'

'ওরা নিষেধ করার কে? ওদের বাপের রিগ এটা?' বলল রানা।

চুপ করে রইল শিরি।

'তোমার গায়ে গুলি লাগেনি, সেটা তোমার ভাগ্যের জোর। আনিস মারা যায়নি, সেটাও আনিসের ভাগ্যের জোর—ওদের দয়া নয়। ওরা তোমাদেরকে খুন করার জন্যেই গুলি চালিয়েছিল।'

মেয়েটার মনে কখন কি ভাবের জোয়ার বইছে বোঝা দায়, হঠাৎ সে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে একটা হাত ধরল রানার। প্রায় ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'আসলে আপনি খুন-খারাবি পছন্দ করেন না, তাই না, মাসুদ ভাই?'

'মোটেও না।'

হঠাৎ রানার হাতটা ছেড়ে দিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে ওর মুখের দিকে তাকাল শিরি, ঝাঁঝ মেশানো গলায় বলল, 'তাহলে এই কাজটায় হাত পাকালেন কিভাবে? দেখে তো মনে হচ্ছে, এ-ব্যাপারে আপনার চেয়ে অভিজ্ঞ লোক দুনিয়ায় আর একটাও নেই। একজন পেশাদার খুনী পর্যন্ত অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করছে আপনার তুলনায়

তারা পিঁপড়ে মারতেও শেখেনি।'

'জোর যার মুল্লুক তার, এই হচ্ছে জগতের নিয়ম। দুনিয়ার বেশির ভাগ লোক দুর্বল, তারা হাজারে হাজারে লাখে লাখে শোষিত হচ্ছে, ঠকে ভূত হয়ে যাচ্ছে, খুন হচ্ছে। এদের জন্যে দুঃখ হয় না তোমার?'

'আপনার বুঝি এদের জন্যে দুঃখে ফেটে যায় বুকটা?'

'শুনতে অহঙ্কারের মত লাগতে পারে বা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো বলে মনে হতে পারে,' বলল রানা, 'তবু, সত্যি কথা হলো, হ্যাঁ, এদের জন্যে দুঃখ হয়। এদেরকে যে আমরা খুব একটা সাহায্য করতে পারি তা নয়, কিন্তু যদি কখনও কোন অন্যায় অত্যাচার চোখে পড়ে, সাধ্য মত চেষ্টা করি বাধা দিতে।'

'মানবতার খাতিরে।'

'অবশ্যই,' বলল রানা। 'তুমি ধনীর দুলালী, মানুষের সত্যিকার করুণ অবস্থা সম্পর্কে তোমার কোন ধারণাই নেই, বললেও বুঝবে না।'

মনে হলো, অপমানে মুখটা লাল হয়ে উঠল শিরির, বলল, 'বেশ, বুঝলাম, অসহায় মানুষদের সেবা করার সোল এজেন্সী নিয়ে বসে আছেন আপনি। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত স্বীকার করছেন তো যে আপনি একজন খুনী?'

'ভুলে যাচ্ছ কেন, খুন পুলিসকেও করতে হয়। সৈনিকরাও খুন করে। কখনও কখনও বিজ্ঞানীরাও মানুষ মারে। কাজটা করতে ভাল লাগে বলে করে তা নয়, এটা তাদের কর্তব্য, এই কর্তব্য রক্ষার পেছনে মানবতা রক্ষার অনুপ্রেরণা অবশ্যই আছে। মার্শাল ফচের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এই ভদ্রলোক দশ লক্ষ লোকের মৃত্যুর কারণ হন, তারা বেশির ভাগই ছিল তাঁর নিজের দলের লোক। কিন্তু ইতিহাস তাকে সবচেয়ে প্রশংসিত, সবচেয়ে সম্মানিত বীর হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ফচের ক্ষেত্রে খুন করাটা ধ্বংসাত্মক ছিল না, রক্ষাত্মক ছিল। প্রশংসাই তো তাঁর প্রাপ্য।'

'লেকচারটা শুনে যে-কোন লোকের ধারণা হবে মার্শাল ফচের মত প্রশংসা আপনিও চান।'

ছেলে মানুষের মত দাঁত দিয়ে জিভ কেটে বলল রানা, 'ছি, ছি। কার সাথে কার তুলনা করছ? ফচ ছিলেন মানবজাতির একজন ত্রাণকর্তা। অত বড় খুনী আমি কোন দিনই হতে পারব না।'

'চেষ্টা চালিয়ে যান, হতেও পারেন,' গম্ভীর মুখে বলল শিরি। 'মার্শাল ফচের দিন গত হয়েছে, আজ আরও সাংঘাতিক মারণাস্ত্র উপহার পাচ্ছেন আপনারা। অনেক নতুন নতুন কৌশলও জানা আছে আপনার, বাজি ধরে বলতে পারি, এত কৌশল ফচ সাহেবেরও জানা ছিল না।' ঝট্ করে চিবুকটা আরও একটু উঁচু করে কঠিন সুরে জানতে চাইল শিরি, 'আপনার সহকারী আনিস আহমেদও, আশা করি, আপনার আদর্শে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী?'

'অবশ্যই,' বলল রানা। 'এবং তুমি যে এখনও তার আদর্শটাকে মেনে নেয়ার মত পরিণত হওনি, সস্তা আদর্শের ডোবায় হাবুডুবু খাচ্ছ, তাও সে জানে। সেজন্যেই তো আজও তোমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়নি সে।'

মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল শিরির চেহারা। বিচলিত দেখাচ্ছে ওকে। দিশেহারার মত অতীতের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল দ্রুত। সত্যিই তো, ভাবছে সে, এত দিনের এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় আনিসের সাথে, মনে মনে সে এবং তার বাবা ধরেই নিয়েছে আনিস তাকে বিয়ে করবে, কিন্তু কই, আজ পর্যন্ত প্রস্তাব দেয়া তো দূরের কথা, প্রসঙ্গটা তুললেই কেন যেন এড়িয়ে যায় সে।

'আপনার কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না,' বলল শিরি। 'আনিসের আদর্শ বা পেশা সম্পর্কে কখনও কোন বাজে মন্তব্য করিনি আমি।'

'মুখে করোনি,' গম্ভীরভাবে বলল রানা, 'কিন্তু আনিস তোমার মনোভাব ঠিকই বুঝতে পারে। সেজন্যেই তো আমার কাছ থেকে অনুমতিটা আজও চাইছে না সে।'

বিমূঢ় দেখাচ্ছে শিরিকে। 'আপনার কাছ থেকে আবার কিসের অনুমতি?'

'তাও জানো না?' কৃত্রিম বিস্ময়ের সাথে বলল রানা, 'কেন, আনিস তোমাকে কিছু বলেনি এ-ব্যাপারে?'

'কি বলছেন আপনি? কোন্ ব্যাপারে...'

'বিয়ের ব্যাপারে,' হাসল রানা। 'তেমন কড়াকড়ি কিছুই নেই, তবে এটা একটা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। বরং বলা উচিত, আমার সহকর্মীরাই এই নিয়মটা চাপিয়েছে আমার ওপর। ফর্মাল একটা অনুমতি চাওয়া হয় আমার কাছে। মেয়েটা কেমন, সত্যি ভাল কিনা, ছেলেটার সাথে মেলে কিনা ইত্যাদি নানা বিষয় আমি ভেবে দেখি, তারপর হয় অনুমতি দিই, না হয় নিষেধ করে দিই।'

পরিবেশ, অভিমান, রাগ সমস্ত ভুলে ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইল শিরি, 'আমার সম্পর্কে আপনার কি ধারণা, মাসুদ ভাই? আমি ভাল মেয়ে নই?'

'আসলে তুমি খুবই ভাল মেয়ে,' হেসে ফেলে বলল রানা, 'তবে...'

'তবে?' নিদারুণ উত্তেজনায় গলাটা প্রায় বুজে এল শিরির।

'একটু বেশি কথা বলো, এই আর কি,' বলল রানা। 'তাছাড়া, আনিসের পেশার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নেই। ওর আদর্শের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'তার মানে?' বিহ্বল, হতাশ দেখাচ্ছে শিরিকে। 'তার মানে কোন আশা নেই আমার?'

'একেবারে যে নেই তাই বা বলি কি করে।' গম্ভীর হয়ে উঠেছে রানা। 'মানুষের মনে কখন কি পরিবর্তন হয় তা কি কেউ আগে থেকে বলতে পারে? একদিন হয়তো তোমার মনেও আনিসের পেশা সম্পর্কে শ্রদ্ধা আসবে। ওর আদর্শের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার জন্যে মানসিকভাবে তৈরি হয়ে উঠবে...'

'গত কয়েক ঘণ্টায় সব ধারণা পাল্টে গেছে আমার, মাসুদ ভাই,' দ্রুত কাতর কণ্ঠে বলল শিরি। 'এতদিন ভুল বুঝেছি, এখন আনিসের পেশা, আপনাদের পেশা, আপনাদের সবার আদর্শ সম্পর্কে আমার কোন অভিযোগ নেই। জীবন-মৃত্যুকে এভাবে দেখার শিক্ষা বা সুযোগ হয়নি আমার এর আগে।'

বিবেচনার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল রানা। গম্ভীর ভাবে বলল, 'তাহলে তো তেমন কোন বাধা দেখতে পাচ্ছি না।'

নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না শিরি। 'কি বলছেন...মানে...'

হঠাৎ অন্যমনস্ক দেখাল রানাকে। যেন শিরির কথা শুনতেই পায়নি ও।

'মাসুদ ভাই, আপনি চুপ করে আছেন কেন?' আকুল হয়ে জানতে চাইল শিরি।

ধীরে ধীরে শিরির দিকে ফিরল রানা। জানতে চাইল, 'কি বিষয়ে যেন আলাপ করছিলাম আমরা?'

'বিয়ে, আমার...মানে, আমার আর আনিসের বিয়ে সম্পর্কে,' মরিয়া হয়ে খেই ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে শিরি।

'ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে,' বলল রানা। 'বলতে চাইছিলাম, কোন চিন্তা নেই, তোমাকেই বিয়ে করবে আনিস।'

'কিন্তু,' ব্যগ্রভাবে জানতে চাইল শিরি, 'আজও তাহলে প্রস্তাব দেয়নি কেন সে?'

'ও কেন প্রস্তাব দেবে?' আকাশ থেকে পড়ল যেন রানা। 'আমার সহকর্মীদের বিয়ের প্রস্তাব আমিই দিয়ে থাকি।'

'তাহলে...তাহলে, আপনি...মানে, প্রস্তাবটার কথা বলছি...'

অতি কষ্টে হাসি চেপে রেখেছে রানা। গম্ভীরভাবে বলল, 'বলো, বলো। ইতস্তত কোরো না। মনের মধ্যে কথা চেপে রাখতে নেই।'

'মানে, আমি বলতে চাইছি,' গলায় ঢোক আটকে যাচ্ছে শিরির, 'প্রস্তাবটা কবে নাগাদ আপনার কাছ থেকে পাব বলে আশা করতে পারি আমি?'

'এখুনি।'

'এখুনি?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। হাসছে ও। জানতে চাইল, 'মিস শিরি ফারহানা, আমার সুযোগ্য সহকর্মী মি. আনিস আহমেদ আপনার জন্যে পাগল। আপনি কি দয়া করে তাকে বিয়ে করে ধন্য করতে রাজী আছেন?'

ঢোক গেলার সময়টুকও পেল না শিরি, পেছনে নাফাজ মোহাম্মদের খুক্ খুক্ কাশির আওয়াজ শোনা গেল।

রেগেমেগে ঝট্ করে ঘাড় ফেরাল শিরি। বাবাকে ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমানের সুরে বলল, 'অসময়ে হাজির হওয়ার ব্যাপারে তুমি একটা প্রতিভা, ড্যাডি।'

'আসলে বলা উচিত, সুসময়ে, তাই না?' নাফাজ মোহাম্মদ হাসছেন। 'যাক, অনেক দিনের একটা দুশ্চিন্তা মাথা থেকে নেমে গেল, সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ। আমি জানি, তোমার বিয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে মি. রানার মুখের এই কথা আনিসের মুখের কথার চেয়ে কম দামী নয়। আনিস তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুক এই কামনা করি। তোমাদের ওপর আর্শীবাদ রইল আমার।' রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'এবার বলুন, মি. রানা, রাতের জন্যে সাগর কন্যার নিরাপত্তা ব্যবস্থা পাকা করা হয়েছে

তো?'

'সম্ভাব্য সব রকম সতর্কতা নেয়া হচ্ছে,' বলল রানা।

'আপনার ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস,' আন্তরিক স্বীকৃতি দিলেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'এবার আমি যাই, একটু ঘুমুতে চেষ্টা করি।'

'চলো বাবা, আমারও ঘুম পেয়েছে,' বলে বাবার পিছু নিল শিরি।

কিন্তু একটা ভুল করে যাচ্ছেন নাফাজ মোহাম্মদ। রানার ওপর এতটা আস্থা রাখা উচিত হয়নি তাঁর। ভুল সবারই হয়, ছোট্ট একটা ভুল করে বসেছে রানাও, নিজের অজ্ঞাতসারেই। রেডিও অপারেটরকে ডিউটি থেকে অব্যাহতি দেয়া উচিত হয়নি ওর। কারণ, অপারেটর ডিউটিতে থাকলে অবশ্যই রেডিওর মাধ্যমে নিটলে রোয়ান আর্মারী লুঠ হবার খবরটা শুনতে পেত। নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্র চুরি হয়েছে শুনলে সাথে সাথে রানাকে কথাটা জানাতে ভুল করত না।

খবরটা শুনলে দুইয়ে-দুইয়ে চার যোগ করে নিতে অসুবিধে হত না রানার।

প্রায় তিন ঘন্টা হতে চলল শান্তিতে ঘুমাচ্ছেন নাফাজ মোহাম্মদ। ঠিক এই মুহূর্তে সাংঘাতিক ব্যস্ততার মধ্যে সময় কাটছে হেকটরের ডান হাত ময়নিহানের। পঞ্চাশ হাজার টন তেল খালাস করে ট্যাঙ্কারটাকে দূর সাগরে নিয়ে এসেছে সে, দিগন্তরেখার আড়ালে এসে কিছু সময় অপব্যয় করে ফিরে এসেছে আবার জাহাজের একমাত্র এঞ্জিন চালিত লাইফবোট নিয়ে, সাথে দু'জন সহকারী আর নিদারুণ একটা দুঃসংবাদ। বন্দর কর্তৃপক্ষকে অতি দুঃখের সাথে জানাল সে, প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের ফলে ট্যাঙ্কার রকেট তার ক্রুসহ ডুবে গেছে। কোন রকমে তারা শুধু এই তিনজন প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছে।

আসল ঘটনা, এই মুহূর্তে দক্ষিণ পানামার একটা বন্দরের দিকে তীরবেগে ছুটে চলেছে রকেট। রকেটের ক্রুদেরকে মাঝ সাগরে ফেলে দেয়া হয়েছে, সাঁতার কেটে তারা যাতে কোন ভাবেই তীরে পৌঁছুতে না পারে, তারও ব্যবস্থা করে এসেছে ময়নিহান। ক্যাপ্টেন সহ সমস্ত ক্রুর হাত-পা নাইলনের রশি দিয়ে বেঁধে ফেলেছে আগেই। ট্যাঙ্কারটা এখন চালাচ্ছে ময়নিহানের নিজের লোকেরা।

এমন একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটায় সরকারীভাবে ব্যাপক দুঃখ এবং শোক প্রকাশ করা হলো, কিন্তু কেউ একবার ভুলেও সন্দেহ প্রকাশ করল না যে একটা ট্যাঙ্কার যখন বিস্ফোরিত হয় তখন তার লাইফবোট অক্ষত অবস্থায় রক্ষা পেতে পারে না। সরকারীভাবে যাতে এ-ব্যাপারে কোন প্রশ্ন তোলা না হয় তার ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছে ময়নিহান। কোন কাজ কাঁচা রাখে না সে।

খুদে একটা এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছে একটা জেট প্লেন। যথাবিহিত সীল মারা হলো ওদের পাসপোর্টে। ময়নিহান আর তার দুই বন্ধু গুয়েতেমালার একটা ফ্লাইট প্ল্যান নিয়ে আকাশে চড়ল।

কয়েক ঘন্টা পর হিউসটন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে পৌঁছুল ওরা। সময় নষ্ট না করে একটা দূর-পাল্লার হেলিকপ্টার চার্টার করে রওনা হয়ে গেল ময়নিহান গালফ্ অভিমুখে।

নিবিড় ঘুমের চার ঘণ্টা অতিবাহিত হতে চলেছে নাফাজ মোহাম্মদের। ডেপথ চার্জের প্রচণ্ড বিস্ফোরণেও সে ঘুম ভাঙল না তাঁর। কিন্তু হেকটর কথা বলতে চায়, তাই বাধ্য হয়ে চোখ মেলে তাকাতে হলো তাঁকে। বিছানা থেকে না নেমেই ফোনের রিসিভার হাতে নিলেন তিনি। অশ্রাব্য ভাষায় কিছুক্ষণ গালাগালি করার পর হেকটর তাঁকে জানাল, তিনি নাকি তার আরও তিনজন লোককে খুন করেছেন। চোখ দুটো বিস্ফারিত করে তার সামনে দাঁড়ানো রানাকে তিনি প্রশ্ন করলেন, কথাটা সত্যি নাকি? মাথা ঝাঁকাল রানা। ফোনের রিসিভার রেখে দিয়ে আবার চোখ বুজলেন নাফাজ মোহাম্মদ। ঠোঁটের কোনায় হাসিটুকু নিয়েই আবার ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি।

সাগর কন্যার পশ্চিম পা ধ্বংস করার জন্যে আবার চেষ্টা চালিয়েছিল হেকটর। যতটা আশা করা গিয়েছিল তার সবটুকুই করেছে ডেপথ চার্জটা। বারজেনের লোকেরা সার্চলাইটের আলো ফেলে দু'জন ডাইভারের লাশ পানির ওপর আবিষ্কার করেছে। যে বোটটা বয়ে নিয়ে এসেছিল এদেরকে সেটার তেমন কোন ক্ষতি হয়নি, তা বোঝা গেল ডিজেল এঞ্জিনের আওয়াজ শুনে। দ্রুত অকুস্থল ত্যাগ করে চলে গেছে সেটা। পালাবার কায়দাটা অবশ্য অনেকদিন মনে থাকবে রানার, কারণ সত্যি বড় বিচিত্র একটা কৌশল অবলম্বন করল বোটের ক্যাপটেন। সোজা ছুট না দিয়ে বোটটা নিয়ে সাগর কন্যার নিচে ঢুকে পড়ল সে। অপরপ্রান্তে ওরা পৌঁছুবার আগেই রিগের নিচ থেকে বেরিয়ে অন্ধকার আর বৃষ্টির মধ্যে গা ঢাকা দিল। বারজেনের লোকেরা কামান দাগতে চেয়েছিল, কিন্তু কোন লাভ নেই জেনে তাদেরকে নিষেধ করেছে রানা।

লুইসিয়ানা। চারদিকে ফাঁকা জায়গা, মাঝখানে একটা বড়সড় মোটেল। মোটেলটার মালিক নাফাজ মোহাম্মদ, কিন্তু ব্যবস্থাপক সাগর কন্যার কমান্ডার লিল হাম্মাম। সাগর কন্যার রিলিফ ক্রুরা তাদের সাপ্তাহিক ছুটির প্রতিটি সেকেন্ড কাটায় এই মোটেলের চৌহদ্দির ভেতর।

প্রচুর খাবার, মদ, সিনেমা, মেয়েমানুষ, টিভি আর নাচ-গানের ব্যবস্থা রয়েছে এই মোটেলে। ছুটি উপভোগরত একজন ক্রুর মনে যত রকম শখ-সাধ জাগতে পারে তার সবই মেটাবার সুবন্দোবস্ত আছে এখানে। ক্রুরা যতক্ষণ থাকে এখানে, একবারও তাদের বাইরে বেরুবার ইচ্ছা হয় না। আনন্দ বিনোদনের আকর্ষণটাই যে শুধু তাদেরকে আটকে রাখে তা নয়, প্রতি নয় জনের আটজনকেই পুলিস বিভিন্ন অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে খুঁজছে। কারও কারও বিরুদ্ধে রয়েছে গ্রেফতারী পরোয়ানা। তারা জানে, এটা নাফাজ মোহাম্মদের মোটেল বলে কোন পুলিস অফিসারের ইচ্ছা হবে না এর ভেতর পা রাখে।

আগন্তুকেরা এল রাত বারোটায়। সংখ্যায় তারা বিশজন, নেতৃত্ব দিচ্ছে বেলটন নামে এক প্রকাণ্ডদেহী লোক। হেকটরের সহকারীদের মধ্যে এই লোকটাই সবচেয়ে নিষ্ঠুর, কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে আহত লোককে জুতোর ডগা দিয়ে

খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারার রেকর্ড আছে তার। ক্রুরা ব্লু-ফিল্ম ইত্যাদি দেখার পর ক্লান্ত বিধ্বস্ত শরীর নিয়ে রাস্তায় পড়ে থাকা ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত ঘুমাচ্ছে। সবার নাকের কাছে ক্লোরোফর্ম ভেজানো তুলো ধরল বেলটনের লোকেরা। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাদের হাত-পা বাঁধার কাজও সেরে ফেলল। স্টাফদের মধ্যে মাত্র দু'জন লোক এখনও জেগে বসে জুয়া খেলছে, বাধা যতটুকু দেবার তারাই দিল, বেলটন তাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডেকে হাসতে হাসতে গুলি করে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিল দুটো হৃৎপিণ্ডই।

স্টাফ আর ক্রুদেরকে ভ্যানে তুলে নিয়ে আসা হলো একটা নির্জন ওয়্যারহাউজে। সবাই এখনও অজ্ঞান, চব্বিশ ঘণ্টার আগে কারও জ্ঞান ফিরে আসার কোন সম্ভাবনাও নেই, তবু কোন ঝুঁকি নিল না বেলটনের লোকেরা। প্রত্যেকের মুখের ভেতর প্রচুর তুলো গুঁজে দেয়া হলো। যদিও জ্ঞান ফেরার পর চেঁচিয়ে গলা ফাটালেও কারও কানে সে আওয়াজ পৌঁছাবে না, কারণ আশপাশে এক মাইলের মধ্যে কোন লোক বসতি নেই। দু'জন কারবাইনধারী গার্ড পাহারা দিচ্ছে ওদেরকে।

ছয় ঘণ্টা অতিবাহিত হতে চলেছে নাফাজ মোহাম্মদ বিছানায় উঠেছেন। এখনও অঘোরে ঘুমাচ্ছেন তিনি। ঠিক এই মুহূর্তে তাঁর একটা হেলিকপ্টারে চড়ে বসেছে বেলটন আর তার দলবল। 'কপ্টারের পাইলট দু'জন তাদেরকে প্যাসেঞ্জার হিসেবে নিতে আপত্তি জানাল বটে, কিন্তু কারবাইন, পিস্তল ইত্যাদি দেখে সুবোধ বালক বনে গেল ওরা।

সী-উইচ।

খালি হেলিপ্যাডে একটা 'কপ্টার এসে নামল। খুলে গেল দরজা। দোর-গোড়ায় দেখা যাচ্ছে ময়নিহানকে।

প্রায় সেই একই মুহূর্তে আরেকটা হেলিকপ্টার এসে নামল সাগর কন্যার বুকে। সেটা থেকে নেমে এলেন একজন মাত্র আরোহী, ডাক্তার কিপলিং। ক্লান্ত, ঘর্মাক্ত বৃদ্ধ ডাক্তারের বয়স আরও যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। সোজা সিক বে-তে চলে এলেন তিনি, কাপড়চোপড় না খুলেই, একজন মুমূর্ষু রোগীর মত শুয়ে পড়লেন। ঘুমাবার চেষ্টা করছেন। বিজ্ঞানী মি. শমসের ভাল চিকিৎসকদের হাতে ভাল অবস্থায় আছে, এ-খবরটা নাফাজ মোহাম্মদকে পৌঁছে দেয়া দরকার, জানেন তিনি। কিন্তু ভাবছেন, ভাল খবর একটু পরে দিলেও কোন ক্ষতি নেই।

নয়

সাগর কন্যা। রাত চারটে।

ঘুম ভাঙল নাফাজ মোহাম্মদের। তাজা, ঝরঝরে লাগছে শরীরটা। মাথার ওপর

দুই হাত তুলে শরীরটাকে এপাশ ওপাশে কাত করে আড়মোড়া ভাঙলেন তিনি, তারপর এমব্রয়ডারী করা একটা ড্রেসিং গাউন গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলেন প্ল্যাটফর্মে।

কখন যেন থেমে গেছে বৃষ্টি। পুব দিগন্তরেখার কাছে ক্ষীণ আলোর আভাস। মাথার ওপর নির্মেঘ আকাশ। আবহাওয়াটা আজ ভালই যাবে। রাতে কোন রকম বিপদ-আপদ দেখা দেয়নি ভেবে বিরাট একটা স্বস্তি বোধ করলেন নাকাজ মোহাম্মদ। বাথরুম, শাওয়ার ইত্যাদি সারার জন্যে নিজের কোয়ার্টারে ফিরে এলেন তিনি।

ওদিকে, এইমাত্র ঘুম থেকে জেগে চোখ কচলাতে কচলাতে রেডিওরুমে ঢুকছে অপারেটর। পুরো রাতটা অঘোরে ঘুমিয়েছে সে, কিন্তু ঘুম ভাঙতে না ভাঙতে কেমন যেন খুঁত-খুঁত করছে তার মন, তাই মুখ না ধুয়েই চলে এসেছে রেডিওরুমে। রেডিও অন করার দুই মিনিট পর একটা নিউজ ব্রডকাস্ট কানে আসতেই হিম শীতল একটা আতঙ্কের ঢেউ বয়ে গেল তার সারা শরীরে। রেডিওরুম থেকে বেরিয়ে পড়ল সে। হন-হন করে এগোচ্ছে রানার কেবিনের দিকে। সাগর কন্যার আর সব লোকের মত, এমন কি কমান্ডার লিল হাম্মাম এবং জিউসেপ বারজেন পর্যন্ত, অপারেটরও জানে, বিপদের সময় বা জরুরী অবস্থায় একমাত্র মি. সাদ্দামের সাথে যোগাযোগ করা দরকার। খবরটা নাকাজ মোহাম্মদকে জানাবার কথা তার মনেই পড়ল না।

দাড়ি কামাচ্ছে রানা, এই সময় নক করে কেবিনে ঢুকল অপারেটর। ক্লান্ত দেখাচ্ছে রানাকে, সারারাত একবারও পিঠ ঠেকায়নি বিছানায়। 'আশা করি কোন খারাপ খবর নিয়ে আসোনি?' মৃদু গলায় বলল ও।

'ঠিক বুঝতে পারছি না, স্যার,' রানার হাতে একটা টেলিটাইপের ফিতে ধরিয়ে দিয়ে বলল অপারেটর।

দাড়ি কামানো থামিয়ে মেসেজটা পড়তে শুরু করল রানা।

'গতকাল বিকেলে নিটলে রোয়ান আর্মারী থেকে দুটো ট্যাকটিকাল নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্র চুরি গেছে। ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ সন্দেহ করছে, প্লেন বা হেলিকপ্টারযোগে দক্ষিণ দিকে, গালফ্ অব মেক্সিকোর কোন অজ্ঞাত গন্তব্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওগুলো। এই খবরটাকে জরুরী বিপদ সঙ্কেত হিসেবে গ্রহণ করার অনুরোধ করা হচ্ছে। সতর্ক থাকার জরুরী আবেদন দুনিয়া জুড়ে প্রচার করা হয়েছে। এ-সংক্রান্ত ব্যাপারে তথ্য দিতে পারেন এমন সমস্ত ব্যক্তিকে বিশেষ অনুরোধ...'

'মাই গড!' টেলিটাইপের ফিতে ধরা হাতটা একটু একটু কাঁপছে রানার। 'অপারেটর!' দম নিয়ে দু'বার সম্বোধন করল লোকটাকে ও, যাতে গুরুত্বটা বুঝতে ভুল না করে, 'অপারেটর, যেভাবে পারো ওই আর্মারীর সাথে যোগাযোগ করো। কুইক! মি. নাকাজের নাম ব্যবহার করো। এক্ষুণি আসছি আমি।'

চরকির মত আধপাক ঘুরে ঝড়ের বেগে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল অপারেটর।

ত্রিশ সেকেন্ড পর রেডিওরুমে পৌঁছুল রানা। 'এরই মধ্যে যোগাযোগ করেছি,'

ওকে বলল অপারেটর। 'কিন্তু মুখ খুলতে চাইছে না ওরা, স্যার।'

'রিসিভার আমাকে দাও,' ছোঁ মেরে কেড়ে নিল রিসিভারটা রানা। 'হ্যালো? মি. নাফাজ মোহাম্মদের রিগ সাগর কন্যা থেকে আমি মাসুদ রানা বলছি।' নিজের পরিচয় গোপন রাখার এখন আর কোন মানে নেই, এটুকু পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা। 'আপনি কে বলছেন?'

'কর্নেল প্রাইজ।' রানার বলার ভঙ্গিতে জরুরী ভাব থাকলেও কর্নেলকে নির্লিপ্ত এবং নির্বিকার বলে মনে হলো রানার।

'আপনি একজন মেজর জেনারেল হলে ভাল হত,' বলল রানা। 'আমার নামটা শোনার সাথে সাথে টনক নড়ে তাঁদের। যাই হোক, মি. নাফাজ আমার একজন ক্লায়েন্ট। পেন্টাগন বা স্টেট ডিপার্টমেন্টে ফোন করে নামটা উচ্চারণ করে জেনে নিন আমার পরিচয়।' অপারেটরের দিকে তাকাল রানা। কথাগুলো বলছে তাকেই কিন্তু এত জোরে বলছে যাতে কর্নেল প্রাইজও শুনতে পায়। 'মি. নাফাজকে ডাকো এখানে, কুইক।···দুত্তোরী ছাই, গোসল করছে নাকি বুড়ো আঙুল চুষছে—ওসব আমি শুনতে চাই না, এখানে নিয়ে এসো তাঁকে।' রিসিভারের দিকে মুখ ফেরাল আবার রানা। 'কর্নেল প্রাইজ, আপনার র‍্যাঙ্কের একজন অফিসারের জানা উচিত যে মি. নাফাজের একমাত্র মেয়েকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল। তাঁকে উদ্ধার করার দায়িত্ব নিয়েছিলাম আমি, এবং উদ্ধার করেছি। কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, এই অয়েল রিগ, সাগর কন্যাকে ধ্বংস করে দেবার হুমকি দেয়া হয়েছে। এরই মধ্যে দু'বার সে চেষ্টা করাও হয়েছে। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে ওরা। পেন্টাগনে আরেকবার ফোন করে জেনে নিতে পারবেন, তারা তিনটে বিদেশী যুদ্ধ জাহাজকে মাঝ-সাগরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এগুলো সাগর কন্যাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে আসছিল। যাই হোক, এবার মন দিয়ে আমার কথা শুনুন। নিটলে রোয়ান আর্মারী থেকে যে ট্যাকটিকাল নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্র চুরি গেছে, ওগুলো সম্পর্কে সমস্ত তথ্য জানতে চাই আমি। এই মুহূর্তে। আপনি যদি সহযোগিতা না করেন, কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগে গুরুতর বিপদে পড়ে যাবেন—অন্তত যাতে পড়েন তার ব্যবস্থা আমি করব। কথা দিচ্ছি।'

সম্পূর্ণ বদলে গেছে এবার কর্নেল প্রাইজের গলার আওয়াজ। মিন মিন করে বলল, 'আমাকে ভয় দেখাবার কোন দরকার নেই।'

'এক সেকেন্ড,' বলল রানা। 'মি. নাফাজ রেডিওরুমে পৌঁছেচেন।' পরিস্থিতিটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে জানাল নাফাজ মোহাম্মদকে ও। গলা চড়িয়েই কথা বলল, যাতে কর্নেল শুনতে পায়।

'নিউক্লিয়ার ব্লাডি বক্সস্!' বাঘের মত হুঙ্কার বেরিয়ে এল নাফাজ মোহাম্মদের ভারী গলা থেকে। 'সেজন্যেই হেকটর আমাদেরকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার হুমকি দিয়েছে।' ছোঁ মেরে রানার হাত থেকে রিসিভারটা নিলেন তিনি। 'আমি এখানে নাফাজ মোহাম্মদ। সেক্রেটারি অভ স্টেট ড. স্টিফেন কাসলারের সাথে আমার একটা হটলাইন আছে। পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে তার নাগাল পেতে পারি আমি। তাই চাও তুমি?'

'তার কোন প্রয়োজন নেই, মি. নাফাজ, স্যার।'

'তাহলে ওই মারণাস্ত্র সম্পর্কে যা কিছু জানাবার আছে সব গড় গড় করে জানিয়ে দাও মি. মাসুদ রানাকে।'

'ইয়েস, স্যার!' বলল কর্নেল। নিজেকে ঢোক গেলার সময় পর্যন্ত না দিয়ে মারণাস্ত্রগুলো সম্পর্কে তথ্য আওড়াতে শুরু করল সে।

শুনছে রানা।

ভুয়া কর্নেল ফারগুসনকে যে নিউক্লিয়ার বোমার বর্ণনা দিয়েছে ক্যাপ্টেন নরডিক, তার মধ্যে কিছু ভুল আছে। 'কিন্তু,' বলছে কর্নেল প্রাইজ, 'ক্যাপ্টেন নরডিক একজন নতুন অফিসার, তাই এ-ধরনের ভুল করা তার পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়। ক্যাপ্টেন ম্যাক্সিমাম টাইম মোট ত্রিশ মিনিট বলেছে, আসলে ত্রিশ মিনিট নয়, ওটা হবে নব্বুই মিনিট। আরেকটা অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উল্লেখই করেনি সে। তা হলো, রেডিও সিগন্যালের সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটানো সম্ভব। এর জন্যে আলাদা গম্বুজ আকৃতির ছোট ডিভাইস রয়েছে একটা—সেটার সাহায্যে দূর থেকেও বোমাগুলো ফাটানো যায়। এতে রয়েছে ঘড়ির একটা ডায়াল আর কালো একটা বোতাম। শেষ মুহূর্তে কেউ যদি বোমাগুলোকে অকেজো করে দিতে চায় তাহলে এই কালো বোতামটা একবার চাপ দিলেই হবে, থেমে যাবে ঘড়ির কাঁটা। তবে, আবার যদি চাপ দেয়া হয় বোতামে,সাথে সাথে ডিটোনেটিং মেকানিজম আবার চালু হয়ে যাবে বোমার গায়ে। বলা বাহুল্য, ঘড়ির ডায়ালে কাঁটাগুলোও ঘুরতে শুরু করবে আবার।

'ধরুন, ওগুলো যদি আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়? কাছাকাছি প্রকাণ্ড একটা অয়েল স্টোরেজ ট্যাঙ্ক রয়েছে।'

'ইস্পাতের চেয়ে তেল জিনিসটা আরও তাড়াতাড়ি বাষ্পে পরিণত হয়,' বলল কর্নেল প্রাইজ। 'এর বেশি বলবার কিছু নেই আমার।'

'ধন্যবাদ।'

'আপনাদের ওদিকে এক স্কোয়াড্রন সুপারসনিক ফাইটার বম্বার পাঠানো দরকার বলে মনে হচ্ছে আমার,' বলল কর্নেল। 'কিন্তু তা পাঠাতে হলে প্রথমে আমাকে পেন্টাগনের অনুমতি নিতে হবে...'

'অসংখ্য ধন্যবাদ।'

রানাকে নিয়ে নিজের কোয়ার্টারে এলেন নাফাজ মোহাম্মদ।

'ওটা আপনার সন্দেহ, তাই না?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'আসলে ওগুলো আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে কিনা তা আপনি আমি বা আমরা কেউ জানি না।'

'তবে,' বলল রানা। 'ব্যবহার করা হবে ধরে নেয়াই ভাল।'

'তা ঠিক,' বললেন নাফাজ মোহাম্মদ। পাইপ ধরালেন তিনি। 'কিন্তু, একটা ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকছে না। আমাদের রাডার, সোনার আর সেনসরি রুমে যদি সারাক্ষণ লোক রাখি—নিউক্লিয়ার ডিভাইসগুলো রেখে যাবার জন্যে কিভাবে আসবে হেকটর?'

'কিভাবে আসবে তা বলা মুশকিল,' বলল রানা। 'তবে আসার চেষ্টা করবে সে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

নাফাজ মোহাম্মদের হেলিকপ্টার থেকে সী-উইচের সাথে যোগাযোগ করছে বেলটন। 'পনেরো মিনিট দূরে রয়েছি আমরা।'

উত্তর দিল হেকটর নিজে, 'দশ মিনিটের মধ্যে আকাশে উঠছি আমরা।'

সাগর কন্যা। নাফাজ মোহাম্মদের কামরা। একটা ওয়াল-রিসিভার ঘড়-ঘড় করে উঠল। অপারেটর জানাচ্ছে, 'উত্তর-পূব দিক থেকে একটা হেলিকপ্টার আসছে।'

'আসুক। চিন্তার কিছু নেই। রিলিফ ক্রু নিয়ে আসছে।'

শাওয়ারটা পুরো করতে গেছেন নাফাজ মোহাম্মদ, এই সময় রিলিফ হেলিকপ্টার নামল সাগর কন্যার হেলিপ্যাডে। সাদা কোট আর চশমা পরে ল্যাবরেটরিতে রয়েছে রানা, পুরোদস্তুর একজন তরুণ বিজ্ঞানীর মত দেখাচ্ছে ওকে।

সিক বেতে এখনো ঘুমাচ্ছেন ডাক্তার কিপলিং।

পাইলটদের মুখে রুমাল আর হাতে দড়ি বাঁধল হেলিকপ্টারের আরোহীরা, তাছাড়া আর কোন ক্ষতি করল না। শান্ত এবং সুশৃঙ্খল ভঙ্গিতে 'কপ্টার থেকে সাগর কন্যার প্ল্যাটফর্মে নামছে তারা। এখানে আগে থাকতে উপস্থিত ড্রিল ডিউটি ক্রুরা নবাগতদের উপস্থিতি দেখেও দেখছে না। কাজ ছাড়া কোন ব্যাপারেই কোন উৎসাহ নেই এদের। কর্তৃপক্ষ মহল থেকে বহুবার সাবধান করে দেয়া হয়েছে সবাইকে, যার যার নিজের চরকায় তেল দেবে, কোথায় কি ঘটছে সেদিকে নজর দেবার কোন দরকার নেই কারও। তাছাড়া, ব্যক্তিগত কারণেও অপরিচিত লোকজনদেরকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে ক্রুরা।

নবাগতরা অপরিচিত। কিন্তু তাতে আশ্চর্য হবারও কিছু নেই। কোস্ট বরাবর লাইন দিয়ে বিভিন্ন আকারের নয়টা ড্রিলিং রিগ রয়েছে নাফাজ মোহাম্মদের। এর সবগুলোই আইনসঙ্গত ভাবে লীজ নেয়া এলাকায় তেল খোঁজে আর তোলে। একটানা বেশি দিন কোন রিগেই কাজ করতে দেয়া হয় না ক্রুদেরকে। একটা পালা-বদলের ধাঁচে ছক বাঁধা নিয়ম অনুসরণ করে এক রিগ থেকে আরেক রিগে ক্রুদেরকে স্থানান্তরিত করা হয়। ফলে প্রায়ই নতুন নতুন অচেনা মুখ দেখার সুযোগ হয় ক্রুদের। নবাগতদের সবার কাঁধ থেকে বহুল পরিচিত কাপড়ের ব্যাগ ঝুলছে। এই ব্যাগে যার যার কাপড়-চোপড় ইত্যাদি নিয়ে আসে ক্রুরা। কিন্তু নবাগতদের ব্যাগগুলোয় কাপড়চোপড় রয়েছে শুধু ওপরে, সেগুলোর নিচে রয়েছে মেশিন-পিস্তল আর হরেক রকমের মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র।

কভির মাধ্যমে পাওয়া তথ্য হেকটর আগেই জানিয়ে রেখেছে বেলটনকে, সুতরাং পরিষ্কার জানে সে সাগর কন্যায় নামার পর সোজা কোথায় যেতে হবে তাকে। অলস ভঙ্গিতে টহল দিচ্ছে দু'জন গার্ড, হাতছানি দিয়ে তাদেরকে কাছে ডাকল বেলটন। চোখেমুখে একরাশ বিরক্তি নিয়ে এগিয়ে আসছে বারজেনের লোক

দু'জন। ওদের কাঁধের সাথে ঝুলছে দুটো অটোমেটিক কারবাইন। ওরা যখন হাত পাঁচেক দূরে, তখন হঠাৎ হাসতে শুরু করল বেলটন, সেই সাথে সাইলেন্সার ফিট করা পিস্তলটা পেছন থেকে সামনে নিয়ে এসে গুলি করল পরপর দু'বার।

দুই গার্ডের হৃৎপিণ্ড ভেদ করে গেল বুলেট দুটো। সারবেঁধে এগোচ্ছে বেলটনের লোকেরা, ঘাড় ফিরিয়ে তারা একবার তাকাবার কষ্টটুকু পর্যন্ত স্বীকার করছে না—একটা দড়াম শব্দে একসাথে দু'জনেই লুটিয়ে পড়ল প্ল্যাটফর্মের ওপর।

দল নিয়ে দুই নম্বর কোয়ার্টারের সামনে পৌঁছুল বেলটন। প্ল্যাটফর্মে ব্যাগগুলো নামিয়ে সবাই তারা যার যার ব্যাগ খুলছে।

পনেরো সেকেন্ড পর জানালাগুলো ভেঙে ফেলা হলো। একই সাথে শুরু হলো হত্যাযজ্ঞ!

মাত্র ছয় সেকেন্ড স্থায়ী হলো গুলি আর বোমাবর্ষণ। মেশিনগান ফায়ার, হ্যান্ড গ্রেনেড আর আগুনে বোমার বিকট বিস্ফোরণে কেঁপে উঠছে দুই নম্বর কোয়ার্টার। একই সাথে টিয়ার গ্যাস ভর্তি বোমা ছুঁড়ছে ওরা। ছয় সেকেন্ড স্থায়ী হলো আহতদের আর্তচিৎকার। তারপর সব নিস্তব্ধ। চুপচাপ। দু'নম্বর কোয়ার্টারের ভেতর একজন আহত লোকও নেই আর।

দু'জন গার্ডকে দেখা গেল হঠাৎ, ছুটে আসছে দু'নম্বর কোয়ার্টারের দিকে। কাঁধ থেকে কারবাইন নামাবার সময় পর্যন্ত দেয়া হলো না তাদেরকে। বেলটন নিজে সাব-মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ারে ঝাঁঝরা করে দিল তাদের শরীর।

বেঁচে থাকার দলে রয়েছে একা শুধু কমান্ডার হাম্মাম। পিছন দিকে নিজের কোয়ার্টারে ছিল সে। বারজেন আর তার দলের সব কয়জন মারা গেছে। সেই সাথে ম্যারিনো আর তার দলের লোকজনও। দু'নম্বর কোয়ার্টারেরই একটা স্টোর রূমে বন্দী করে রাখা হয়েছিল ওদেরকে।

এক নম্বর কোয়ার্টারের দিক থেকে, ঠিক সেই মুহূর্তে, একটা বাঁক নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখা গেল একদল মানুষকে। সাউন্ড প্রুফ হলেও একটানা অসংখ্য বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ এক নম্বর কোয়ার্টারের সবার কানেই অল্পস্বল্প গেছে।

চারজনের একটা দল। তিনজন পুরুষ, একটা মেয়ে। দু'জন পুরুষ সাদা কোট পরে রয়েছে, আরেকজনের পরনে জাপানী কিমোনো। মেয়েটার পরনে ঢিলেঢালা স্লীপিং গাউন। ওদেরকে দেখামাত্র বেলটনের একজন লোক পিস্তল তুলেই সবচেয়ে কাছের সাদা কোট পরা লোকটাকে লক্ষ্য করে পর পর দু'বার গুলি করল।

ধাক্কা খেল রানা, দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছে, কিন্তু কাত হয়ে দড়াম করে পড়ে গেল প্ল্যাটফর্মের ওপর। সাদা কোটে টকটকে লাল রক্ত দেখা যাচ্ছে।

নির্দয়ভাবে লোকটার কব্জিতে সাব-মেশিনগানের নল দিয়ে প্রচণ্ড একটা বাড়ি মারল বেলটন। আর্তনাদ করে উঠল লোকটা, হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেছে পিস্তলটা আগেই।

'কুত্তার বাচ্চা!' চেহারার মত বেলটনের কণ্ঠস্বরটাও হিংস্র। 'শুধু বাধা দেবে যারা, তাদেরকে! নিরীহ লোকজনদের ক্ষতি করতে নিষেধ করেছেন মি. হেক্টর।'

যে-কোন কাজ গুছিয়ে প্ল্যান মাফিক সম্পন্ন করতে ভালবাসে বেলটন। দু'জন

লোক নিয়ে একটা করে দল গঠন করল সে. মোট পাঁচটা দলে দশজন লোক। একটা দল গরু-ছাগলের মত তাড়িয়ে নিয়ে গেল ড্রিলিং রিগ ক্রুদেরকে দুই নম্বর কোয়ার্টারের ভেতর। দুই, তিন আর চার নম্বর দল যথাক্রমে সেনসরি, সোনার আর রাডার রুমে গিয়ে ঢুকল। অপারেটরদেরকে মারধোর করল না, শুধু হাত-পা বাঁধল তাদের—তারপর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সমস্ত যন্ত্রপাতি, ইকুইপমেন্ট মেশিনগান-এর ব্রাশ ফায়ারে ধ্বংস করে দিল। অপারেটররা বাঁচল কি বাঁচল না, সেদিকে খেয়ালই দিল না কেউ। পাঁচ নম্বর দলটা ঢুকল রেডিও রুমে। এখানেও অপারেটরকে রশি দিয়ে বাঁধল তারা, তবে যন্ত্রপাতিগুলো নষ্ট করল না। ফলে প্রাণে বেঁচে গেল অপারেটর।

বৃদ্ধ ডাক্তার কিপলিং ধীর, ক্লান্ত পায়ে এগোচ্ছেন বেলটনের দিকে। 'আপনিই কি দলের লীডার?'

'বলুন!' গমগম করে উঠল লাল চুলো বেলটনের ভারী গলা।

'আমি একজন ডাক্তার…'

প্রচণ্ড এক ধমক খেলেন ডাক্তার কিপলিং।

'দেখতেই তো পাচ্ছি,' বলল বেলটন। 'কম কথায় কি বলতে চান বলুন।'

হাত দিয়ে নিঃশব্দে রানাকে দেখালেন ডাক্তার কিপলিং। সাদা কোটটা ওর রক্তে রঙিন হয়ে উঠছে, প্ল্যাটফর্মের ওপর শুয়ে পা ছুঁড়ছে রানা। শরীরটা টান টান হয়ে উঠছে, মোচড় খাচ্ছে—প্রাণ বেরিয়ে যাবার আগের মুহূর্তে এই রকম হাত-পা খিঁচতে দেখা যায় মানুষকে। 'উনি একজন বিজ্ঞানী,' বললেন ডাক্তার। সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছেন। বাঁচবেন কি না সন্দেহ। আপনি যদি অনুমতি দেন, ওকে আমি সিক বে-তে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারি।'

'আপনারা নিরীহ মানুষ,' ভারী গলায় বলল বেলটন। নিজের অজান্তে জীবনের সবচেয়ে বোকার মত কথাটা উচ্চারণ করল সে। 'আপনাদের সাথে কোন বিবাদ নেই আমাদের।'

রানাকে সিক বে-তে নিয়ে আসার জন্যে আর সবাইকে সাহায্য করলেন বৃদ্ধ ডাক্তার। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গেল, পরমুহূর্তে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল রানা। হতভম্ব হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে শিরি ফারহানা। এতক্ষণ ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, সেটা থেমে গেছে। পরিবর্তে প্রথমে বিস্ময়, তারপরই রাগে বদলে গেল তার মুখের চেহারা। 'তার মানে ভান করছিলেন? ছি! এদিকে আমি কেঁদে-কেটে অস্থির হচ্ছি…'

'কাঁদলে তোমাকে আরও সুন্দর দেখায়,' বলল রানা। 'তাই, আর একটাও যদি কথা বলো, প্রচণ্ড এক গাঁট্টা মারব মাথায়—যাতে কথা না বলে শুধু কাঁদতে পারো। সবটুকু ভান নয়,' সাদা কোটে রক্তের ছাপ দেখিয়ে বলল রানা, 'এটা আসল রক্ত। আমারই।' ডাক্তার কিপলিঙের দিকে ফিরল ও। 'বাঁ কাঁধের খানিকটা চামড়া ছাড়া আর কিছু নিয়ে যেতে পারেনি প্রথম বুলেটটা। কিন্তু দ্বিতীয় বুলেটটা ডান হাতের কনুইয়ের নিচে থেকে কিছুটা মাংস নিয়ে গেছে। ভাগ্যের জোরে বিরাট একটা সুযোগ পেয়ে গেছি আমি। এখন আপনি শুধু আমাকে অত্যন্ত যত্নের সাথে

সাজিয়ে দিন। ডান হাতের কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত ব্যান্ডেজ। বাঁ হাতের কনুই থেকে কাঁধ পর্যন্ত ব্যান্ডেজ, সাথে লম্বাচওড়া একটা স্লিং। শিরি…লক্ষ্মী মেয়ে, তোমার কাছে নিশ্চয়ই ট্যালকম পাউডার আছে?'

'আছে,' মুখ ভার করে বলল শিরি।

'নিয়ে এসো, প্লীজ।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে সাদা ব্যান্ডেজে মোড়া চলমান একটা মূর্তিতে পরিণত হয়েছে রানা। বাঁ হাতের কনুই থেকে কাঁধ পর্যন্ত ব্যান্ডেজ করতে গিয়ে পিঠ আর বুকের খানিক জায়গাও বেদখল হয়ে গেছে ডাক্তার কিপলিঙের চতুর ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়ে। স্লিংটা কয়েক ফেরতা কাপড় দিয়ে তৈরি, যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। ডান হাতটাও সাংঘাতিক মোটা করা হয়েছে ব্যান্ডেজ দিয়ে। রক্তশূন্য সাদাটে দেখাচ্ছে রানার চেহারা। সিক বে থেকে বেরিয়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে নিজের কেবিন থেকে ঘুরে এল একবার।

'কোথায় যাওয়া হয়েছিল?' স্বভাবসুলভ জবাবদিহি চাওয়ার সুরে জানতে চাইল শিরি ফারহানা। চোখে রাজ্যের সন্দেহ।

'স্লিং-এর ভেতর হাত গলিয়ে গভীর তলদেশ থেকে সাইলেন্সার লাগানো পয়েন্ট থারটি-এইটটা নিমেষের জন্যে বের করে দেখাল।

'একটু ভয় নেই আপনার?' নিখাদ বিস্ময়ে বেসুরো শোনাল শিরির কণ্ঠস্বর। 'আপনি পাগল নাকি? মানুষ নয়, কসাই ওরা। আপনি একা অতগুলো পিশাচের বিরুদ্ধে কি করতে পারবেন?'

'কিছু একটা করতেই হবে,' গম্ভীর মুখে বলল রানা। 'আমার সহকর্মীর ভাবী স্ত্রীকে আমি তো আর ভেপারাইজড, মানে বাষ্প হয়ে উড়ে যেতে দিতে পারি না।'

শিরি ফারহানা এবং ডাক্তার কিপলিং একযোগে আঁতকে উঠল।

'আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না, মি. সাদ্দাম।'

'দুটো ট্যাকটিকাল নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্র চুরি করেছে হেকটর,' বলল রানা। 'এই বিশাল সাগর কন্যাকে চোখের পলকে গায়েব করে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। এই ছিল, এই নেই—সম্পূর্ণ ভোজবাজীর মত অদৃশ্য হয়ে যাবে সাগর কন্যা। সেই সাথে আমরাও।' একটু বিরতি নিল রানা। চিন্তিত দেখাচ্ছে ওকে। 'আসার সময় হয়ে গেছে হেকটরের। এবার,' ডাক্তারের দিকে ফিরল ও। 'ড. কিপলিং, আপনার প্রতি আমার একটা বিশেষ অনুরোধ। একটা উপকার করতে হবে। আপনার সবচেয়ে বড় মেডিকেল ব্যাগটা হাতে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে পড়ুন। বেলটনকে বলুন, মানবতার খাতিরে দু'নম্বর কোয়ার্টারে যেতে চান আপনি। এখনও কেউ যদি বেঁচে থাকে ওখানে, তাকে মেরে ফেলে কষ্ট থেকে রেহাই দিতে চান। ওখানে কিছু হ্যান্ড-গ্রেনেড আছে, সেগুলো আমার দরকার।'

'কাজটা করার চেয়ে করতে বলাটা কঠিন,' মাথা দুলিয়ে বললেন বুড়ো কিপলিং। 'গড, আপনার চেহারা আর চিন্তাধারা—দুটোর মধ্যে মনুষ্য সুলভ কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না আমি। আবার সেই প্রশ্নটা কুরে খাচ্ছে আমাকে—আসলে

আপনি কে?'

'আমার বস্‌,' পরিষ্কার গর্বের সুর ফুটে উঠল শিরি ফারহানার কণ্ঠস্বরে। চেহারায় আশ্চর্য একটা উজ্জ্বলতা ফুটে উঠেছে, রানাকে নিয়ে কত যেন গর্ব তার। 'শীঘ্রিই চাকরি নিচ্ছি ওঁর ফার্মে।'

অবাক চোখে শিরির মুখের দিকে চাইল রানা, তারপর মৃদু হেসে ফিরল ডাক্তার কিপলিঙের দিকে। 'চলুন, ডাক্তার।'

'এক সেকেন্ড,' কাতর কণ্ঠে বলল শিরি। দুই পা এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়াল সে। চোখ দুটো বুজে ফেলল। বন্ধ দুই চোখের কোণে চিক চিক করছে পানির দুটো বিন্দু। ঠোঁট জোড়া নড়ছে শিরির। ঘাড়ের উপর থেকে স্লীপিং গাউনের খানিকটা অংশ তুলে মাথাটা অর্ধেকের একটু বেশি ঢেকে নিয়েছে সে। আবার যখন চোখ খুলল, তাকাল রানার চোখে, কিন্তু সমস্ত কিছু ভেদ করে অনেক, অনেক দূরে চলে গেছে যেন তার দৃষ্টি। কমলার কোষ-এর মত লালচে ঠোঁট দুটো ফাঁক হলো একটু। এক হাত দিয়ে রানার গলার কাছে শার্ট খুলে ফুঁ দিল সে। পরপর তিনবার।

কঠিন, কিন্তু অবশ হয়ে গেছে রানার সারা শরীর। অন্তরের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত শিরির এই শুভ কামনাটাকে নিয়ে বিদ্রূপ করার স্পর্ধা বা ইচ্ছা কোনটাই হলো না ওর। একজন বিজ্ঞান-সচেতন মানুষ হিসেবে এটুকু অন্তত জানে রানা—আশীর্বাদ, দোয়া, শুভ কামনা যাই হোক না কেন, এর একটা প্রতিক্রিয়া আছে, যদি তা আন্তরিক হয়, হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে উঠে আসে।

চোখ পিট পিট করছেন ডাক্তার কিপলিং। চেহারায় গাম্ভীর্য, সেইসাথে অনুমোদন আর প্রশংসার ভাব। তাঁকে নিয়ে সিক বে থেকে বেরিয়ে এল রানা। ওদের গমন পথের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শিরি ফারহানা।

ঠিক এই মুহূর্তে সাগর কন্যার বুকে নামছে হেকটরের হেলিকপ্টার। প্রথমে বেরিয়ে এল হেকটর, তারপর ময়নিহান, তার পেছনে তিনজন ভুয়া সামরিক অফিসার, যারা নিটলে রোয়ান আর্মারী থেকে নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্র লুট করেছে, সবশেষে বেরিয়ে এল গেস্টন আর পাইলট। গেস্টনের চেহারাটা প্রচণ্ড রাগে বীভৎস দেখাচ্ছে। ডেপথ চার্জের প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে তার ইলেকট্রিক পুল-পুশ ইউরেনাস সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, মেরামতের অযোগ্য হয়ে পড়েছে সেটা।

মাইল চারেক দূরে দেখা যাচ্ছে একটা কোস্টগার্ড কাটারকে। সোজা সাগর কন্যার দিকে ছুটে আসছে। এটাই সেই হারিয়ে যাওয়া ড্যাঙ্গার, কুখ্যাত সান লাইট, বর্তমানের সী-উইচ।

বেলটনের সামনে এসে দাঁড়ালেন ডাক্তার কিপলিং। 'একটা অনুমতির জন্যে আবার বিরক্ত করছি আপনাকে,' বললেন তিনি। 'দু'নম্বর কোয়ার্টারে কেউ যদি বেঁচে থাকে, মানবতার খাতিরে তাকে মেরে ফেলা দরকার।'

একটা বন্ধ লোহার দরজা দেখিয়ে রূঢ় কণ্ঠে বলল বেলটন, 'ওটার ভেতর কে আছে, জানতে চাই আমি। কারণ,' নিজের একজন লোককে ডাকল সে, 'একটা বাজুকা ছুঁড়ে ভাঙো তো দেখি দরজাটা...'

'তার কোন দরকার নেই,' মৃদু, নরম গলায় বললেন ডাক্তার কিপলিং। 'আমি

একবার নক করলেই দরজা খুলে যাবে। ভেতরে কমান্ডার লিল হাম্মাম আছেন, এই রিগের বস্ তিনি—মাটির মানুষ। আমাদের মত, তাঁর সাথেও আপনাদের কোন বিবাদ নেই। এখানে তাঁর শোবার কারণ হলো, প্রাইভেসী একটু বেশি পছন্দ করেন কমান্ডার।' এগিয়ে গিয়ে দরজায় নক করলেন ডাক্তার কিপলিং। 'কমান্ডার হাম্মাম, দরজাটা খুলুন। কোন ভয় নেই। আমি ডাক্তার কিপলিং বলছি। বেরিয়ে আসুন। তা না হলে এখানে কিছু লোক রয়েছে যারা কামরাটা বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে। বেরিয়ে আসুন, মিস্টার। আমি অস্ত্রের মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলছি না।'

ভারী একটা তালা খোলার আওয়াজ হলো। কবাট ফাঁক হতে ভেতরে দেখা গেল কমান্ডার হাম্মামকে। কেমন যেন নেশাগ্রস্ত আর উদভ্রান্ত দেখাচ্ছে তাকে। 'কি ঘটছে আসলে?'

'যা ঘটার ঘটে গেছে,' বলল বেলটন। 'তোমরা হেরে গেছ, বন্ধু।'

কমান্ডার হাম্মাম ঢিলেঢালা একটা জ্যাকেট পরে রয়েছে দেখে খুশি হলেন ডাক্তার কিপলিং।

'সার্চ করো ওকে,' বলল বেলটন।

কিন্তু সার্চ করে কিছু পাওয়া গেল না কমান্ডার হাম্মামের কাছ থেকে। 'বাবাল লোয়াঙ্গো কোথায়?' জানতে চাইল সে।

'এক নম্বর কোয়ার্টারের কোথাও, সম্ভবত বেঁচেই আছে,' বললেন ডাক্তার।

'বারজেন?'

'মারা গেছে। তার সব লোকজনও, অন্তত আমার তাই বিশ্বাস। এই যাচ্ছি, ঘুরে দেখে এসে সঠিক বলতে পারব।' কাঁধ দুটো আরও নিচু করে নিলেন তিনি, যাতে তাঁকে সত্তর বছরের মনে না হয়ে আশি বছরের বলে মনে হয়। বিধ্বস্ত করিডর ধরে এগোচ্ছেন তিনি। এই অভিনয়ের কষ্টটুকু স্বীকার না করলেও চলত তাঁর। কারণ দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে হেকটর, বেলটনের সম্পূর্ণ মনোযোগ এখন তার দিকে নিবদ্ধ। এই মুহূর্তে একজন আরেকজনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে ওরা।

আরও কয়েক পা এগিয়ে ডাক্তার কিপলিং যা দেখলেন তাতে পরিষ্কার হয়ে গেল, কেবিনগুলোর ভেতর কারও বেঁচে থাকার কোন সম্ভাবনাই নেই। ক্ষতবিক্ষত শরীরগুলোকে মানুষের শরীর বলে চেনার কোন উপায়ই নেই। দলা পাকানো মাংসের পিণ্ড এক একটা। বেঁচে আছে কি মারা গেছে, পরীক্ষা করার প্রশ্নই ওঠে না। যা খুঁজছেন, পেতে মোটেও দেরি হলো না। পুরো এক বাক্স হ্যান্ড-গ্রেনেডের পাশেই দেখতে পেলেন একজোড়া স্মাইযার সাব-অটোমেটিক—দুটোই লোডেড। মেডিকেল ব্যাগের নিচে কয়েকটা হ্যান্ড-গ্রেনেড নিলেন তিনি। পেছনের একটা ভাঙা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে নিচে খানিকটা ছায়া ছায়া আবছা অন্ধকার দেখতে পেলেন। সাবধানে দুটো গ্রেনেড নামিয়ে রাখলেন তিনি প্ল্যাটফর্মে। সেগুলোর পাশে শুইয়ে রাখলেন সাব-অটোমেটিক দুটোকে। তারপর ধীরেসুস্থে বেরিয়ে এলেন করিডরে।

নাফাজ মোহাম্মদের করুণ দশা দেখে বোঝা যাচ্ছে এরই মধ্যে তাঁর ওপর এক দফা

হামলা চালিয়েছে হেকটর।

চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন তিনি নিজের বিছানায়। শিরির মনে হচ্ছে, জ্ঞান নেই। ভাঙা নাক আর থেঁতলানো ঠোঁট থেকে রক্ত গড়াচ্ছে এখনও। মুখের দু'পাশে নখের আঁচড় থেকে শুরু করে ঘুষি খেয়ে ফুলে ওঠা—সব রকম আঘাতের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। বাবার ওপর ঝুঁকে রয়েছে শিরি। চোখের পানিতে ভেজা একটা রুমাল দিয়ে বাবার ক্ষতগুলো থেকে রক্ত মুছে দিচ্ছে সে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে হেকটর। প্রচণ্ড একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত থমথম করছে তার চেহারা। এক চুল নড়ছে না সে। দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে সে, হাতের আঙুলগুলো চোখের সামনে তুলে দেখছে। আঙুলের উল্টো দিকের গিঁটগুলো ছড়ে গিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে এখনও। দেখেই বোঝা যাচ্ছে অপেক্ষা করছে সে। অচেতন লোককে মেরে সুখ নেই। নাফাজ মোহাম্মদের জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় কি।

ক্ষতবিক্ষত ঠোঁট জোড়া নড়ে উঠল নাফাজ মোহাম্মদের। তাঁর ঠোঁটের সাথে শিরির কান প্রায় ঠেকে আছে। ফিসফিস করে বলছেন তিনি, 'সরি, মাই ডারলিং। সরি, মাই বিলাভেড। আমিই দায়ী, সব আমারই ব্যর্থতা। পথের এখানেই শেষ, মা। আমি একজন বেদুইন সন্তান, কিন্তু তা ভুলে সভ্য আমেরিকান সাজতে চেয়েছিলাম। সভ্যতা আমার সাথে বেঈমানী করল।'

'পথের শেষ—হ্যাঁ,' বাপের মত মেয়েও ফিসফিস করে কথা বলছে। 'কিন্তু আমাদের জন্যে নয়, বাবা।' এখন আর একটুও কাঁপছে না শিরি। 'মাসুদ ভাই যতক্ষণ বেঁচে আছেন, আমাদের অত চিন্তা কিসের?'

চোখ পিট পিট করে শিরির মুখের দিকে বার কয়েক তাকালেন নাফাজ মোহাম্মদ। বললেন, 'মি. রানা পঙ্গু হয়ে গেছেন। একজন পঙ্গুর কাছ থেকে কিছুই আশা করতে পারি না আমরা।'

নিচু কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাসের সুরে বলল শিরি, 'কিচ্ছু ভেব না তুমি, ড্যাডি। হেকটরের দিন ঘনিয়ে এসেছে। আমি জানি। তুমি দেখো!'

হাসতে চেষ্টা করলেন নাফাজ মোহাম্মদ। কিন্তু থেঁতলানো ঠোঁট জোড়া বাধা দিল তাঁকে। বললেন, 'আমার ধারণা ছিল খুন-খারাবি পছন্দ করো না তুমি।'

'করি। নর পিশাচদেরকে খুন করায় আমার আর কোন আপত্তি নেই। যারা আমার বাপকে এভাবে মারধোর করতে পারে, তারা পিশাচ নয় তো কি?'

দশ

নিচু গলায় ডাক্তার কিপলিঙের সাথে কথা বলছে রানা। কৃত্রিম ব্যথায় বিকৃত করে রেখেছে চেহারাটাকে। তারপর দু'জনেই ধীর পায়ে এগোল হেকটর আর বেলটনের দিকে। ওদেরকে আসতে দেখে চুপ করে গেল হেকটর, ভুরু কুঁচকে দু'জনকে ভাল করে একবার দেখে নিয়ে তাকাল বেলটনের দিকে। চোখে প্রশ্ন।

কিন্তু বেলটন কিছু বলার আগেই ডাক্তার কিপলিং মুখ খুললেন, 'আপনার কাজে কোথাও এতটুকু খুঁত নেই, মি. বেলটন। পাকা হাত আপনার. বেঁচে থাকা তো দূরের কথা, ওখানে একজন লোককে চেনারও যো নেই।'

'কে ও?' জানতে চাইল হেকটর।

'একজন ডাক্তার।'

আরেকবার তাকাল হেকটর রানার দিকে। 'আর ওটা?'

'একজন বিজ্ঞানী। একটু ভুল হয়ে যাওয়ায় গুলি খেয়েছে।'

'মি. সাদ্দাম ব্যথায় সাংঘাতিক কষ্ট পাচ্ছেন,' বললেন ডাক্তার কিপলিং। 'আমার কাছে এক্স-রে করার সাজ-সরঞ্জাম নেই, কিন্তু সন্দেহ করছি কাঁধের কাছে হাতটা ভেঙে গেছে ভদ্রলোকের।'

প্ল্যান আর অপারেশন সম্পূর্ণ সফল হতে যাচ্ছে দেখে আনন্দে আত্মহারা অবস্থা হয়েছে হেকটরের। বাস্তব জগতে নেই সে, কারও ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনা অনুভব করার উর্ধ্বে উঠে গেছে। তার চেহারায় আশ্চর্য একটা পৈশাচিক উল্লাস ফুটে রয়েছে, কৃত্রিম ব্যথায় প্রায় সারাক্ষণ চোখ কুঁচকে থাকা রানার দৃষ্টিতেও ধরা পড়ল সেটা।

'ব্যথায় সাংঘাতিক কষ্ট পাচ্ছে বুঝি?' কৌতুক ঝিলিক দিয়ে উঠল হেকটরের চোখে। 'ঠিক আছে, ডাক্তার, আপনার পেশেন্টকে আপনি এই বলে সান্ত্বনা দিন যে এক ঘণ্টা পর কোন ব্যথাই ওকে আর ছুঁতে পারবে না।'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে ডাক্তার বললেন, 'আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। এসব ব্যাপার তেমন বুঝিও না, নাকও গলাতে চাই না। আমি শুধু আমার রোগীকে সিক বে-তে নিয়ে গিয়ে একটা পেইন-কিলার ইঞ্জেকশন দিতে চাই।'

'অবশ্যই, অবশ্যই,' হাসছে হেকটর। 'শেষ মুহূর্তে সবাই যাতে সম্পূর্ণ সুস্থ থাকে সেটা আমিও চাই। ছোটখাট ব্যথা-বেদনা নিয়ে অস্থির থাকলে আসল আতঙ্কটা অনুভব করবে কিভাবে?'

'আসল আতঙ্ক?' চোখ পিট পিট করছেন ডাক্তার কিপলিং।

'পরে, পরে।'

ডাক্তার আর অসুস্থ রানা ঘুরে দাঁড়াল। ধীর পায়ে ফিরে আসছে ওরা। শিরশির করছে ডাক্তারের পিঠ, এই প্রথম একটা অস্বস্তি আর অনিশ্চিত ভয় গ্রাস করতে যাচ্ছে তাঁকে। 'না,' ফিস ফিস করে নিষেধ করল রানা, 'পেছন দিকে তাকাবেন না।'

ছেলেটা কি জাদু জানে?—অবাক হয়ে ভাবছেন ডাক্তার কিপলিং। মনের কথা টের পেল কিভাবে?'

সিক বে-তে ঢুকে কোথাও এক সেকেন্ডের জন্যে থামল না রানা, ডাক্তারকে সাথে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে সোজা রেডিওরুমের দিকে এগোচ্ছে। হঠাৎ রানার নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলেন ডাক্তার। বুঝতে পারছেন, এই ছেলেটির ওপরই এখন সম্পূর্ণ নির্ভর করছে তাঁর এবং বাকি আর

সবার জীবন। মৃত্যু অবধারিত, ভাবছেন তিনি, কিন্তু ক্ষীণ একটু আশা এখনও আছে, যতক্ষণ এই দুঃসাহসিক যুবক সুস্থ এবং সচল থাকতে পারবে। হঠাৎ নিজের সত্তর বছরের জীবনটার ওপর সাংঘাতিক মায়া পড়ে গেল তাঁর। আবিষ্কার করলেন, এখনও তিনি বেঁচে থাকতে চান। মনের একান্ত ইচ্ছে, মৃত্যু যেন স্বাভাবিক পথ ধরে তাঁর কাছে আসে। শুধু তখনই তাকে মেনে নিতে পারবেন তিনি।

পেছন থেকে রানার কাঁধে হাত রাখলেন ডাক্তার কিপলিং।

থমকে দাঁড়াল রানা, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পেছন দিকে।

'আমাকে সামনে যেতে দিন,' চাপা গলায় বললেন বৃদ্ধ ডাক্তার। 'কারও নজরে পড়ার আগেই আপনাকে তাহলে আমি সাবধান করে দিতে পারব।' রানাকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি।

রেডিওরুমে পৌঁছুতে দু'বার থামতে হলো ওদেরকে। বেলটনের লোকেরা উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক সেদিক ঘুর ঘুর করছে। রাস্তা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত হাত নেড়ে রানাকে এগোতে নিষেধ করলেন ডাক্তার। আর কোথাও থামতে হলো না, নির্বিঘ্নে রেডিওরুমে পৌঁছুল ওরা।

ভিতরে ঢুকল রানা। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে অপারেটর, সেদিকে না তাকিয়ে সোজা ট্র্যান্সিভারের সামনে এসে দাঁড়াল ও। নাফাজ মোহাম্মদের সার্ভে জাহাজ রোমিওর সাথে যোগাযোগ করতে বিশ সেকেন্ড লাগল ওর।

'ক্যাপ্টেন সাদিকের সাথে কথা বলতে চাই,' বলল রানা।

'বলছি।'

'এরপর অয়েল ট্যাঙ্কের কাছে গিয়ে বাঁক নিয়ে ফিরে এসো না,' কোন ভূমিকা না করে দ্রুত নির্দেশ দিচ্ছে রানা। 'চট্ করে ট্যাঙ্কের পেছনে চলে যাবে। তারপর ফুল স্পীডে সোজা দক্ষিণ দিকে ছোটো। সাগর কন্যা বেদখল হয়ে গেছে, কিন্তু ওরা কেউ অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান চালাতে জানে না। বিশ মাইল এগিয়ে দাঁড় করাবে রোমিওকে। সাথে সাথে একটা ওয়ার্নিং ইস্যু করবে—সমস্ত জাহাজ আর এয়ারক্রাফট যেন সাগর কন্যার কাছ থেকে কমপক্ষে বিশ মাইল দূরে সরে থাকে।'

'কিন্তু কেন?'

'প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ ঘটতে যাচ্ছে। ফর গড্স্ সেক, তর্ক কোরো না।'

'তর্কটা কার সাথে কি নিয়ে?' অপরিচিত একটা কণ্ঠস্বর, রানার পেছন থেকে।

অত্যন্ত সাবধানে, ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। লম্বা, একহারা গড়নের একজন লোক, হাতে পিস্তল—ডাক্তার কিপলিংকে ঠেলে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে ওদের দু'জনকেই কাভার দিচ্ছে। নিঃশব্দে হাসছে সে, ধবধবে সাদা দাঁত দেখতে পাচ্ছে রানা। 'চলুন, বেলটন আপনাকে ডাকছে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। ঘুরল। পা বাড়াতে গিয়ে আর একটু হলে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, কোনমতে তাল সামলে নিল। ডান হাতটা স্লিংয়ের ভেতর ঢুকে বাঁ হাতের কনুইয়ের ওপরটা চেপে ধরেছে। তীব্র প্রতিবাদের সুরে বললেন ডাক্তার কিপলিং, 'দেখছ না, উনি একজন অসুস্থ মানুষ?'

চোখের পলকে হাসিটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল লোকটার মুখ থেকে। কঠোর

দৃষ্টিতে তাকাল সে ডাক্তার কিপলিঙের দিকে। মাত্র এক সেকেন্ডের জন্যে।

এই একটা সেকেন্ডই দরকার ছিল রানার। লোকটা আবার ওর দিকে ফিরে তাকাতে শুরু করেছে, এই সময় গুলি করল ও। সাইলেন্সার লাগানো পয়েন্ট থারটি-এইট থেকে টপ্ করে একটা শব্দ বেরুল, রেডিওরুমের ভেতরই রয়ে গেল সেটা। হৃৎপিণ্ড ফুটো করে বেরিয়ে গেছে বুলেটটা। লোকটা যখন আধপাক ঘুরে পড়ে যাচ্ছে, স্যাৎ করে ছুটে গিয়ে দরজা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল রানা। ডেকের আলো এদিকে পৌঁছায়নি, যথেষ্ট ছায়া দেখতে পাচ্ছে ও, আশপাশেও কেউ নেই. মাত্র বিশ ফিট দূরে প্ল্যাটফর্মের কিনারা।

লাশটাকে সাগর কন্যার নিচে ফেলে দিতে কয়েক সেকেন্ডের বেশি সময় নিল না রানা। ফেরার পথে আবার ডাক্তার কিপলিং পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা নিলেন। সিক বে-তে ঢুকে রুমাল দিয়ে ঘাম মুছছেন তিনি, হঠাৎ খেয়াল হলো, তাঁকে ছাড়াই সামনের দরজা দিয়ে আবার বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে রানা। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুড়োর বুকটা। চিৎকার করে বাধা দিতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলেন শেষ মুহূর্তে। ছুটলেন।,

রানার পাশে পৌঁছে ডাক্তার বললেন, 'এই ভুল আর করবেন না. প্লীজ, মি. সাদ্দাম। যেখানেই যাবেন, আমি আপনার সাথে থাকব।'

একটু অবাক হয়ে তাকাল রানা।

'আপনিই আমাদের সবার শেষ ভরসা,' চাপা গলায় বললেন ডাক্তার। 'আপনি কোন বিপদে পড়েন, সে ঝুঁকি নিতে পারি না আমি।'

বেলটনের সাথে এখনও কি নিয়ে যেন গভীর আলোচনা করছে হেকটর। খানিকটা দূরে অসহায়, অপ্রতিভ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে কমান্ডার হাম্মাম। এগিয়ে এসে ডাক্তার কিপলিং জানতে চাইলেন, 'কেমন বোধ করছেন, কমান্ডার?'

চরম হতাশায় রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কমান্ডারকে। অমন ভারী গলা থেকে ফ্যাঁসফেঁসে আওয়াজ বেরুল, শোনা যায় কি যায় না, 'মেনে নিয়েছি। জানি, কোন আশা নেই। কাউকে বাঁচিয়ে রেখে যাওয়া উদ্দেশ্য নয় ওদের।'

'মারা যাচ্ছেন বুঝতে পেরে কেমন লাগছে আপনার?'

'খারাপ লাগছে, কিন্তু আর যখন কোন উপায় নেই...'

'এখন থেকে একটু একটু করে ভাল লাগতে শুরু করবে,' বললেন ডাক্তার কিপলিং। 'উপায় যে আছে তাও বুঝতে পারবেন এখুনি। সুযোগ পেলেই দু'নম্বর কোয়ার্টারের পেছন দিকে চলে যাবেন। একজোড়া লোডেড সাব-অটোমেটিক আছে ওখানে। আর আছে কিছু হ্যান্ড-গ্রেনেড। কয়েকটা গ্রেনেড আপনার লাম্বার জ্যাকেটে সুন্দর লুকিয়ে নিতে পারবেন। আমার হাতে এই যে ব্যাগটা দেখছেন, এতেও কিছু জিনিস আছে। আর মি. সাদ্দামের কাছে তো সাইলেন্সার লাগানো পয়েন্ট থারটি-এইট আছেই। রীতিমত একটা ব্যাটেলিয়ানকে ঠেকাতে পারব আমরা। আপনার কি ধারণা?'

কোন রকম উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গেল না কমান্ডারের চেহারায়। আগের মতই হতাশ, রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তাকে। বলল, 'ইয়াল্লা! ইয়াল্লা!

ইয়াল্লা!'

মেয়ের সাহায্য নিয়ে বিছানা থেকে নেমে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন নাফাজ মোহাম্মদ। ওদের সাথে মিলিত হলো রানা। 'কেমন বোধ করছেন, মি. নাফাজ?'

কিছু বলতে চেষ্টা করলেন নাফাজ মোহাম্মদ, কিন্তু গলা দিয়ে কোন কথা বেরোল না।

'বেশি দেরি নেই, কিছুটা ভাল বোধ করবেন,' বলল রানা। তাকাল শিরির দিকে। গলার আওয়াজ একেবারে খাদে নামিয়ে ফেলল, 'আমি নাক চুলকালেই ওদেরকে বলবে, তুমি লেডিস রূমে যেতে চাও। কিন্তু ওখানে যেয়ো না। চোখের আড়ালে পৌঁছেই সোজা জেনারেটর রূমে গিয়ে ঢুকবে। ওখানে লাল রঙের একটা লিভার আছে, তাতে লেখা আছে—ডেক লাইট। টেনে নামাবে ওটাকে। এক থেকে বিশ পর্যন্ত গুনবে মনে মনে, তারপর আবার তুলে দেবে লিভারটা। পারবে?'

কথা বলতে পারল না শিরি ফারহানা। সায় দেবার মত একটা ভঙ্গি করল সে, একটা কান প্রায় ছুঁয়ে গেল একদিকের কাঁধ।

বাইরে এখনও অন্ধকার। ডেক লাইট অবশ্য সমস্ত অন্ধকার দূর করে দিয়েছে।

বেলটনের সাথে আলোচনা শেষ করেছে হেকটর, দু'জনকেই দারুণ হাসিখুশি দেখাচ্ছে। হেকটরের আর সব ঘনিষ্ঠ সহকারীরাও জড়ো হয়েছে এক জায়গায়।

কি এক রসিকতায় উল্লসিত হয়ে উঠেছে হেকটর। অন্ধকার আকাশের দিকে মুখ তুলে অট্টহাসি ছাড়ছে সে।

নাফাজ মোহাম্মদ, শিরি, কমান্ডার হাম্মাম, ডাক্তার কিপলিং, রানা—এক সাথে জড়ো হয়েছে সবাই, ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, পরাজিত একটা দল। ওদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাশাপাশি হেকটর, ময়নিহান, গেস্টন, ভুয়া কর্নেল ফারগুসন, লেফটেন্যান্ট কর্নেল সুইংস্, মেজর ডুরান্ড, বেলটন আর তার সবগুলো খুনী—আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, হাস্যমুখর, বিজয়ী একটা দল।

'কন্ডি আর তার দল—কোথায় তারা?' প্রশ্ন করল হেকটর। 'পুলিসের হেফাজতে পাঠিয়েছ?'

'হ্যাঁ,' বললেন নাফাজ মোহাম্মদ।

'আর ম্যারিনো? তার দল?'

'তোমার লোকদের হাতেই মারা গেছে তারা সবাই।'

রিস্টওয়াচ দেখল হেকটর। পাশে দাঁড়ানো লোকটাকে বলল, 'চেক।'

একটা ওয়াকি-টকি তুলে নিয়ে কথা বলল লোকটা। আপনমনে সায় দেবার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে, তারপর হেকটরকে জানাল, 'নির্দিষ্ট পজিশনে ফিট করা হয়েছে চার্জগুলো।'

'চমৎকার!' উন্মাদ হয়ে গেছে হেকটর। আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু আবার সেই অদম্য অট্টহাসিটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আকারে বেরিয়ে এল তার গলার ভেতর থেকে। হুজুর হাসছেন, সুতরাং পাত্র-মিত্র-পারিষদবর্গকেও তাতে যোগ দিতে হয়। বিজয়ীদের অভদ্র, অশ্লীল হাসিতে ভোর-রাতের বাতাস ছিন্নভিন্ন

হচ্ছে। হেকটর যদি বা থামল, সঙ্গী-সাথীরা সহজে থামতে চায় না।

'চমৎকার!' পুরানো কথার খেই ধরে বলল হেকটর। 'সী-উইচকে বলো সোজা উত্তরে বিশ মাইল এগিয়ে তারপর যেন থামে।'

ওয়াকি-টকিতে মেসেজটা পাঠানো হলো সাথে সাথে। হেকটরের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, দু'নম্বর কোয়ার্টারের বিধ্বস্ত ভবনের আড়ালে পড়ে গেছে নাফাজ মোহাম্মদের সার্ভে জাহাজ রোমিও। অবশ্য, এমনিতেও ওটাকে দেখতে পেত না সে, তার কারণ ক্যাপ্টেন সাদিক জাহান রোমিওর সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়ে ফুল স্পীডে ছুটে চলেছে দক্ষিণ দিকে।

'ভাল কথা, নাফাজ,' বলল হেকটর, 'তোমার সাথে আমার আর খেলা নেই। আমার লেজে পা দিয়েছিলে তুমি, তার পরিণতি কি রকম ভয়াবহ হতে পারে, সেটাই তোমাকে বোঝাবার ইচ্ছা ছিল আমার। সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করেছি আমি। ঠেলতে ঠেলতে তোমাকে আমি তোমার পথের শেষ প্রান্তে নিয়ে এসেছি, এখান থেকে কেউ তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। তোমার এত সাধের সাগর কন্যা, তুমি নিজে, তোমার মেয়ে—আর যারা তোমার সাথে রয়েছে, সবাই মারা যাচ্ছ। দুটো নিউক্লিয়ার বোমা লাগানো হয়েছে সাগর কন্যার পশ্চিম পায়ের সাথে,' পকেটে হাত ভরে গম্বুজ আকৃতির একটা মেটাল কনটেইনার বের করল সে। 'এটা হলো রেডিও-অ্যাকটিভ ডিটোনেটিং ডিভাইস। এই যে, এখানে এই ছোট্ট সুইচটা দেখতে ভুল কোরো না যেন। ম্যাক্সিমাম নাইনটি মিনিট টাইম ডিলে। নব্বুই মিনিটের মধ্যে এখনি চল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে। পঞ্চাশ মিনিট সময় আছে আর। তারপরই—পুফ্। সাগর কন্যাসহ তোমরা যারা এখানে তখন থাকবে সবাই বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে। কেউ কিছু টেরই পাবে না, সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা আর আশ্বাস দিয়ে বলছি আমি।'

'আমার নিরীহ ক্রুদেরকেও তুমি খুন করবে?' থেঁতলানো ঠোঁটে এখন আর কোন ব্যথা অনুভব করছেন না নাফাজ মোহাম্মদ। 'তুমি কি উন্মাদ হয়ে গেছ?'

'না,' বলল হেকটর, 'নতুন করে কেন উন্মাদ হতে যাব? আমি চিরকালই তো তাই। তুমি আমাকে চিনতে ভুল করেছ, সেইখানেই তোমার মস্ত পরাজয়। ক্রুদের কথা যদি বলো, ওদেরকে আমিও বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কোন সাক্ষী রাখতে চাই না, তাই না মরে উপায় নেই বেচারীদের। এক্ষুণি রওনা হয়ে যাচ্ছি আমরা। যাবার আগে দুটো হেলিকপ্টার, ডেরিক ক্রেন, রেডিওরূম ধ্বংস করে দিয়ে যাব। বাকি দুটো 'কপ্টারে চড়ে কেটে পড়ছি আমরা। আমরা চলে গেলে একটা মাত্র উপায় থাকবে তোমাদের, সাগর কন্যা থেকে গালফে ঝাঁপ দেয়া। সেটা অবশ্য আত্মহত্যা করা হবে।'

নাক চুলকাল রানা। মাত্র একবার। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা ওর। চরম হতাশায় অসুস্থ হয়ে পড়ল এক নিমেষে। সর্বনাশ! ভাবছে ও। বিহ্বল দৃষ্টিতে হেকটরের দিকে তাকিয়ে আছে শিরি, ওর ইঙ্গিতটা লক্ষই করেনি। মরিয়া হয়ে উঠে আরেকবার নাকটা চুলকাবে কিনা ভাবল ও। কিন্তু মারাত্মক ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে সেটা। হেকটর বা তার লোকদের কারও চোখে যদি ধরা পড়ে ব্যাপারটা,

সন্দিহান হয়ে উঠবে সাথে সাথে। তারপর কি হবে, ভাবতে পর্যন্ত সাহস পাচ্ছে না রানা।

সময় বয়ে যাচ্ছে। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল রানা। আরেকবার ইঙ্গিতটা দেবে শিরিকে। কিন্তু তার আগেই মুখ খুলল শিরি। রানার দিকে না তাকিয়েও ইঙ্গিতটা লক্ষ করেছে সে। কিন্তু সাথে সাথে মুখ খুললে কেউ যদি সন্দেহ করে, তাই একটু দেরি করেছে সে অনুমতিটা চাইতে।

'লেডিস রূমে যেতে পারব আমি?'

আনন্দে আত্মহারা হেকটর উদার ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলল, 'যাও, যাও। ছোটখাট অসুবিধেতে ফেলে মজা পাবার লোক নই আমি। তবে, তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে।'

পনেরো সেকেন্ড পর দপ্ করে নিভে গেল ডেকের সব আলো। এই অকস্মাৎ অন্ধকারও ওদের আনন্দ প্রকাশের পথে কোন বাধা হয়ে দেখা দিল না। 'কি হলো, দেখো তো,' কে যেন বলল বটে, কিন্তু কণ্ঠস্বরটা হেকটরের নয়, আর কথাটা জরুরী ভঙ্গিতে হুকুমের সুরে বলা হয়নি দেখে কি হয়েছে দেখার জন্যে এগোল না কেউ।

বিশ সেকেন্ডের মধ্যে কি করতে চায় মাসুদ ভাই?—ভাবছে শিরি। জেনারেটর রূম থেকে অন্ধকার ডেকে উঁকি দিল সে। দুই হাত দূরের জিনিসও দেখতে পাচ্ছে না।

হিসেব করে গুনে গুনে পা ফেলছে রানা। নিঃশব্দে। বিধ্বস্ত ভবনের কাছে পৌঁছে গেল ও, বাঁক নিয়ে কয়েক পা এগোতেই পায়ে বাধল কি যেন। নিচু হয়ে ঝুঁকে তুলে নিল একজোড়া সাব-অটোমেটিক। সেগুলো নিয়ে ফিরে এসে কমান্ডার হাম্মামের হাতে একটা ধরিয়ে দিতে সময় লাগল মোট বারো সেকেন্ড।

বাকি আটটা সেকেন্ডে প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেল ডেকের ওপর।

আন্দাজের ওপর এলোমেলোভাবে ব্রাশ ফায়ার করে চলেছে রানা আর কমান্ডার হাম্মাম। ওদেরকে সাহায্য করছেন ডাক্তার কিপলিং, কিন্তু তার নিক্ষিপ্ত একটা গ্রেনেডও কাউকে স্পর্শ করল না। তিনি শুধু বিধ্বস্ত ভবনটার আরও খানিক ক্ষতি সাধন করলেন।

আট সেকেন্ড পেরিয়ে গেল। জ্বলে উঠল ডেকের সবগুলো আলো।

তিনজন লোক এখনও বেঁচে রয়েছে—হেকটর, বেলটন আর তার একজন সঙ্গী। এক পা এগোল রানা। বলল, 'অস্ত্র ফেলে দাও সবাই।'

উদভ্রান্ত, উন্মাদের মত দেখাচ্ছে ওদেরকে। অল্পস্বল্প আহত হয়েছে সবাই। কিন্তু নিজেদের আঘাত সম্পর্কেও ওদের কাউকে সচেতন বলে মনে হচ্ছে না। নিজেদের চার পাশে বিহ্বল, হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ওরা। রক্ত আর মৃত দেহ ছাড়া দেখার কিছুই নেই অবশ্য। তবে, রানার কথা কানে গেছে ওদের। হাতের অস্ত্র ফেলে দিতে এক সেকেন্ড দেরি করল না কেউ।

ত্রস্তা হরিণীর মত ছুটে এল শিরি। এসেই বাবার পেছনে মুখ লুকাল সে।

সাব-মেশিনগানটা নামিয়ে রেখে হেকটরের দিকে এগোল রানা। 'ডিটোনেটিং

ডিভাইসটা দাও আমাকে।'

রানার চোখে চোখ রেখে পকেটে হাত ভরছে হেকটর। ধীরে ধীরে মেটাল কনটেইনারটা বের করল সে, অকস্মাৎ প্ল্যাটফর্মের কিনারার দিকে ছুঁড়ে মারতে গেল সেটাকে। খুক করে কেশে উঠল রানার হাতে বেরিয়ে আসা পয়েন্ট থার্টি-এইট।

বিকট একটা আর্তনাদ বেরোল হেকটরের গলা থেকে। বুলেট লেগে গুঁড়ো হয়ে গেছে কনুইটা। ডেক স্পর্শ করার আগেই, শূন্যে থাকতে, ডিটোনেটিং ডিভাইসটাকে লুফে নিল রানা।

'কমান্ডার,' বলল রানা, 'একটা কামরা দরকার আমার। লোহার দরজা থাকতে হবে। শুধু বাইরে থেকে খোলা যায়। জানালা নেই। আছে?'

'আছে। ফোর্ট নক্সের ভল্টের মত নিরাপদ। আসুন আমার সাথে।'

'তার আগে সার্চ করুন ওদেরকে,' বলল রানা। 'প্রতিটি লোমকূপে হাতের আঙুল পড়া চাই। একটা সিগারেটও যেন কারও সাথে না থাকে।'

সার্চ করে যার পকেটে যা পেল সব বের করে নিল কমান্ডার হাম্মাম। 'কারও পকেটে এখন আর একটা ফুটো পয়সাও নেই।'

কমান্ডার হাম্মামের পিছু পিছু ইস্পাতের তৈরি, সেলের মত দেখতে একটা কামরার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। হেকটর আর তার দুই সঙ্গীকে কামরার ভেতর ঢোকাল রানা। কামরার ভেতর দুটো লোহার থাম রয়েছে। প্রথমে নাইলনের রশি দিয়ে আলাদাভাবে হাত-পা বাঁধা হলো ওদের, তারপর তিনজনকেই সেই লোহার থামটার সাথে জড়িয়ে বাঁধা হলো। এরপর ওদের কাছ থেকে পাঁচ হাত দূরে ডিটোনেটিং ডিভাইসটা মেঝের ওপর নামিয়ে রাখল রানা। ঘড়ির ডায়ালটা দেখতে পাচ্ছে তিনজনই। ঘুরছে কাঁটাগুলো।

ওদের দিকে পেছন ফিরে দরজার দিকে এগোচ্ছে রানা।

আহত হেকটর তার সমস্ত ব্যথা ভুলে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'ফর গডস্ সেক, তোমরা আমাদেরকে এখানে রেখে যেতে পারো না!'

'তুমি শুধু পারো?' দোরগোড়া থেকে বলল রানা। 'আর কেউ পারে না?' হঠাৎ হাসল রানা। 'চিনতে পারছ, হেকটর?' নকল ভুরু, গোঁফ, উইগ কিছুই খুলল না ও, মুখ ফুটে আর কিছু বলারও দরকার হলো না ওর, ওই একটা প্রশ্নই যথেষ্ট, তাতেই চিনতে পেরেছে হেকটর। চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠছে তার, কিন্তু সেটা আতঙ্কে নাকি বিস্ময়ে, বুঝতে চাইল না রানা—নিজের হাতে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে তালা মেরে দিল সেটায়।

'মি. রানা,' এগিয়ে এলেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'আপনি একটা ভুল করে ফেলেছেন, মি. রানা। ডিটোনেটিং ডিভাইসটা চালু রয়েছে,' চাবির জন্যে হাত পাতলেন তিনি। 'ওটা অফ করতে ভুলে গেছেন আপনি...'

নাফাজ মোহাম্মদের হাতে নয়, চাবিটা ছুঁড়ে মারল রানা প্ল্যাটফর্মের কিনারার দিকে। ঘুরপাক খেতে খেতে সাগর কন্যার বাইরে চলে গেল সেটা।

এক সেকেন্ড স্তম্ভিত হয়ে থাকল সবাই, পরমুহূর্তে উন্মাদের মত ছুটে গিয়ে

ঝাঁপিয়ে পড়লেন নাফাজ মোহাম্মদ আর কমান্ডার হাম্মাম তালাবন্ধ কামরার দরজার ওপর. কয়েক সেকেন্ড দমাদম কিল ঘুষি মারার পর হুঁশ ফিরল ওদের।

'চাবি!' আর্তনাদ করে উঠলেন নাফাজ মোহাম্মদ। 'আরেক সেট চাবি!'

হাঁপাচ্ছে কমান্ডার হাম্মাম, 'নেই, স্যার! ডুপ্লিকেট সেটটা আপনার ফ্লোরিডার বাড়িতে।'

'এ আমি কক্ষনো মেনে নেব না। এর নাম.স্রেফ পাগলামি!' প্রায় চিৎকার করে উঠলেন নাফাজ মোহাম্মদ। ছুটে চলে এলেন রানার সামনে। 'সাগর কন্যা এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ। খোদার দোহাই লাগে আপনার, একে আপনি ধ্বংস করবেন না, মি. রানা, প্লীজ!'

সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করল রানা নাফাজ মোহাম্মদকে। তাঁর দিকে তাকাল না পর্যন্ত। কি বলছেন তা যেন শুনতেই পায়নি ও। রিস্টওয়াচ দেখল চোখের সামনে কব্জি তুলে। 'আর উনত্রিশ মিনিট বাকি আছে। দেরি না করে আমাদের রওনা হয়ে পড়া উচিত। দুটো কোয়ার্টার থেকেই লোকজনদের বের করে নিয়ে আসুন, কমান্ডার,' বলল রানা। 'সেনসরি, রাডার, সোনার আর রেডিওরুমে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় যারা বেঁচে আছে তাদের রশি কেটে দিন। সবচেয়ে আগে খবর নিন হেলিকপ্টারের পাইলটরা সবাই অক্ষত আছে কিনা।' নিজের রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল রানা। 'আটাশ মিনিট।'

সবাই মহা ব্যস্ততার সাথে ছুটোছুটি শুরু করে দিল, শুধু নাফাজ মোহাম্মদ ছাড়া। তিনি স্তম্ভিত হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। হতভম্ব দেখাচ্ছে তাঁকে। 'এত ব্যস্ততার আসলে কি কোন দরকার আছে?' জানতে চাইলেন তিনি।

মৃদু গলায় বলল রানা, 'কি করে বুঝব আমরা, ডিটোনেটরের টাইম সেটিঙে কোন ভুলভাল নেই?'

উন্মত্ত ব্যস্ততা সাথে সাথে দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

ডেডলাইনের তেরো মিনিট আগে শেষ হেলিকপ্টারটা সাগর কন্যা ত্যাগ করে উড়াল দিল দক্ষিণ দিকে। প্রথম হেলিকপ্টারটা রোমিওর হেলিপ্যাডে নামল। এতে রয়েছে রানা, নাফাজ মোহাম্মদ, শিরি, কমান্ডার হাম্মাম, ডাক্তার কিপলিং এবং কয়েকজন ক্রু। ওরা সবাই যখন 'কপ্টার থেকে নামছে, দ্বিতীয় 'কপ্টারটা রোমিওর মাথার ওপর চক্কর মারছে বারবার। রোমিও এখনও সাগর কন্যার কাছ থেকে মাত্র চোদ্দ মাইল দূরে। কিন্তু শিরির প্রশ্নের উত্তরে জানাল রানা, এই দূরত্ব ওদের নিরাপত্তার জন্যে যথেষ্ট। ক্যাপ্টেন সাদিকের সাথে কথা বলার জন্যে ব্রিজে উঠে গেল ও।

ক্যাপ্টেন সাদিক জানাল আশপাশের সমস্ত জাহাজ আর এয়ারক্রাফটকে সাগর কন্যার কাছ থেকে বিশ মাইল দূরে থাকতে বলা হয়েছে।

কাঁটায় কাঁটায় নির্দিষ্ট সময়ে বিস্ফোরিত হলো সাগর কন্যা। খুদে একটা ধোঁয়ার মেঘ দেখা গেল আকাশে, রেগুলার মেগাটন অ্যাটম বোমার বিস্ফোরণের ফটোতে ঠিক যে-আকৃতির ধোঁয়ার মেঘ দেখে অভ্যস্ত লোকে, ঠিক তেমনি। রোমিওতে যারা রয়েছে তারা সতেরো সেকেন্ড পর বিকট বজ্রপাতের মত একটা

শব্দ শুনতে পেল। এর খানিক পর একসার খুদে ঢেউ ছুটে এসে আঘাত করল রোমিওকে, কিন্তু তাতে কোন ক্ষতি হলো না রোমিওর। ক্যাপ্টেনকে নির্দেশ দিল রানা, 'খবরটা সমস্ত জাহাজ আর এয়ারক্রাফটকে জানিয়ে দাও।'

ব্রিজ থেকে নেমে এল রানা। হঠাৎ কোত্থেকে উড়ে এসে ওর পথরোধ করে দাঁড়াল শিরি ফারহানা।

'কাঁদছে আর নিজের মাথার চুল ছিঁড়ছে বাবা সাগর কন্যার শোকে। মাসুদ ভাই, জবাব দিন, এতবড় ক্ষতি কেন করলেন আপনি তার?'

'দুনিয়ার মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ,' বলল রানা। 'কারও উপকার করতে নেই। ভাল করলে লোকে মনে করে ক্ষতি করলাম। আবার কিছু না করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকাও দোষের। যাই কোথায়!'

'সাগর কন্যাকে রক্ষা করা যেত, কিন্তু আপনি ধ্বংস করে দিলেন। কেন?' রানা হাসছে দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল শিরি। 'খুব আনন্দ লাগছে আপনার, না?'

'লাগছে,' বলল রানা। 'অস্বীকার করব না। দুটো কথা ভেবে।'

'একটা সাগর কন্যাকে ধ্বংসের আনন্দ,' বলল শিরি। 'আরেকটা অতগুলো লোককে খুন করার আনন্দ।'

এদিক ওদিক মাথা দোলাল রানা। 'না,' বলল ও। 'খুন করার মধ্যে কোন আনন্দ নেই, সে-কথা তো তোমাকে আমি আগেই বলেছি। তবে, সাধারণ মানুষের দিকটাও দেখতে হয় আমার। ওরা এমন কোন দেশে পালিয়ে যেতে পারত যে-দেশের সাথে আমেরিকার সুসম্পর্ক নেই। এমন কি ধরা পড়লেও, দীর্ঘ অনেক বছর ধরে মামলা চলত। সাক্ষী-প্রমাণ যোগাড় করা কঠিন ব্যাপার। তারপর, ভুলে যাচ্ছ কেন, পেরোলে মুক্তি তো আছেই। এখন যা হলো, আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারলাম, ওরা আর কাউকে খুন করতে পারবে না। পারলে ঠিকই করত।'

'কিন্তু সাগর কন্যাকে আপনি বাঁচাতে পারতেন,' বলল শিরি। 'নিউক্লিয়ার ডিভাইসটা অকেজো করে দেয়া যেত, আপনি দেননি।'

'দেয়া যেত কি যেত না তা তুমি জানো না, তোমাকে আমি জানাবও না,' বলল রানা। 'তবে, এটা ঠিক, সাগর কন্যা ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় তোমার বাবা বেঁচে গেলেন। ক্রিমিনাল হিসেবে কারও চেয়ে খুব একটা কম যান না ভদ্রলোক। আত্মরক্ষার জন্যে হোক, বা যে কারণেই হোক, দুটো ফেডারেল অস্ত্রাগার লুট করেছেন তিনি। সাগর কন্যা টিকে গেলে আর একঘণ্টার মধ্যে ফেডারেল ইনভেস্টিগেটরদেরকে ওটার প্ল্যাটফর্মে দেখতে পেতে তুমি। খুব কম করে হলেও পনেরো থেকে বিশ বছর জেল হত তোমার বাবার। এবং সম্ভবত জেলেই তিনি মারা যেতেন।' চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেছে শিরির, কিছুটা ভয়ে, কিছুটা সত্য অনুধাবন করতে পেরে। একটু থেমে বলল রানা, 'কিন্তু এখন আর কোন ভয় নেই। চুল পরিমাণ প্রমাণও অবশিষ্ট নেই কোথাও। র‍্যাডিয়েশন ক্লাউডে দু'একটা কণা থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। তাঁর বিরুদ্ধে কখনও কিছু প্রমাণ করা যাবে না। আর একটা সাগর কন্যা তৈরি করে নিতে বাধা কোথায়?'

'বুঝলাম।' বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল শিরি ফারহানা, তারপর নিচু গলায় বলল, 'এবার আমার উত্তরটা শুনবেন?'

'কিসের উত্তর?' জানতে চাইল রানা।

'আপনার প্রস্তাবের।'

'ওহ-হো! ভুলেই গেছিলাম যে একটা প্রস্তাব দিয়ে রেখেছি। যা-তা নয়, বিবাহ-প্রস্তাব! শোনা যাক তোমার উত্তর।'

'আমি রাজী।'

* * * *

মাসুদ রানা

সাগরকন্যা

দুইখণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

দুর্ধর্ষ এক বেদুইন সর্দারের ঘরে জন্ম নাফাজ মোহাম্মদের।
নিজ গুণে আজ তিনি আমেরিকার সেরা তেল ব্যবসায়ী।
একজন আরবের এই দোর্দণ্ড প্রতাপ কেন সহ্য হবে
মার্কিন ধন-কুবেরদের?
তাঁকে কাবু করতে হলে আঘাত হানতে হবে তাঁর
সবচেয়ে দুর্বল জায়গায়। ধ্বংস করে দিতে হবে তাঁর আদরের
সাগরকন্যাকে। ভাড়া করতে হবে তাঁর
ভয়ঙ্করতম শত্রু জন হেকটরকে।
কাজটা অন্যায়—কিন্তু পিছ-পা হলো না ওরা।
কিন্তু ওরা কি জানত, এক ঢিলে দুই পাখি
মারতে চলেছে হেকটর?
ওরা কি জানত, এই সাথে বাংলাদেশের
এক বেয়াড়া যুবক মাসুদ রানাকেও এক হাত
দেখে নিতে চাইছে সে?
কী হতে চলেছে পরিণতিটা?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০